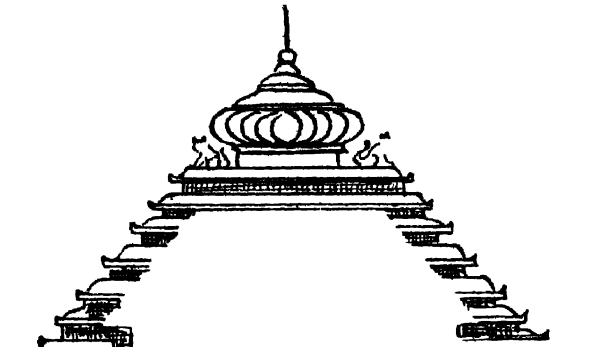

কালাঞ্জর দেবদেউল

নারায়ন সান্যাল

শঙ্খ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৪৯

প্রকাশক
অমিতাভ মজুমদার
শঙ্খ প্রকাশন
৭৯।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
সুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ-শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

১২·০০

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু—

'কলিঙ্গের দেব-দেউল'-এর অগ্রজ :

ওপার বাঙলার আগে
ব্রাত্য
মনামী
অন্তর্লীনা
নৈমিষারণ্য
নীলিমায় নীল
অলকনন্দা
মহাকালের মন্দির
দণ্ডকশবরী
পথের মহাপ্রস্থান
সত্যকাম
বাস্তুবিজ্ঞান
অপরূপা অজন্তা
তাজের স্বপ্ন
নাগ চম্পা
পাষণ্ড পণ্ডিত
'আমি নেতাজীকে দেখেছি'
নেতাজী রহস্য সন্ধানে
জাপান থেকে ফিরে
শার্লক হেবো
কালো কালো
আবার যদি ইচ্ছা কর

চিত্র সূচী

চিত্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ধৌলি শিলালেখের উপরে হস্তীমূর্তি	১
২	উদয়গিরি খণ্ডগিরির ভূমি নকশা	২৩
৩	ব্র্যাঘ্র গুম্ফার প্রবেশ পথ	৩০
৪	গণেশ গুম্ফার স্তম্ভ	৩৯
৫	ঐ ভাস্কর্য নিদর্শন	৪৩
৬	রাণী গুম্ফার প্ল্যান সেকশান	৪৫
৭	পরশুরামেশ্বর মন্দিরের ভূমি নকশা	৬২
৮	ঐ স্কেচ	৬৩
৯	চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, (পরশুরামেশ্বর)	৬৪
১০	সমভঙ্গ মূর্তি	৬৬
১১	আভঙ্গ ঐ	৬৬
১২	ত্রিভঙ্গ ঐ	৬৭
১৩	হরপার্বতী (পরশুরামেশ্বর)	৬৯
১৪	অর্ধনারীশ্বর ঐ	৭১
১৫	গীতবাদ্যরত মূর্তি ঐ	৭৪
১৬	ভুবনেশ্বরের দেবদেউল	৭৪
১৭	কাখর ও গৌড়ীয় দেউল	৭৮
১৮	রেখ দেউল (লিঙ্গরাজ)	৭৯
১৯	ভদ্র (পীড়) দেউলের ব্যঞ্জনা	৮০
২০	'বাড়' অংশের শাস্ত্রসম্মত উপভাগ	৮৩
২১	একরথ ও ত্রিরথ দেউলের ভূমি নকশা	৮৮
২২	পঞ্চরথ দেউল, ভূমি নকশা	৮৯
২৩	বৈতাল দেউল	৯২

২৪	মুক্তেশ্বর দেউলের সম্মুখ ভাগ	৯৭
২৫	ঐ ফাঁদগ্রন্থী (বাড)	৯৮
২৬	ঐ ঐ (গণ্ডি)	৯৯
২৭	তোরণ, মুক্তেশ্বব	১০১
২৮	সিংহ বিরাল	১০২
২৯	রাজরানীর ভূমি নক্শা	১১১
৩০	অলসকন্যা	১১৩
৩১	গোপাল, নন্দ, যশোদা, (লিঙ্গরাজ)	১২৪
৩২	অনন্ত বাসুদেব	১২৭
৩৩	পুরী মন্দিরের ভূমি নক্শা	১৩৩
৩৪	অয়নচলন ও কোনার্কের তাবিখ	১৪৯
৩৫	কোনার্ক ১৮৩৭ (ফার্গুসনের দৃষ্টান্তে)	১৫৫
৩৬	কোনার্ক ভূমি নক্শা	১৬২
৩৭	কোনার্ক জগমোহনের চূড়া	১৮৪
৩৮	কোনার্ক মূল সিংহাসন	১৮৮
৩৯	পূষামূর্তি (কোনার্ক)	১৯১
৪০	হরিদশ্ব (ঐ)	১৯৩
৪১	হস্তীদলনকাবী শার্দুল ঐ	১৯৫
৪২	হস্তীমূর্তি ঐ	১৯৬
৪৩	অশ্ব ও মুণ্ডহীন পদাতিক ঐ	১৯৭

প্লেট—১ : সূর্য মূর্তি

কোনার্ক জগমোহন। পশ্চিম পার্শ্বদেবতা

পৃঃ—১৯০

প্লেট ২ : মহিষমর্দিনী। বেতালমন্দির। ভুবনেশ্বর

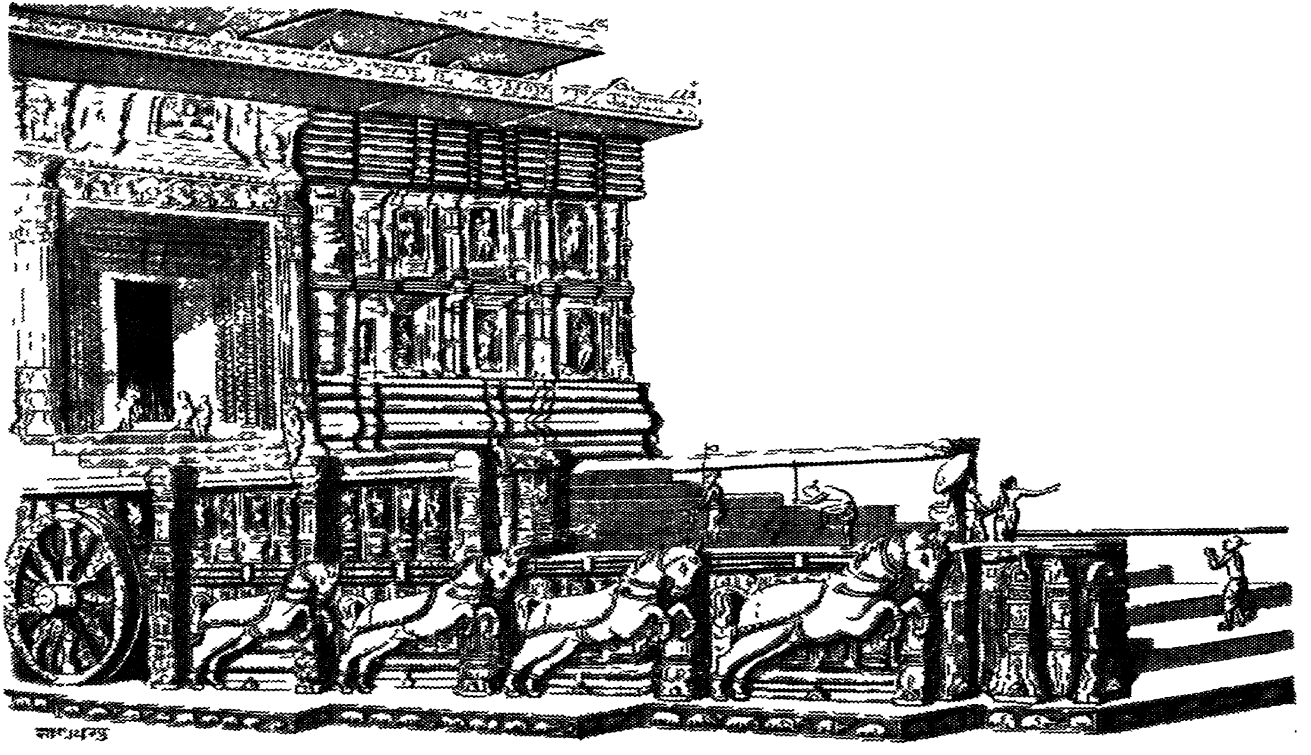

প্লেট ৩ : কোনার্ক জগমোহনের প্রবেশ পথ। সদ্য সমাপ্ত অবস্থায় যা ছিল (লেখকের কল্পনায়)

প্লেট—৪ : বরুণ মূর্তি

রাজারানী। ভুবনেশ্বর পৃঃ—১১৩

প্লেট—৫ : দেবদাসী

কোনার্ক জগমোহন, প্রথম পোতাল, পূর্বমুখী

পৃঃ—১৭৩

প্লেট—৬ : দেবদাসী

কোনার্ক জগমোহন, দ্বিতীয় পোতাল, পূর্বমুখী

পৃঃ—১৭৩

প্লেট—৭ : দেবদাসী

কোনার্ক জগমোহন প্রথম পোতাল, দক্ষিণ প্রান্ত, পূর্বমুখী

পৃঃ—১৭৪

প্লেট—৯ : দেবদাসী
কোনার্ক জগমোহন, প্রথম পোতাল পৃঃ- ৭

প্লেট—৮ : দেবদাসী
কোনার্ক জগমোহন, দ্বিতীয় পোতাল,
উত্তর প্রান্ত, পশ্চিমমুখী পৃঃ—১৮১

প্লেট—১০ : কোনার্ক জগমোহন মিথুন মূর্তি।

পৃঃ—২০৬

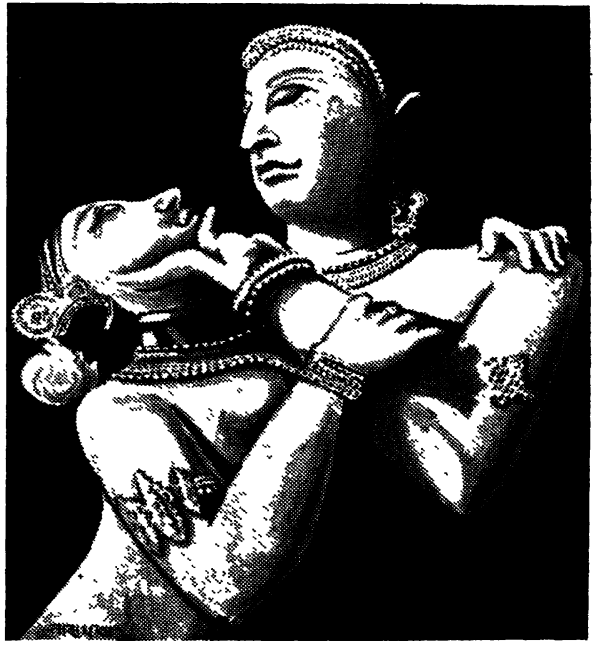

প্লেট—১১ : কোনার্ক জগমোহনে মিথুন মূর্তি।

পৃঃ—২০৬

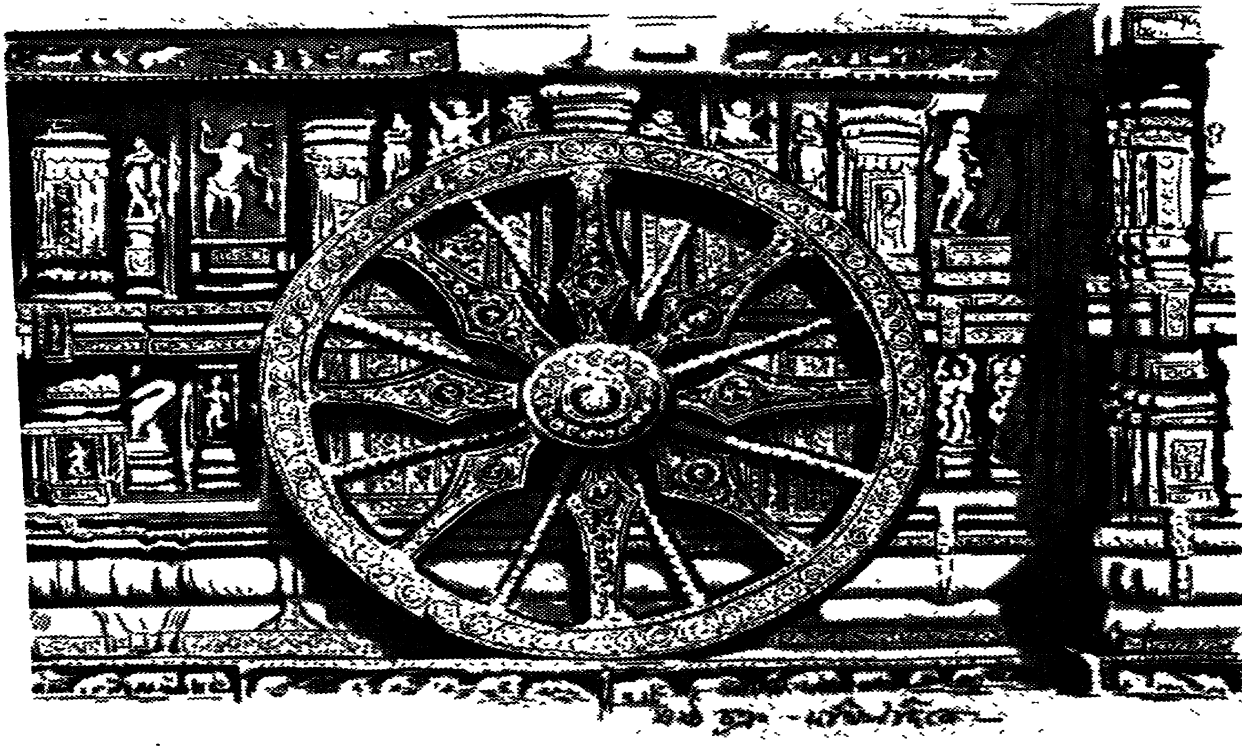

প্লেট—১২ : কোনার্ক জগমোহনে রথচক্র (ষষ্ঠ চক্র দক্ষিণ দিকে)

পৃঃ—১৬৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য ও যুগবিভাগ

বাঙালী ভ্রমণপাগল জাত। হাতে কিছু জমলেই মনটা উড় উড়ু করে। উড়িষ্যা আমাদের হাতের কাছেই, পার্শ্ববর্তী রাজ্য—তাই মধ্যবিত্ত ভ্রমণপাগল বাঙালী তার অজন্তা, মাদুরা অথবা মহাবলীপুরম দেখতে যাবার সাধ মেটায় ঐ পুরী-কোনার্ক-ভুবনেশ্বরে। কিন্তু কোন একটা দেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম—তা সে স্থাপত্যই হ'ক অথবা ভাস্কর্যই হ'ক, রসিয়ে রসিয়ে দেখতে হলে একজন ভাল গাইডের দরকার, অথবা দরকার একখানা ভাল নির্দেশক-গ্রন্থের। উড়িষ্যার মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এক অমূল্য সম্পদ ; দেড়শ বছর ধরে অনেক জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত তা নিয়ে ইংরাজীতে তথ্যবহুল আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সেসব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার ভিন্ন পাওয়ার উপায় নেই। দুষ্প্রাপ্য, তাই সেগুলি বাড়িতে নিয়ে এসে পড়বার ব্যবস্থা নেই—কিন্তু দশটা-পাঁচটার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আপনার আমার মত সাধারণ মানুষ সেসব গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগই কি ছাই নিতে পারি? উড়িষ্যার উপর সহজলভ্য ভ্রমণ-কাহিনীও যথেষ্ট আছে—বাংলাভাষাতেই—কিন্তু তাতে কাহিনীর খাদই যেন বেশি, যথার্থ নির্দেশনার অভাব। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ভুবনেশ্বরের অল্প-খ্যাত কয়েকটি প্রাচীন মন্দির খুঁজে বার করতে আমাকে হিম্‌সিম খেতে হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন শিল্প-নিদর্শন অন্বেষণ করতে গিয়ে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে আমার—স্থানীয় গাইড, পাণ্ডা অথবা রিক্‌সা-ওয়ালার দল ঠিকমত নির্দেশ দিতে পারেনি।

একটা কথা। সেটা সর্বপ্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি।

সেটা অধিকারভেদের কথা। আমার শিক্ষা বা পেশা কোনটাই এ কাজের সহায়ক নয়। তবু এ-কাজে অনধিকার প্রবেশ করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যে প্রকৃত অধিকারীরা এ জাতীয় গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হ'য়ে আসছেন না। ভারতবর্ষের অমূল্য স্থাপত্য ভাস্কর্যের উপরে ভারতীয় ভাষায় রচনা অতি সামান্য ; ইংরাজীতে ইতিপূর্বে যা লেখা হয়েছে তাও শুধুমাত্র পুরাতত্ত্ববিদদের জন্য— আমার-আপনার জন্য নয়। ইদানিং যা লেখা হয়েছে বা হচ্ছে তাও অধিকাংশ ডক্‌টরেট পাওয়ার উদ্দেশ্যে— সাধারণ রসপিপাসু পাঠকের জন্য নয়। এ রচনাটি আমি বিশেষজ্ঞ গবেষকদের জন্য লিখিনি। আবার যাঁরা শুধুমাত্র পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে ও-পথের পথিক হতে চান, অথবা ঘূর্ণিঝড়ের মত সব কয়টি বুড়ি-ছুঁয়ে ক'লকাতায় এসে গল্প করতে চান যে কোন কিছুই তাঁরা বাদ দেননি —ঠিক তাঁদের জন্যও নয়। এ তিন শ্রেণী বাদেও আমার নজরে আর এক শ্রেণীর পাঠক ধরা পড়েছেন। তাঁরা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চান, বুঝতে চান, শিল্পরসের দিকে তাঁদের স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে অথচ দরদী নির্দেশকের অভাবে তাঁরা ঠিকমত রসাস্বাদন করে উঠতে পারেন না বলে ব্যথিত হন। সেই মধ্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভ্রমণপাগল রসপিপাসু বাঙালী পাঠকের জন্যই এ রচনা। এবং তাঁদের জন্য, যাঁরা শারীরিক কারণেই হ'ক, অর্থনৈতিক কারণেই হ'ক স্বচক্ষে এগুলি দেখে উঠতে পারছেন না! ছারপোকা অধ্যুষিত বৈঠকখানার আরাম কেদারায় বসে বই হাতে দেশভ্রমণ করতে চান তাঁরা। এ রচনা তাঁদের জন্য।

শিল্পসম্ভারগুলি বিচার করতে বসে অনেক প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, যাঁর সদুত্তর বই ঘেঁটে অথবা পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি পাইনি। প্রকৃত অধিকারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন-বোধক চিহ্ন রূপেই সেগুলি রেখে গেছি। ভ্রমণকালে শিল্পকর্মগুলির কিছু কিছু স্কেচ করে এনেছি, প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে কিছু নিদর্শন অনুলিপিও

করেছি। চিত্রকর হিসাবে আমার সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া সত্ত্বেও আলোকচিত্রের পরিবর্তে আমি সেগুলিকেই সন্নিবেশিত করেছি একটি বিশেষ কারণে। আমার মনে হয়েছে, এভাবে বক্তব্য-বিষয়টি পাঠকের কাছে আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। যে ব্যঞ্জনাটি পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে তার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা চলবে, যে অংশ মহাকালের নির্দেশে অবলুপ্ত, কল্পনার তুলিতে তাকে ভরিয়ে তোলা যাবে।

কিন্তু সঙ্গীতচর্চার প্রথম পর্যায়ে যেমন সারগমের উপলবন্ধুর বাধা, কাব্যপাঠের সূচনায় ব্যাকরণ যেমন একটি অবাঞ্ছনীয় কিন্তু আবশ্যিক প্রতিবন্ধ; তেমনি উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের ভিতর থেকে আনন্দরসের আস্বাদন করতে হলে আমরা স্থাপত্য-ব্যাকরণের একটি নীরস উপলবন্ধুর বাধার সম্মুখীন হব প্রথমেই। সে পথ আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। নান্যঃ পন্থাঃ। সমকালিন ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মসচেতনতা, এর কোনটাকেই একেবারে উপেক্ষা করা চলবে না। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের মূল ধারাটির সঙ্গে উড়িষ্যা-স্থাপত্যের সম্পর্ক, বিভিন্ন শিল্পনিদর্শনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং ক্রমবিকাশের ধারা এগুলিও আমাদের অনুধাবন করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের জন্য লিখলে এসব আলোচনা হয়তো পৃথক পৃথক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা চলত— কিন্তু আশঙ্কা হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যাবে। তাই প্রতিটি অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে যাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করতে ইচ্ছুক তাঁদের সুবিধা হবে মনে করে ফুটনোটে কিছু কিছু নির্দেশনা রেখে গেছি— সাধারণ পাঠক সেগুলি বাদ দিয়েও পড়তে পারেন।

উড়িষ্যার যাবতীয় দেবদেউল ও স্থাপত্য নিদর্শন নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে বসিনি। সে কাজ গবেষকের। অল্প-দিনের ছুটিতে যেটুকু দেখে আসা সম্ভব—ভুবনেশ্বর-পুরী-কোনার্কের

ত্রিকোণ-ভূখণ্ডে বিধৃত কলিঙ্গের সেই মূল স্থাপত্য-ধারাটিকেই শুধু তৌল করব আমরা।

ভ্রমণ কাহিনীর ক্ষেত্রে ইতিহাসের চেয়ে ভূগোলকেই আমরা বেশি করে আঁকড়ে ধরি। যে পথ দিয়ে চলি সেই পথরেখা ধরেই দেখতে থাকি ও দেখাতে থাকি। ফলে সাল-শতাব্দী অনেক সময় উল্টোপাল্টা ভাবে এসে উপস্থিত হয়। গবেষক কিন্তু সে পথ দিয়ে চলেন না। তাঁর রচনা ইতিহাস আশ্রয়ী। পর পর যেভাবে শিল্প নিদর্শনগুলি সৃষ্ট হয়েছিল তিনি সেইভাবেই বর্ণনা করেন। ভ্রমণকারী পাঠক সূচিপত্র অথবা নির্ঘণ্ট হাতড়ে দ্রষ্টব্য বিষয়টি খুঁজে নেন। আমরা এ-ক্ষেত্রে মধ্যপথ অবলম্বন করব। ঘটনাচক্রে উড়িষ্যার স্থাপত্য বিকাশ যে ক্রমপর্যায়ে বিকশিত হয়েছিল সেইভাবেও ভ্রমণ করা সম্ভব। পর্যায়ক্রমে যদি আমরা ধৌলি, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনার্ক দেখি তাহলে আমাদের ভ্রমণপথ ইতিহাস ও ভূগোল কোনটাকেই অস্বীকার করবে না।

কলিঙ্গ-স্থাপত্যের সার্ধসহস্রবর্ষব্যাপী শিল্প স্ফুরণকে আমরা মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত করতে পারি। এই সুবৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটকটি আপনাদের সামনে মঞ্চস্থ করার পূর্বে নান্দীকারের একটি চুম্বক-ভাষণ আপনাদের শুনিয়ে দেওয়া যেতে পারে— তা থেকে কলিঙ্গ-স্থাপত্যের পাঁচটি যুগের বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা হবে।

প্রথম যুগ : মৌর্য যুগ [খ্রী: পূ: ২৫৭—খ্রী: পূ: ১৫০] প্রায় ১০০ বৎসর :

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : মগধ-সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়—কলিঙ্গ মগধের করদ রাজ্য।

খ) ধর্মীয় প্রভাব : কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতায় অশোকের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বন—বৌদ্ধধর্ম প্রচার —ব্রাহ্মণ্য ও জৈন ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার।

গ) সামাজিক প্রভাব : যুদ্ধের ক্ষতি—পরাধীনতার গ্লানি—মৌর্য প্রভাবে উত্তরাপথের সঙ্গে পরিচয়—পারসীক ও ব্যাকট্রিয়ার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়।

ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : ধৌলি-ঝাউগাদা শিলালেখ—সিংহ স্তম্ভ-শীর্ষ (ভুবনেশ্বর যাদুঘর)—ভাস্করেশ্বরের শিব লিঙ্গ (?)

দ্বিতীয় যুগ : গুহামন্দির যুগ [আ: খ্রী: পূ: ১৪৬—খ্রী: পূ: ৭৫] প্রায় ৭০ বৎসর :

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : কলিঙ্গরাজ করবেলের অভ্যুত্থান (মগধের পুষ্যমিত্র ও অন্ধ্রের শ্রীসতকর্ণীর প্রায় সমসাময়িক) মহা মেঘবাহন বংশের রাজ্যশাসন।

খ) ধর্মীয় প্রভাব : রাজানুগ্রহে জৈন ধর্মের অভ্যুত্থান।

গ) সামাজিক প্রভাব : করবেলের সুশাসনে দেশে সর্বাঙ্গিন উন্নতি। মৌর্যশাসনমুক্ত হওয়ায় মুক্তির স্বাদ।

ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির অসংখ্য গুহামন্দির।

তৃতীয় যুগ : আদি হিন্দু যুগ [৫৭৫খ্রী:—৮০০ খ্রী:] প্রায় ২২৫ বৎসর :

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : অন্ধ্রের শ্রীসতকর্ণীর পুত্র গৌতমী-পুত্র সতকর্ণী কর্তৃক কলিঙ্গ বিজয়—কলিঙ্গ পুনরায় করদ রাজ্য, এবার অন্ধ্রের সাতবাহন রাজের অধীনে। পরে বাঙালার শশাঙ্ক কলিঙ্গ বিজয় করেন—শৈলোদ্ভব বংশের সাময়িক

	অভ্যুত্থান—হর্ষবর্ধনের কলিঙ্গ বিজয় —ভৌমকরদের অভ্যুত্থান।
খ) ধর্মীয় প্রভাব :	পাশুপত ধর্মের প্রবক্তা লাকুলীশ—শৈব ধর্মের জাগরণ ; বৌদ্ধ ও জৈনরা একান্তবাসী। শশাঙ্ক ও ভৌমকরদের প্রভাবে শিবপূজা।
গ) সামাজিক প্রভাব :	দক্ষিণ ও উত্তর দিক থেকে উপর্যুপরি আক্রমণে দেশে অশান্তি।
ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন :	শত্রুঘ্নেশ্বর, ভরতেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, শিশিরেশ্বর, বৈতাল

চতুর্থ যুগ : মধ্যহিন্দু যুগ [৮০০খ্রীঃ—১১০০খ্রীঃ] প্রায় ৩০০ বৎসর :

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব	সোমবংশী রাজন্যবর্গ কর্তৃক ভৌমকরদের বিতাড়ন—কেশরী বংশের প্রতিষ্ঠা। কেশরী বংশ।
খ) ধর্মীয় প্রভাব :	ব্যাপক শিব ও শক্তির পূজা। বৌদ্ধরা কয়েকটি বিহারে সীমাবদ্ধ। জৈনরা প্রায় নিশ্চিহ্ন।
গ) সামজিক প্রভাব :	পূর্বযুগের ধর্মবৈরিতা কমে এসেছে। বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করেরা হিন্দুমন্দিরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। কেশরী রাজাদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সামন্তরাজা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। রাষ্ট্রবিপ্লব সীমিত। শিল্পে স্ফুরণ।
ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন :	মুক্তেশ্বর, রাজারাণী, গৌরী, ব্রহ্মেশ্বর কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, মেঘেশ্বর।

পঞ্চম যুগ : শেষ হিন্দু যুগ [১১০০খ্রীঃ—১৩০০খ্রীঃ] প্রায় ২০০ বৎসর :

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : কেশরীবংশের শেষ অপুত্রক রাজাব দেহান্তে চোরগঙ্গা কর্তৃক গঙ্গা-বংশের প্রতিষ্ঠা।

খ) ধর্মীয় প্রভাব : শৈব ও শক্তিপূজার সমান্তরালে বিষ্ণু পূজার প্রবর্তন—বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থান।

গ) সামাজিক প্রভাব : আর্থিক সচ্ছলতা, ধর্মে সহিষ্ণুতা এবং শিল্পেব স্ফুরণ।

ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : লিঙ্গরাজ, অনন্ত বাসুদেব, জগন্নাথ ও কোনার্ক।

এই সাধসহস্র বর্ষব্যাপী শিল্প-সাধনা যে ত্রিকোণ ভূখণ্ডে বিধৃত সেই ভুবনেশ্বর-পুরী-কোনার্কের স্থাপত্যচিন্তাব একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে যা ভাবতীয় হিন্দু-স্থাপত্যচিন্তার অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনন্য। সমগ্র ভারতবষে সপ্তম শতাব্দী থেকে মন্দির নির্মাণ কাজের একটা জোয়ার এসেছিল। এই ভূখণ্ডে তার বহু পূর্ব থেকেই পাথরের কাজে শিল্পীদের দক্ষতা লক্ষ্য করা গেছে, যদিও উড়িষ্যাতেও ব্যাপক মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয় ঐ একই সময় থেকে। কিন্তু উড়িষ্যার শিল্পীদল পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শিল্পীদের মাপজোপ-রীতি-নীতি অনুকরণ করেননি। দেশীয় শিল্পসাধকেরা শাস্ত্রে যে নির্দেশ রেখে গেছেন নিষ্ঠাভরে সে নির্দেশ তাঁরা মেনে চলেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। মন্দির নগর আরও অনেক আছে এই মহান উপদ্বীপে—আহিওল, মহাবলীপুরম অথবা খাজুরাহেও আছে অসংখ্য মন্দির—কিন্তু সেগুলি কয়েক শতাব্দীর সাময়িক শিল্পস্ফুরণমাত্র, দীর্ঘকালের ধারাবাহিকতা সেখানে নেই। অপরপক্ষে পাটলিপুত্র, বারানসী অথবা ইন্দ্রপ্রস্থে ধারাবাহিকতার অভাব নেই; কিন্তু স্থাপত্য-

ভাস্কর্যের এমন বহিঃ প্রভাবমুক্ত আঞ্চলিক 'স্টাইল' বলে সেখানে কিছু নেই।

একটা কথা। যদিও আমরা আমাদের কলিঙ্গ-স্থাপত্যের পরিক্রমা পঞ্চম যুগের কোনার্ক মন্দিরেই সমাপ্ত করতে যাচ্ছি, তবু *এইসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে কলিঙ্গ শিল্পীরা ঐখানেই থেমে থাকেন* নি। পরবর্তী যুগেও ওখানে মন্দির হয়েছে, মূর্তি তৈরী হয়েছে, আজও হয়—কিন্তু নিঃসন্দেহে কোনার্কেই এ শিল্পের সর্বোচ-তুঙ্গ—তারপর যা কিছু হয়েছে তা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অবক্ষয়ীরূপ। সম্ভবতঃ এর পরে মুসলমান আধিপত্যের যুগে রাজানুগ্রহে বিশাল মন্দির গড়ার প্রশ্নই ওঠেনি। পৃষ্ঠপোষকের অভাবেই এ শিল্প অবক্ষয়ের পথে যাত্রা শুরু করল—কিন্তু শিল্পীমন তো সেজন্য থেমে থাকতে পারে না। প্রকাশের যন্ত্রণায় সে আপনিই অন্য পথ করে নেয়। বোধকরি তাই হয়তো দেখছি এর পরের যুগে কলিঙ্গ শিল্পীর দল শিল্পের অন্যান্য অনাবিষ্কৃত পথে রসের অভিসারী হয়ে পড়েছেন। জন্ম নিচ্ছে নূতন নূতন শিল্প—হাতে-লেখা পুঁথির উপর সূক্ষ্ম তুলির কাজ, পিতল-কাঁসা-রূপার অপূর্ব ঢালাইয়ের কাজ, বয়ন শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাঁথা, কাঠের কাজ! স্থাপত্য-ভাস্কর্যেও যা দেখেছি এখানেও তাই দেখছি—কলিঙ্গ তার নিজস্ব ছাপ রাখতে চায় তার প্রতিটি শিল্পে। ওদের রূপা-কাঁসা-পিতলের বাসনে যে সূক্ষ্ম কারিগরী তার একটা বিশেষজাতের রূপরীতি বা 'স্টাইল' আছে। কটকী শাড়ী, কটকী মীনার কাজ সহজেই তার বিশেষ রূপটি প্রকাশ করে। ধরা যাক নৃত্য শিল্পের কথা। উড়িষ্যার 'ওডিসি'-নাচ তার বিশেষ ছাপটি ছাড়েনি। তামিলনাদের 'ভারত নাট্যম' বা 'মোহিনী আট্যম্', কেরলের 'কথাকলি', অন্ধ্রের 'কুচিপুডি', উত্তরখণ্ডের 'কথক', আসামের 'ছউ' অথবা মনিপুরের 'মনিপুরী'-র যেমন এক একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা 'ঢঙ' আছে, 'ওডিসি'-নাচেরও তেমনি আছে সম্পূর্ণ নিজস্ব স্টাইল। সেই বিশেষত্বটুকু কী তা বুঝতে হলে আপনাদের ওড়িয়া

গবেষক শ্রীকবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়েকের গবেষণা গ্রন্থটি দেখতে হবে।

কিন্তু উড়িষ্যার যাবতীয় শিল্পকলা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। আমাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র তার দেব-দেউলে নিবদ্ধ। এত কথার অবতারণা করছি শুধু জানাতে যে, কলিঙ্গবাসীরা, আমার মনে হয়েছে, জাতিগতভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে রক্ষণপন্থী, 'কন্‌সারভেটিভ'। ভাবতে অবাক লাগে—যে কলিঙ্গ তার শ্রীক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার গোঁড়ামিকে একেবারে নস্যাৎ করে ফেলল—যা নাকি আসমুদ্র হিমাচলে আর কোথাও সম্ভবপর হল না—সেই কলিঙ্গই কি করে তার যাবতীয় শিল্পে—ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, নাচে, গানে, মীনার কাজে, বস্ত্রশিল্পে এতটা রক্ষণশীল হয়ে থাকল সহস্রাব্দিকাল ধরে। আশ-পাশের শিল্প স্ফুরণ সে দেখেছে, বুঝেছে—কিন্তু নিজ জারকরসে সম্পূর্ণ জীর্ণ না করে কোন কিছুই সে গ্রহণ করেনি। ধরুন ভাষার কথা। 'ওড়িয়া' বোধকরি উত্তর ভারতের সংস্কৃতজ একমাত্র ভাষা যে অর্ধসহস্রাব্দিকালের ভিতর সবচেয়ে কম বদলেছে। মাগধি প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের ছয়টি ভাষার (বাংলা, ওড়িয়া, আসামি, মৈথিলী, মাগধি এবং ভোজপুরী) মধ্যে ওড়িয়াই তার শব্দের অন্তস্থ স্বরবর্ণকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই এই ছয়টি ভাষার মধ্যে রক্ষনশীল ওড়িয়াই আদিম 'মাগধি অপভ্রংশ'গুলি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে।

কলিঙ্গের দেব-দেউল দেখতে যাবার আগে ওড়িয়াদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু জেনে রাখা ভাল। ভাবের রাজ্যে বাঙলার সঙ্গে চিরকালের নাড়ির যোগ আছে কাশীর এবং পুরীর। তাই কাশী উত্তর প্রদেশে এবং পুরী উড়িষ্যাতে হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুটি স্থানে গেলে বাঙালীর মনে হয় না বিদেশে এসেছি।

স্যার জন মার্শাল বলেছিলেন, ভারতবর্ষে কোন বিদেশী এলে তাঁর পক্ষে অন্তত ছয়টি জিনিস দেখা উচিত—'অজন্তা-এলোরা-সাঁচী-

খাজুরাহো-কোনার্ক এবং তাজমহল।' গণ্ডীটিকে আরও যদি ছোট করি তবে বলব ভারতবর্ষেব সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি সম্পদ হচ্ছে—অজন্তা, কোনার্ক এবং তাজমহল।

এই কোনার্কের সাগরসঙ্গমে যাত্রা করতে হলে আমাদের অভিযান শুরু হবে কলিঙ্গ শিল্প-গঙ্গোত্রীর সেই ধৌলি গোমুখীতে। ধৌলি পর্বতের সেই নাতিবৃহৎ হস্তীমূর্তিটিতে। বালিপাথর খুদে বার করা এই গজোত্তম-মূর্তিটিতেই আমরা দেখতে পাব কলিঙ্গের প্রাচীনতম শিল্পকর্ম—মহেন্-জো-দাড়ো ও হরাপ্পার কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষের বোধকরি আদিমতম ভস্কর্য-নিদর্শন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৌর্যযুগ [খ্রীঃ পূঃ ২৫৭—খ্রীঃ পূঃ ১৫০]

ভুবনেশ্বরের মাইল পাঁচেক দক্ষিণে পুরী যাবার পথের ধারে, ডানদিকে, ধৌলি পর্বত বা ধৌলিগিরির পাদদেশে ভারতবর্ষের অন্যতম একটি প্রাচীন শিলালিপির সন্ধান পাবেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পর মৌর্যসম্রাট অশোক বালিপাথর খোদাই করে এই শিলালিপিটি লেখান। শিলালেখের উপরে পাথরের মাথায় ঐ একই পাথর খোদাই করে তৈরী করা হয়েছিল দণ্ডায়মান একটি হস্তীমূর্তির

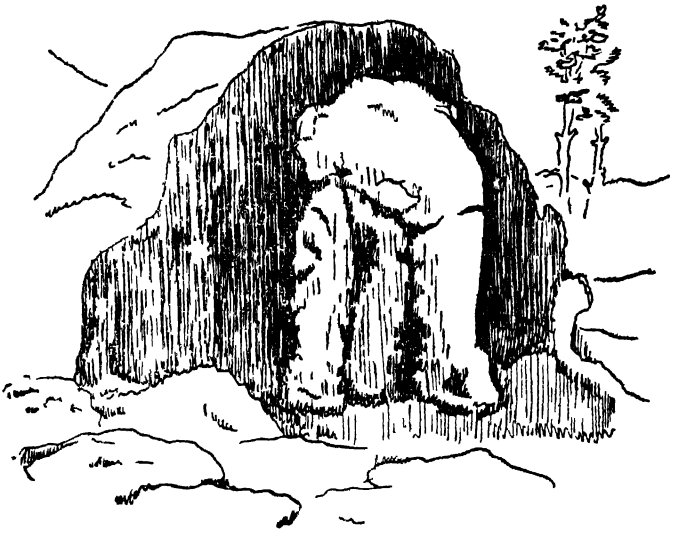

চিত্র—১ ॥ ধৌলি শিলালেখের উপরে খোদিত হস্তীমূর্তি

সম্মুখাংশ। উচ্চতায় প্রায় চার ফুট এই হস্তীটি হচ্ছে তথাগত বুদ্ধের প্রতীক—যে বুদ্ধদেব শ্বেতহস্তীর রূপ ধরে মাতৃগর্ভে প্রবেশ

করেছিলেন—পালিভাষায় যাঁকে বলা হয় গজতমে (=সংস্কৃতে গজোত্তম)। মৌর্যযুগের পাথরের কাজে যে মসৃণ পালিশ সর্বদাই প্রায় লক্ষ্য করা যায়, এ মূর্তিটিতে কিন্তু তেমন পালিশ নেই। তার কারণ অশোকস্তম্ভ সচরাচর চুনারের পাথরে খোদাই করা হত—তাতে পালিশ ওঠে ভাল ; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বয়ম্ভু প্রস্তরখণ্ডেই শিলালেখের উপরে হস্তীমূর্তিটি খোদাই করা হয়েছিল (চিত্র-১)।

সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে যেসব শিলালেখ রেখে গেছেন তাতে দেখতে পাই বাঁধা-বয়ানের চতুর্দশটি অনুশাসন। ধৌলিতে কিন্তু দেখছি, প্রথম থেকে শুধু দশম অনুশাসন পর্যন্ত উৎকীর্ণ করা—এবং চতুর্দশতম অনুশাসনও অবিকৃত ; শুধুমাত্র একাদশ থেকে ত্রয়োদশ—এই তিনটি অনুশাসন অনুপস্থিত। শুধু অনুপস্থিত নয়, তার পরিবর্তে দুটি নূতন বাণী সংযোজন করেছেন মৌর্যসম্রাট। এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঐ তিনটি অনুপস্থিত অনুশাসনে সম্রাট অন্যত্র জানিয়েছিলেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতায় তিনি মর্মাহত, সে-যুদ্ধে লক্ষাধিক কলিঙ্গবাসী নিহত হয় এবং দেড়লক্ষ বন্দী হয় ; জানিয়েছিলেন—সংখ্যাতীত কলিঙ্গবাসী পরবর্তী মহামারী ও অনাহারে প্রাণ হারায়। বুদ্ধিমান সম্রাট বিজিত কলিঙ্গরাজ্যে এই মর্মান্তিক সংবাদটি বিজ্ঞাপিত করেননি—তিনি জানতেন, এই ভয়াবহ দুঃসংবাদটি কলিঙ্গবাসী যতশীঘ্র ভুলে যাবে ততই মঙ্গল। ধৌলি শিলালেখে এই অনুশাসন তিনটির অনুপস্থিতি যে কাকতালীয় নয় তার প্রমাণ সম্রাটের ঝাউগাদা শিলালেখ। কলিঙ্গে অবস্থিত এই দ্বিতীয় শিলালেখেও ঐ তিনটি অনুশাসন অনুপস্থিত। পরিবর্তে ঝাউগাদা ও ধৌলিতে দুটি বিশেষ অনুশাসন যুক্ত হয়েছে—যা ভারতবর্ষের অন্যান্য অশোক শিলালিপিতে অনুপস্থিত। এই নূতন অনুশাসন দুটি আবার হুবহু এক নয়—ঝাউগাদা ও ধৌলিতে অবস্থিত দুটি নূতন অনুশাসনে অতি সামান্য প্রভেদ আছে, যা থেকে আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাচ্ছি।

নূতন অনুশাসনদ্বয়ের প্রথমটিতে সম্রাট তাঁর অমাত্যদের আদেশ দিয়েছেন—তাঁরা যেন পক্ষপাতশূন্য হয়ে প্রজাদের প্রতি সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করেন এবং দ্বিতীয়টিতে তোশলীর রাজপ্রতিনিধি এবং মহাপাত্রদের জানিয়েছেন যে, কলিঙ্গের যে-অঞ্চল সম্রাট জয় করেননি সেই প্রান্তবাসী স্বাধীন কলিঙ্গবাসীদের প্রতিও সম্রাট শুভাকাঙ্খী। এই দুই অনুশাসনে সম্রাট তাঁর যাবতীয় প্রজাবর্গকে পুত্র-সম্বোধন করেছেন। 'অশোক' এই নাম কোথাও নেই, নিজেকে তিনি প্রিয়দর্শী বলেছেন শুধু।

আগেই বলেছি, ঝাউগাদা ও ধৌলিতে অবস্থিত দুটি শিলালেখের বয়ানে সামান্য প্রভেদ আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ঝাউগাদাতে সম্রাট ঐ অনুশাসনটি উৎকীর্ণ করিয়েছেন শুধুমাত্র মহামাত্রকে উদ্দেশ করে অথচ ধৌলিতে বলেছেন মহামাত্র এবং তোশলীর রাজপ্রতিনিধিকে উদ্দেশ করে। এ থেকে বোঝা যায়, বিজিত কলিঙ্গরাজ্যে মগধরাজ-প্রতিনিধির অধিষ্ঠান ছিল ধৌলির অনতিদূরে কোন স্থানে— যার প্রাচীন নাম তোশলী।

স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—কোথায় ছিল সেই তোশলী? মগধ-সম্রাট অশোক বস্তুতঃ একবারই মাত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—অন্য কোন দেশীয় রাজা মাগধি সেনাবাহিনীকে এ-ভাবে প্রতিহত করতে পারেনি। অশোকের শিলালেখই যথেষ্ট প্রমাণ যে তদানিন্তন কলিঙ্গরাজ প্রচণ্ডভাবে মৌর্যসম্রাটকে বাধা দিতে পেরেছিলেন এবং তা থেকে বোঝা যায় প্রাক-মৌর্য-যুগেও কলিঙ্গে একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন—না হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আড়াই লক্ষাধিক সৈন্যসমাবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হত না। শুধু তাই নয়, ঐ বিপুল সৈন্যবাহিনীর অন্তরে স্বাধীনতাস্পৃহার যে নিদর্শন দেখতে পাই তার পিছনে দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার উপযুক্ত শতাব্দীসঞ্চিত মানসিক প্রস্তুতির উপস্থিতি অনস্বীকার্য। সুতরাং স্থাপত্যকীর্তির প্রাচীনতম নিদর্শনকে পিছনে ফেলে সেই

বিস্মৃত অতীতের দিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কলিঙ্গ সংস্কৃতির আরও উজানে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার।

সে অবলুপ্ত অতীত যাত্রায় আমাদের তিনটি পাথেয়। প্রথমতঃ ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে রক্ষিত অতি প্রাচীনকালের হাতে-লেখা পুঁথি, যাকে বলি মাদলাপঞ্জী। দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ—একাম্র-পুরাণ, স্বর্ণাদ্রি-মহোদয়, একাম্র-চন্দ্রিকা, কপিল-সংহিতা ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ উড়িষ্যার প্রাচীন লোকগাথা। একে একে এগুলি বিচার করা যাক।

৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাতে-লেখা তালপাতার যে পুঁথি আছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা দ্বিমত। প্রথম যুগে স্টারলিঙ[১], হাণ্টার[২], ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়[৩] অথবা রাজেন্দ্রলাল মিত্র[৪] এই পুঁথি থেকেই কলিঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীযুগে ইতিহাসবেত্তা চন্দ[৫] অথবা বন্দ্যোপাধ্যায়[৬] প্রাচীন কলিঙ্গের ইতিহাস সন্ধানে মাদলাপঞ্জীকে একেবারেই আমল দেননি। তাঁদের মতে এর কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। অপরপক্ষে বর্তমান উড়িষ্যার কয়েকজন ঐতিহাসিক শুনেছি মাদলাপঞ্জীকেই অভ্রান্ত সত্য বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন পণ্ডিতের তর্ক-বিতর্ক থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে, মাদলাপঞ্জীর যাবতীয় বিবরণ নির্ভুল এ কথা বলা যেমন বাতুলতা, তেমনি তার আদ্যন্তই

(১) An account of Orissa Proper or Cuttack, 1822—A. Stirling (Asiatic Researchar Vol. XV)

(২) Orisia, Vol. I & II—Hunter.

(৩) পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪) Antiquities of Orissa, 1875—R. L. Mitra

(৫) J. B. O. R. S, Vol. XIII. 1927.—Prof. R. Chanda.

(৬) History of Orissa, Vol. I pp.109, 219—Prof. R. D, Banerji

ভ্রান্ত এ-কথা বলাও ভুল। বস্তুতঃ স্থানে স্থানে ঐ হাতে-লেখা পুঁথি থেকে ঐতিহাসিক সত্য সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসে। কেমন করে, সে-কথা যথাস্থানে আলোচনা করব। একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে পুরীর মন্দিরের উপর বার বার বিধর্মীদের আক্রমণ হয়েছে—ফলে বারে বারে ঐ পুঁথি স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। সম্রাট আকবরের সমসময়ে বাঙলার নবাব সুলেমানের সেনাপতি উড়িষ্যা আক্রমণ করে এবং পুরীর মন্দির ও তার যাবতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে স্মৃতির উপর নির্ভর করে ঐ অবলুপ্ত মাদলাপঞ্জী পুরোহিত ও পাণ্ডারা পুনরায় লেখান অথবা লেখেন। ফলে ভুল না থাকাই অস্বাভাবিক হত।

এই মাদলাপঞ্জী অনুযায়ী কলিঙ্গের ইতিহাসে প্রথম নৃপতি হচ্ছেন মহাভারতের পাণ্ডবাগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির, যাঁর রাজত্বকাল, মাদলাপঞ্জীমতে খ্রীঃ পূঃ ৩১০১—৩০৮৯[১]। হিসাবমত তারপর পরীক্ষিৎ, জন্মেঞ্জয়, শঙ্করদেব প্রভৃতি দীর্ঘনামের তালিকা অতিক্রম করে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় বুদ্ধদেবের সমসময়ে পাচ্ছি বজ্রদেবকে, যাঁর রাজত্বকালে কলিঙ্গদেশ নাকি উত্তর থেকে যবন রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজা বজ্রদেব এবং তাঁর পরবর্তী রাজা ভোজদেব যবন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং যবন সৈন্য বিতাড়ন করেন। এরপর আবার কয়েকটি রাজার নাম পার হয়ে চতুর্থ শতাব্দীতে দেখছি রাজা শোভনদেব যখন কলিঙ্গের সিংহাসন আসীন তখন পুনরায় রক্তবাহু যবন-সৈন্য কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করে। রাজা শোভনদেব ৺জগন্নাথদেবের মূর্তি নিয়ে শোনপুরের দিকে পালিয়ে যান। পুঁথিমতে তারপর কলিঙ্গের সিংহাসনে এসে বসেন একজন পরাক্রমশালী রাজা ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনিই বিখ্যাত

(১) History of the Rajas of Orissa—translated from Vamsāvali in the Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. VI (1837) pp. 756 – 766

কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়তী কেশরী। তাঁর রাজধানী ছিল জয়পুরে। যবন আক্রমণ তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করেন, রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন এবং শোনপুরের দিক থেকে জগন্নাথদেবের মূর্তিটি পুনরায় স্বরাজ্যে আনিয়ে বিখ্যাত পুরীর মন্দির নির্মাণ করান। অর্থাৎ মাদলাপঞ্জীমতে জয়তী কেশরীই পুরীর বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা; আর সে মন্দির ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের অগ্রজ; কারণ পঞ্জীমতে দেখছি—জয়তী কেশরীর তিনপুরুষ পরে অলাবু কেশরী (৬২৩—৬৭৭ খ্রী) লিঙ্গরাজের মন্দির শেষ করেন।

মাদলাপঞ্জীর বিবরণ যে নির্ভুল নয় একথা আগেই বলেছি, কিন্তু এটিকে আদ্যন্ত গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারছি না। ফলে দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ, অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এ বিবরণ যাচাই করে দেখতে চাই।

মহাভারতের আদি পর্বেই আমরা কলিঙ্গ দেশের নাম পাচ্ছি। ঋষি দীর্ঘতমার আশীর্বাদে বালির পত্নী সুদেষ্ণার পাঁচটি সন্তান হয়েছিল। তাঁরা পাঁচজন পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, যথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। ব্রহ্ম পুরাণে[১]ও এই কাহিনীর সমর্থন আছে। এমন কি ঋগ্বেদেও আমরা উতথ্যমুনীর পুত্র, বৃহস্পতির পৌত্র দীর্ঘতমা ঋষির নাম পাচ্ছি[২], যদিও সেখানে কলিঙ্গের জনক হিসাবে তাঁর পরিচয়টা পাই না। এ ছাড়াও মহাভারতে একাধিকবার কলিঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে বিবাহ করেন[৩]। বনবাসকালে যুধিষ্ঠির যখন গঙ্গাসাগর থেকে সমুদ্রতীর ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে অগ্রসর

১) ব্রহ্মপুরাণ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ২৯-৩১

২) ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ১৪৭

৩) শান্তিপর্ব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হন তখন লোমশমুনী তাঁকে বলেন[১], বৈতারিণী নদীতীরে আছে কলিঙ্গ রাজ্য, যেখানে দেবগণের আশীর্বাদভিক্ষু স্বয়ং ধর্মরাজ যজ্ঞ করেন।

ঐতিহাসিকদের মতে ঋগ্বেদ আঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এবং মহাভারতের যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ৯০০ অব্দের ঘটনা। সুতরাং এইসব উদ্ধৃতি থেকে অন্ততঃ এটুকু আমরা অনুমান করতে পারি যে, প্রাক-মৌর্য যুগেই কলিঙ্গ দেশে একটি সভ্য জনপদ ছিল—যার উত্তরসাধকদের পক্ষে সম্রাট অশোককে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

অবলুপ্ত অতীত ইতিহাসের সন্ধানে আমরা মাদলাপঞ্জী, পুরাণ ও উড়িষ্যার প্রাচীন লোকগাথাকে অবলম্বন করে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি। কিন্তু ঐ তিনটি পথ ছাড়া আরও একটি বিজ্ঞান-স্বীকৃত পথ আছে, এবার সেটা যাচাই করে দেখি—আমি বলছি নৃতত্ত্বের কথা।

ভাষাবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদেরা বলছেন স্মরণাতীত কাল থেকেই এই ভারত-ভূখণ্ডে যুগে যুগে বিভিন্ন মানুষের ধারা এসে মিশেছে, মিলেছে। কলিঙ্গ বা উৎকলবাসীদের আদিম উৎপত্তির গোমুখীতেও আমরা দেখতে পাব সেই 'দিবে আর নিবে'-র মূল ছন্দ। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে চারটি ধারা এসে মিশেছে ভারতীয়দের বর্তমান রূপ দিতে। তারা হল: নিষাদ (অস্ট্রো-এশিয়াটিক), দ্রাবিড় (দ্রামিড়), কিরাত (মঙ্গোলয়েড), এবং আর্য।

নৃতত্ত্ববিদেরা বলছেন সবার আগে এসেছিল 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' মনুষ্য বিভাগের সেই শাখাটি যাকে ওঁরা নাম দিয়েছেন 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' শাখা। যাদের কথ্য-ভাষা আজও ভারতবর্ষে টিকে আছে—কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, শবরদের কথোপকথনে। এদের

১) এতে কলিঙ্গা কৌন্তেয় যত্র বৈতরিণী নদী।
যত্রাৎযপত ধর্ম্মোঽপি দেবাচ্ছরণমেত্য বৈ॥ বনপর্ব, প্রথম অধ্যায়।

আদিম পুরুষ নাকি এসেছিল ভূমধ্য সাগরের প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া অঞ্চল থেকে। জানি, আপনারা এখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলবেন, 'বাপু হে, তবে কি ধরে নেব তাঁরা এসে একেবারে ফাঁকা মাঠে গোল দিতে শুরু করলেন ?'

জবাবে আমাকে বলতে হবে—'না, তার পূর্বেও এখানে মনুষ্য-বাস ছিল। ছিল 'নিগ্রয়েড'-রা—যারা এসেছিল আফ্রিকা থেকে। কিন্তু ভারতীয়ের রক্তেও যেমন ভারতীয় সংস্কৃতিতেও তেমনি—ওদের কোন অবদান বস্তুত নেই। নিষাদ বা অস্ট্রো-এশিয়ানরা এদের নিশ্চিহ্ন করে—ওরা বর্মা, আন্দামান, মালয় এমন কি সুদূর ফিলি-পাইন, নিউগিনি অঞ্চলেও পালিয়ে যায় ওদের ক্যানোয় চেপে।'

সে যাই হোক, নিষাদের একটি শাখা প্রাকার্য যুগে উড়িষ্যায় একটি খুঁটি গেড়েছিল একথা বোঝা যায়। ওদের সঙ্গে সংঘাত বাধল দক্ষিণাঞ্চলের দ্রামিড়দের বা দ্রাবিড়দের, যাদের চারটি ভাষা আজও ভারতবর্ষে টিকে আছে—তেলেগু, কানাড়, তামিল ও মালায়লম। এদের পূর্বপুরুষ নাকি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে, যেখান থেকে আর একটি শাখা নেমে এসেছিল গ্রীসে, এসে-ছিল ক্রীটে।

নিগ্রয়েড-দের যেভাবে তাড়ানো গিয়েছিল, এই দুটি দল—নিষাদ ও দ্রাবিড়েরা কিন্তু সেভাবে কেউ কাউকে তাড়াতে পারল না ; ফলে তারা মিলে-মিশে গেল কয়েক শতাব্দীর ভিতর। এ ঘটনা আর্য আগমনের আগে—মহেন-জো-দাড়ো, হরপ্পার প্রায় সমসাময়িক। এর পরই এসেছিল উত্তরাপথ থেকে মঙ্গোলীয়-দলের একটি শাখা—তাদের পীতাভ বর্ণ, উন্নত হনু, তীর্যক চোখ নিয়ে। ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে কোন কোনও অঞ্চলে তাদের প্রভাব চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখেছে বটে—যেমন আসাম, উত্তরবঙ্গ থেকে তরাই অঞ্চল বেয়ে কাশ্মীর পর্যন্ত—কিন্তু উপকূল ভাগে, বিশেষ করে কলিঙ্গে তাদের অবদান নেই বললেই চলে। এ-ছাড়া উত্তর-পশ্চিম থেকে এসেছিল

আর্যরা, ধরা যাক ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। প্রাচীন কলিঙ্গ ভূমেও ঐ নবাগত আর্যদের সঙ্গে এই নিষাদ ও দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের সংঘাত চলেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। ক্রমে 'দিবে-আর নিবে'-র সূত্র মেনে নিয়ে মহামানবের এই উড়িষ্যার সাগর তীরেও ওরা 'এক দেহে হল লীন!'

খ্রীষ্ট জন্মের হাজার বছর আগে কলিঙ্গে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল যেন তারই আবার পুনরভিনয় হল খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের ভিতর। নিষাদ-দ্রাবিড়দের অধঃস্তন পুরুষ অজ্ঞাত কলিঙ্গরাজ আর্য মগধ-সম্রাট অশোককে প্রতিহত করবার চেষ্টা করলেন তোশলীর রণক্ষেত্রে। যার ফলশ্রুতি ঝাউগাদা ও ধৌলির শিলালেখ!

অশোকের সেই শিলালেখ থেকে কথা প্রসঙ্গে আমরা অনেকদূরে সরে এসেছি। এবার সেই মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। সম্রাট অশোকের উল্লিখিত তোশলী জনপদ কোথায় ছিল? ধৌলির কাছাকাছি এটুকু অনুমান করা যায়। কিন্তু কোথায়?

ধৌলি শিলালেখের অবস্থান থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বে এবং ভুবনেশ্বর শহরের দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে একটি অতি প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে শিশুপালগড়ে। এটি একটি অবলুপ্ত নগরের ধ্বংসাবশেষ। জনপদের চতুর্দিকে রাজগৃহের অবরোধের মত সুউচ্চ প্রাচীর এবং তাতে দুটি তোরণদ্বার; কিছু পোড়ামাটির তৈজস এবং কয়েকটি মুদ্রা ছাড়া এখানে আর কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। তবু বিশেষজ্ঞেরা[১] বলছেন, এ জনপদে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মনুষ্যবাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এই শিশুপালগড়ই হচ্ছে সেই অশোক-বর্ণিত তোশলী, যেস্থান থেকে কলিঙ্গের চেদীরাজ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

১) Ancient India, No. 5, p. 62-105

অশোকের প্রায় দু'শ বছর পরে কলিঙ্গরাজ করবেল যে এখানে রাজত্ব করতেন তার প্রমাণ আছে উদয়গিরির হাতীগুম্ফা শিলালেখে। কিন্তু হাতীগুম্ফা হচ্ছে আমাদের যুগ-বিভাগ হিসাবে দ্বিতীয় যুগে। সে কথা এখানে নয়। আমরা এখনও আছি মৌর্য-যুগে।

অশোকের ধৌলি ও ঝাউগাদা শিলালেখ ছাড়া মৌর্যযুগের কোনও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন উড়িষ্যায় দেখতে পাওয়া যায়নি। বিতর্কমূলক কয়েকটি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে ভুবনেশ্বরে—এবার তাই নিয়ে আলোচনা করি। পুরাতত্ত্বের-এ নিরস আলোচনা কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনীর মত কৌতূহলোদ্দীপক!

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র গত শতাব্দীর শেষপাদে সন্দেহ প্রকাশ করে বসলেন—ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ভাস্করেশ্বর মন্দিরের মূল শিবলিঙ্গটি আসলে নাকি একটি অশোক স্তম্ভের ভগ্নাংশ[১]! কী সাঙ্ঘাতিক কথা! রাজেন্দ্রলালের সব কথাতেই দেখছি ফার্গুসন-সাহেব আপত্তি জানাতেন। এ ক্ষেত্রেও তাইহল। তাছাড়া রাজেন্দ্রলাল তাঁর সন্দেহের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তিরও অবতারণা করেননি। ফলে পরবর্তী গবেষকের দল—মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলকুমার বসু এবং শ্রী কে. এন. মহাপাত্র প্রভৃতি এ-মত মেনে নিতে পারেননি। সব দিক বিবেচনা করে আমার কিন্তু মনে হয়েছে প্রায় একশ বছর আগে রাজেন্দ্রলাল যে কথাটা বলেছিলেন তার-মধ্যেই সত্য আছে—ঐ শিবলিঙ্গটি অশোক স্তম্ভেরই ভগ্নাংশ। শ্রীপানিগ্রাহী তাঁর গ্রন্থে[২] এ বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।

আলোচ্য শিবলিঙ্গটি আকারে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত যে কোন শিবলিঙ্গের তুলনায় অতি প্রকাণ্ড। উচ্চতা—নয় ফুট; লিঙ্গমূলের পরিধি—সাড়ে বার ফুট; গৌরী-পীঠের বেড় প্রায় কুড়ি ফুট। লক্ষ্য করবার বিষয়, শিবলিঙ্গের গায়ে ছেনির দাগ আছে, যেন রীতিমত

১) Antiquities of Orissa, Vol. II p. 89.
২) Archaeological Remains of Bhubaneswar. pp. 183-186.

আয়াসে তার মসৃণতা অথবা কোন প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে তুলে ফেলা হয়েছে। আরও লক্ষ্য করা যেতে পারে, গৌরী-পীঠের পাথরখানি একটি পাথর কেটে বার করা হয়নি, —যা অন্য সব শিবলিঙ্গে দেখা যাচ্ছে,—সেখানি চারটি পৃথক পাথরের সমাহার। বেশ বোঝা যায়, কেন্দ্রস্থ শিবলিঙ্গের চারদিকে গৌরী-পীঠ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রী পানিগ্রাহী ঐ শিবলিঙ্গের গায়ে কিছু ব্রাহ্মী অক্ষর দেখেছেন বলেও দাবী করেন। সে সময়ে শিশুপালগড়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাজ চলছিল। সে কার্যের ভার-প্রাপ্ত পুরাতত্ত্ববিদের দৃষ্টি এ-দিকে আকর্ষণ করা হলে ভাস্করেশ্বর মন্দিরের কাছে-পিঠে অনুসন্ধানের কাজ চালান হয়। ফলে, মন্দিরের উত্তর-দ্বারের প্রায় চারশ' ফুট দূরে মাটির ভিতর থেকে একটি 'বেদিকা-থভ' (স্তূপের চতুর্দিকে যে রেলিং থাকে তার স্তম্ভ) আবিষ্কৃত হয়—নিঃসন্দেহে সেটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। মনে হয়, এখানে একটি অশোক স্তম্ভই শুধু ছিল না, একটি স্তূপও ছিল। 'বেদিকা-থভ' আবিষ্কারে উৎসাহিত হয়ে আরও অনুসন্ধান চালান হয়—এবার মন্দিরের উত্তর-দ্বারের মাত্র চল্লিশ ফুট দূরে মাটির নীচে থেকে উদ্ধার করা হল একটি সিংহ-মূর্তির ঊর্ধ্বাংশ। সিংহ-মূর্তিটি প্রকাণ্ড, সেটি শিবলিঙ্গ যে পাথরে তৈরী সেই পাথরের এবং মূল-মন্দির সে পাথরের নয়। ভুবনেশ্বরের যাদুঘরে ঐ সিংহ মূর্তিটি এখনও দেখতে পাবেন একতলার ঘরে ; উচ্চতায় সাড়ে তিন-ফুট, পরিধিতে সাড়ে আট ফুট। মূর্তিটির গায়ে পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত হরফে লেখা আছে 'শ্রী সিংহ-বন্ধ'। উড়িষ্যার মন্দিরে এ জাতীয় সিংহ মূর্তি (উড়-গজ-সিংহ, ঝাম্পান সিংহ প্রভৃতি ; সে সম্বন্ধে আমরা পরে বিষদ আলোচনা করব) মূল মন্দিরের উপর যথেষ্ট সংখ্যায় আছে ; কিন্তু প্রথম কথা, ঐ সিংহ মূর্তির পরিকল্পনা প্রথম যুগের কোন মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় না ; দ্বিতীয় কথা, পঞ্চম শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরে এমন কোন মন্দিরের কথা কল্পনাই করা যায় না যে মন্দির

অতবড় সিংহের ওজন বহন করতে পারবে দেউলের উপর। তৃতীয় কথা, এই সিংহ মূর্তিটি যখন মাটির নীচে থেকে আবিষ্কৃত হয় তখন দেখা যায় চারদিকে চারখানি ভারী পাথর দিয়ে সেটিকে সুকৌশলে কবর দেওয়া হয়েছিল, উপরেও ছিল পাথরের টুকরা—স্বাভাবিক মাটি নয়। মূর্তিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবার জন্য লাইন ধরে ছেনির দাগ দেওয়াও ছিল।

সবটা মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে ভাস্করেশ্বর মন্দিরের শিব-লিঙ্গ আসলে একটি অশোক স্তম্ভ—সেখানে একটি বৌদ্ধ স্তূপও ছিল। সম্ভবতঃ ভৌমকরযুগে শৈবরা সেটিকে শিবমন্দিরে রূপান্তরিত করে। অশোক স্তম্ভকে করে শিবলিঙ্গ—স্তম্ভশীর্ষের সিংহটিকে সমাধিস্থ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুহামন্দির যুগ [খ্রীঃ পূঃ ১৪৬—খ্রীঃ পূঃ ৭৫]

দ্বিতীয় যুগ বা গুহামন্দির যুগের যাবতীয় নিদর্শনগুলি দেখতে পাবেন ভুবনেশ্বরের মাইল পাঁচেক উত্তর-পূবে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি অনুচ্চ পর্বতে। সে দুটির নাম উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। চিত্র-২এ দেখতে পাচ্ছি ভুবনেশ্বর থেকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি সড়ক

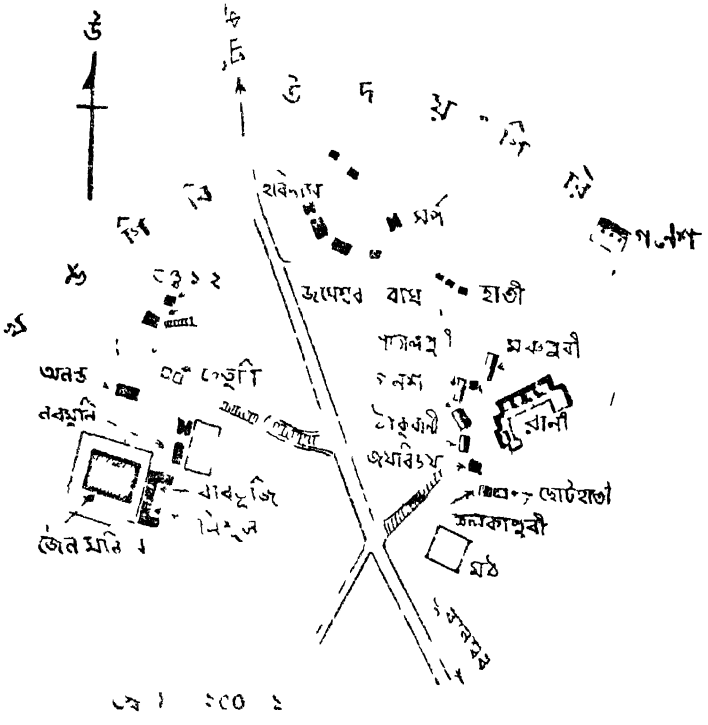

চিত্র ২ ॥ উদয়গিরি-খণ্ডগিরির ভূমিনকশা।

চাঁদকার দিকে চলে গেছে—যার পূর্বদিকে উদয়গিরি এবং পশ্চিম দিকে খণ্ডগিরি। এই দুটি পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য কৃত্রিম ও অকৃত্রিম

গুহা। কলিঙ্গরাজ করবেল এখানে নাকি একাই ১১৭টি গুহা খনন করান। অধিকাংশ গুহাই অবশ্য ভেঙে গেছে—তবু যা আছে তাও অনেক। আমরা মাত্র কয়েকটি চিত্র-২এ চিহ্নিত করে দিলাম এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্কেত অনুসারে গুহাগুলিকে সনাক্ত করলাম।

একটা কথা বলা দরকার। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য কলিঙ্গের স্থাপত্যচিন্তাকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করে আলোচনা করছি—তার মানে কিন্তু এ নয় যে এক যুগের কাজ অন্য যুগে একেবারেই হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে জৈন সন্ন্যাসীরা যে মৌর্য যুগের আগেও গুহা খনন করতেন না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। বরং এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অশোকের আক্রমণের পূর্বকাল থেকেই এখানে গুহা খনন কার্যে জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তার ঐতিহাসিক নজির নেই। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন যা এখানে পাওয়া যায় তা হাতীগুম্ফায় অবস্থিত একটি শিলালেখ—যার সময় কাল খ্রীঃ পূঃ ১৫৭ অব্দ।

পুরাতত্ত্ববিদদের মতে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম কৃত্রিম গুহা আছে বরাবর[১] পর্বতে। তার নাম 'সুদামা-গুহা'। সেটি সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত। উদয়গিরির কোনও গুহা তার থেকে বয়সে প্রাচীন বলে প্রমাণিত হয়নি। কালানুক্রমিকভাবে সাজালে এই দুই পর্বতে অবস্থিত প্রথম যুগের কৃত্রিম গুহাগুলিকে আমরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি ঃ

প্রথম পর্যায় (আ ঃ ১৪৬ খ্রী ঃ পূ ঃ) হাতী গুম্ফা ; সর্পগুম্ফা ; ব্যাঘ্র গুম্ফা এবং পবন গুম্ফা ;

দ্বিতীয় পর্যায় (আ ঃ ১৪৬—১২৬ খ্রী ঃ পূ ঃ) স্বর্গপুরী ; মঞ্চপুরী ; জয়বিজয় ; ঠাকুরানী ইত্যাদি ;

---

১) গয়া জেলায়, গয়া শহর থেকে উনিশ মাইল উত্তরে।

তৃতীয় পর্যায় (আঃ ১২৬—১০০ খ্রীঃ পূঃ) অনন্ত গুম্ফা, তত্ত্ব গুম্ফা ১ ও ২ ;

চতুর্থ পর্যায় (আঃ ১০০—৭৫ খ্রীঃ পূঃ) রানীগুম্ফা ও গণেশ গুম্ফা।

অর্থাৎ প্রথম যুগের সব কয়টি গুহাই মাত্র ৭০ বৎসরের ভিতর খোদিত হয়েছিল।

হাতী গুম্ফা : সম্ভবতঃ একটি প্রাকৃতিক গুহাকেই ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে বর্ধিত করে হাতী গুম্ফাতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। প্রবেশ-পথের উপরে কিছুটা অংশ মসৃণ করে শিলা-লেখটি উৎকীর্ণ করা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মিঃ এ. স্টার্লিং এই লিপিটি প্রথম আবিষ্কার করেন ; কিন্তু এর পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। তিনি এর একটি অনুলিপি[১] প্রকাশ করে পণ্ডিতদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। পরে লেঃ কিট্টো পুনরায়[২] এই লিপির একটি অনুলিপি প্রকাশ করেন এবং নিজ বুদ্ধিমত একটি অনুবাদও প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল[৩] এবং প্রিন্সেপ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী পুনরায় একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন, যা থেকে মনে হয়েছিল অরা নামে একজন কলিঙ্গরাজ এই শিলালেখটি উৎকীর্ণ করান এবং অরা অনেক জনহিতকর কাজ করেন। বিরাট জলাশয় খনন করান এবং গুহামন্দির খনন করান। ওঁদের মতে উল্লিখিত 'অরা' ছিলেন অশোক-পূর্ব নৃপতি, যার অনুসিদ্ধান্ত—এই হাতী গুম্ফাটি সাঁচী-ভারহুত-সুদামা-কর্ণকৌপরের পূর্ব যুগের সম্পদ, বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রথম গুহামন্দির।

কিন্তু এ মত চিরস্থায়ী হয়নি। ডাঃ ভগবানলাল ইন্দ্রজী আরও

১) এশিয়াটিক রিসার্চেস্, পঞ্চদশ খণ্ড (১৮২৪)

২) এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, ষষ্ঠ খণ্ড (১৮৩৭)

৩) Antiquities of Orissa, Vol. II (1880)—Babu Rajendralal Mitra.

কয়েক বছর পরে এই শিলালিপির নির্ভুল পাঠোদ্ধার করে প্রমাণ করেন যে, এটি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৭ অব্দে লেখা ; সম্রাট অশোকের পরবর্তী কালে। যদিও এ আলোচনা নিছক ইতিহাসের বিষয়ভুক্ত তবু পাঠকের কৌতূহল হতে পারে রাজেন্দ্রলাল বা প্রিন্সেপ কেন এটিকে অশোক-পূর্ব যুগের বলে মনে করেছিলেন। সংক্ষেপে সে কথা বলি ঃ

শিলালেখের একস্থানে আছে 'অর নন্দরাজেব প্রাসাদ নির্মূল করেন'। সুতরাং মনে করা হয়েছিল শিশুনাগ বংশের (৬৫০-৩১৪ খ্রীঃ পূঃ) মহারাজ নন্দ, যাব বাজধানী ছিল সম্ভবতঃ গিরিব্রজে, তাঁকেই এই কলিঙ্গরাজ 'অর' পবাজিত করেন। কিন্তু ইন্দ্রজী শিলালিপির নির্ভুল পাঠোদ্ধাব কবে প্রমাণ কবেন যে 'অর' প্রকৃত প্রস্তাবে ক-'অর'-বেল নামের অপভ্রংশ, করবেল নামের নির্ভুল পাঠ সপ্তদশ পংক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে। কলিঙ্গরাজ মগধ-রাজধানীতে মহারাজ নন্দের প্রাসাদই অধিকাব কবেছিলেন বটে তবে নন্দের জীবিতাবস্থায় নয়—তখন মৌর্যবাজ বহসতিমিত মগধের সম্রাট।

এই শিলালেখেব তিনটি পংক্তি ঐতিহাসিকদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

প্রথমতঃ তৃতীয়[১] পংক্তিতে বলা হয়েছে "মহারাজ সতকর্ণীকে স্বমতে আনতে না পেরে করবেল বহুসংখ্যক অশ্বারোহী, হস্তীবাহিনী রথী এবং পদাতিকের সাহায্যে তাকে পশ্চিম সীমান্তের দিকে প্রতিহত করেন।"

দ্বিতীয়তঃ ত্রয়োদশ পংক্তিতে বলা হয়েছে "মগধ-রাজ বহসতিমিতকে করবেল নিজ পদানত করেন এবং কলিঙ্গের জীনাসন সম্পদ, যেটি নন্দরাজা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা অঙ্গ মগধ রাজের এক্তিয়ার থেকে পুনরায় কলিঙ্গে নিয়ে আসেন।"

১) পংক্তি-সংখ্যা শ্রী বি. এম. বড়ুয়া কৃত "Old Brahmi Inscription" গ্রন্থ অনুসারে উল্লিখিত। অনুবাদও তাঁর মতানুসারে গ্রন্থকার কর্তৃক ইংরেজী থেকে বাংলায়।

তৃতীয়তঃ ষষ্ঠ পংক্তিতে বলা হয়েছে "একশত তিন বৎসর পূর্বে নন্দরাজ যে খালটি কেটেছিলেন করবেল সেটি পুনরায় সংস্কার করেন।"

ফলে শিলালেখে তিনটি রাজার নাম পাচ্ছি,—সতকর্ণী, বহসতিমিত এবং নন্দরাজ। এঁদের যে কোন একজনকে সনাক্ত করতে পারলেই রাজা করবেলের সময়টা আমরা নির্ধারণ করতে পারি। ডাঃ বড়ুয়ার মতে নন্দরাজ আর কেউ নয়, স্বয়ং মৌর্য-সম্রাট অশোক। যুক্তি—অশোকের শিলালেখ থেকে বোঝা যায়, তিনিই প্রথম ভারতীয় সম্রাট যিনি বুদ্ধদেবের পরবর্তীকালে 'চির অপরাজেয়' (অবিজিতং বিজিনিতাম্) কলিঙ্গের চেদীরাজকে পরাস্ত করেন। সুতরাং একমাত্র তাঁর পক্ষেই কলিঙ্গরাজের প্রাসাদ অথবা দেবমন্দির থেকে জৈন তীর্থঙ্করের কোন পবিত্র সিংহাসন বিজয়চিহ্ন-রূপে পাটলিপুত্রে অথবা রাজগৃহে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর এবং তাঁর পক্ষেই বিজিত কলিঙ্গ রাজ্যে সেচের জন্য পয়ঃপ্রণালী খনন করান সম্ভব। কলিঙ্গরাজ করবেল সম্রাট অশোকের ১০৩ বৎসর পরে মগধরাজকে পদানত করে সেই পবিত্র সিংহাসনটি স্বদেশে ফিরিয়ে আনেন। এখন অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের কাল সুচিহ্নিত; সেটা খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১ অব্দের কথা। ধৌলি এবং ঝাউগাদায় তাঁর শিলালেখ স্থাপনের সময়কাল ২৫৭ খ্রীঃ পূঃ। সুতরাং ধরা যেতে পারে প্রায় ঐ সময়েই অশোক হাতী গুম্ফায় উল্লিখিত খালটি খনন করান। এ থেকে প্রমাণ হয়, হাতী গুম্ফার সময়কাল (২৫৭—১০৩=)১৫৪ খ্রীঃ পূঃ। আরও একটি সূক্ষ্ম সূত্রের নির্দেশে ঐতিহাসিকরা তারিখটা আরও আট বৎসর পেছিয়ে বলেছেন ১৭৬ খ্রীঃ পূঃ। সে সূত্রটির কথা পরে বলছি। জলসেচের খালটি যে অশোকই খনন করান এ সিদ্ধান্তের পিছনে আরও যুক্তি আছে। দেখা যাচ্ছে, সম্রাট অশোক সুদূর গিরিনগরে (আধুনিক গিরনার, সৌরাষ্ট্রে) তাঁর পূর্বপুরুষ চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত একটি খাল খনন করার

উদ্দেশ্যে একজন পারসিক বাস্তুকারকে[১] নিয়োজিত করেন। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তদেশে সম্রাট যদি জলসেচের উদ্দেশ্যে খাল কাটান তবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি সম্প্রতি-বিজিত কলিঙ্গ-রাজ্যেও তিনি অনুরূপ কাজ করান—কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, কলিঙ্গবাসীরা তাঁর প্রিয় সন্তানতুল্য।

এ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা করবেলকে যে সময়ে এনে ফেললাম তখন দেখছি মগধে মৌর্য বংশ অস্তমিত। সেটা পুষ্যমিত্র সুঙ্গের (আঃ ১৮৬—১৪৮ খৃঃ পূঃ) রাজত্ব কাল। কিন্তু হাতী গুম্ফায় বলা হচ্ছে—যে মগধরাজকে তিনি পরাজিত করেন তাঁর নাম বহসতিমিত, পুষ্যমিত্র তো নয়। এ সমস্যার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন শ্রী কে. সি. পানিগ্রাহী[২]। তিনি বলেছেন, পুষ্যমিত্র সুঙ্গ ছিলেন মগধ-সম্রাটের সেনাপতি। তিনি সম্ভবতঃ মৌর্য বংশেরই কোন অযোগ্য বংশধরকে সিংহাসনে বসিয়ে তার নামে রাজ্যশাসন করতেন। মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র স্বনামে কখনই রাজ্যশাসন করেননি। প্রমাণ স্বরূপ পানিগ্রাহী বলেছেন, বৃহদ্রথের মৃত্যুর অনেক পরে অযোধ্যাপতি ধনদেব তাঁর শিলালেখে সগর্বে উল্লেখ করেছেন যে তিনি "সেনাপতি" পুষ্যমিত্র সুঙ্গের সুহৃদ। যদি পুষ্যমিত্র স্বনামে রাজ্যশাসন করতেন তাহলে নিশ্চয়ই 'সেনা-পতি' বিশেষণের পরিবর্তে 'সম্রাট' পুষ্যমিত্র বলেই তিনি উল্লেখ করতেন।

হাতী গুম্ফায় উল্লেখ আছে যে করবেল মগধ জয় করতেই বেরিয়ে-ছিলেন কিন্তু অপর শত্রু সতকর্ণীর আক্রমণে তিনি প্রথমবার মগধ জয় করতে পারেননি। পিছনের শত্রুকে নিরস্ত করতে হয়েছিল

১) The Early History of India (4th Edn.) p. 139—V. A. Smith.

২) Archaeological Remains of Bhubaneswar pp. 125—198, —Shri K. C. Panigrahi.

তাঁকে। সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের জীবিতকালে করবেল তাঁর মগধ জয় কার্য সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে করবেল তাঁর নিজের দ্বাদশবর্ষ রাজত্বকালে মগধ বিজয় করেন, সম্ভবতঃ ১৪৭ খ্রীষ্ট পূর্বে। সেনাপতি পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পরে মগধরাজ বহসতিমিতকে পরাজিত করা করবেলের মত ক্ষমতাশালী নৃপতির পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ছিল না। এ থেকেই অনুমান করা হয়েছে—হাতী গুম্ফার শিলালেখের সময়কাল তার পর বৎসর, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৪৬।

ইতিহাসের বিষয়ে এতকথা বলতে হল শুধু বোঝাতে যে, হাতী-গুম্ফার ঐ শিলালেখটি ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। ঐ দুর্বোধ্য হরফগুলি থেকেই খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তিনজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি—মগধের পুষ্যমিত্র সুঙ্গ, কলিঙ্গের করবেল এবং অন্ধ্রের সাতবাহনরাজ শ্রীসতকর্ণী ইতিহাসে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছেন।

সর্প গুম্ফা ও পবন গুম্ফা : হাতী গুম্ফার প্রায় সমসময়েই নিকটবর্তী এই দুটি গুহা খনন করান হয়েছিল। সর্প গুম্ফার সম্মুখে ছোট্ট একটি বারান্দা, তাও ভেঙ্গে গেছে। প্রবেশদ্বারের উপরে তিন-ফণা-ওয়ালা একটি সাপের মূর্তি খনন করা। এ গুহাতে দর্শনীয় কিছু নেই—আছে একটি শিলালেখ—মাত্র একটি পংক্তি। তা শুধু বলছে "এই গুহাটি চৌলকর্মার (অথবা চৌল কমস) আবাসস্থল।" অনুমান করা যায়, তিনি সম্রাট করবেলের অনুগৃহীত একজন জৈন সন্ন্যাসী। ফার্গুসনের[১] মতে ঐ সন্ন্যাসী হরিদাস নামে অপর একটি গুহা খনন করান। হরিদাস গুহারই নামান্তর পবন গুম্ফা।

ব্যাঘ্র গুম্ফা : প্রথম পর্যায়ের এই গুহাটির উল্লেখ বিশেষভাবে করতে হচ্ছে এই কারণে যে, এর গঠন-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি শিল্পী-মনের পরিচয় পাচ্ছি। ঝুঁকে পড়া একটা স্বাভাবিক পাথরকে এমন

১) History of Indian and Eastern Architecture—James Fergusson.

ভাবে খনন করা হয়েছে যে সামনে থেকে দেখলে মনে হবে প্রকাণ্ড একটা বাঘ মুখব্যাদান করে আছে। ঐ হাঁ-মুখেই প্রবেশ পথ। বাঘের দাঁতগুলি লক্ষ্যণীয় —চোখ দুটি, নাক এবং কান। ভিতরের গুহাটি ছোট্ট, মাত্র সাড়ে ছয় ফুট গভীর। উচ্চতাও মাত্র সাড়ে তিন ফুট। দ্বারের উপর একটি ছোট্ট শিলা-লিপি, যার পাঠোদ্ধারের পর জানা গেছে এই গুহায় ছিল জৈন সন্ন্যাসী সভুতীর বাস। বিচিত্র গঠনের জন্য এর একটি চিত্র সংযোজন করা গেল (চিত্র ৩)।

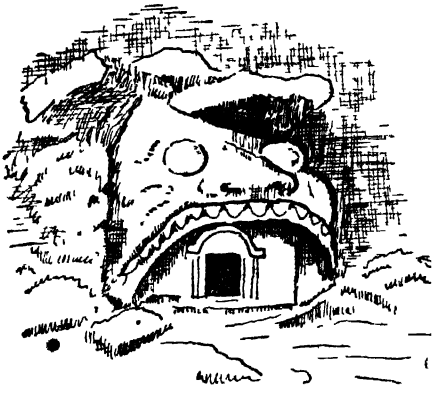

চিত্র ৩ ॥ ব্যাঘ্র গুম্ফার প্রবেশপথ

স্বর্গপুরী, মঞ্চপুরী, জয়বিজয়, ঠাকুরানী ইত্যাদি : চিত্র-২ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অন্যূন নয়টি গুহা অর্ধচন্দ্রাকারে রানী গুম্ফাকে ঘিরে আছে। কিন্তু আমরা জানি এই গুহাগুলি যখন খনন করা হয় তখন রানী গুম্ফা ছিল না, কারণ শেষোক্তটি চতুর্থ পর্যায়ের গুম্ফা। এই নয়টি গুহার মধ্যে দুটি দেখছি দ্বিতল,—স্বর্গপুরী (বা অলকাপুরী) এবং জয় বিজয়। পরবর্তী যুগের রানী গুম্ফাও দ্বিতল ; এবং আকারে এ দুটির অপেক্ষা অনেক বড়। রানী গুম্ফার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে দেখব যে স্বর্গপুরী অথবা জয় বিজয় গুম্ফায় দ্বিতলের স্তম্ভগুলি এক-তলার স্তম্ভের ঠিক উপরে উপরে খোদাই করা—অপর পক্ষে রানী-গুম্ফার দ্বিতলের স্তম্ভগুলি অনেক পিছনে সরানো। কেউ কেউ বলেছেন, রানী গুম্ফার শিল্পীরা একথা জানতেন না যে স্তম্ভগুলি একই অক্ষে থাকলে, অর্থাৎ মাথায়-মাথায় থাকলে ভারসাম্য ভাল-ভাবে রক্ষিত হয়। শিল্পীদের এই অনভিজ্ঞতার ফলেই নাকি রানী

গুম্ফার একতলার ছাদটি ভেঙে পড়েছিল। আমরা ঐসব বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারছি না। অজন্তার ষষ্ঠ-গুহাতেও দ্বিতলের স্তম্ভগুলি একতলার স্তম্ভের সঙ্গে এক অক্ষে খোদিত হয়নি —তবু তা ভেঙে পড়েনি। বস্তুতপক্ষে দ্বিতল গুহা-মন্দিরে স্তম্ভগুলি ঠিক মাথায়-মাথায় হবে অথবা ধাপে ধাপে হবে তা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের উপর। সেটি যে পাহাড় কেটে ঐ দ্বিতলগুহা-বাস তৈরী হচ্ছে তার ঢালের উপর নির্ভরশীল। পাহাড় যদি যথেষ্ট ঢালু হয় তখন ধাপে ধাপে খোদাই করলে (যেমন নাকি রানীগুম্ফা) অনেক কম ঘন-ফুট খনন করতে হবে। অপরকক্ষে পাহাড়ের গা যদি খাড়া হয় তখন একতলার ঠিক উপরে দ্বিতল খনন করলে (যেমন নাকি স্বর্গপুরী) খনন কার্য লাঘব করা যায়। একটু চিন্তা করলেই এ সত্য অনুধাবন করা যাবে; এজন্য কাউকে বিদগ্ধ বাস্তুবিদ হতে হবে না।

সে যাইহোক স্বর্গপুরীতে আছে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রবেশ-পথের দুদিকে আছে দুটি হস্তীমূর্তির অর্ধোত্থিত ভাস্কর্য নিদর্শন। খিলানের উপর সমান্তরাল 'ফ্রিজে' রেলিঙের একটি নক্শা—সাঁচি অথবা ভারহুতের বৌদ্ধ স্তূপের রেলিং (সূচী-থভ-উষ্ণীষ প্রভৃতি) এর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

স্বর্গপুরীর ঠিক পাশেই জয় বিজয় গুম্ফাটিও দ্বিতল এবং এখানেও দ্বিতল অংশ একতলার ঠিক উপরে অবস্থিত। দুটি করে কক্ষ এবং সে দুটি আকারে সমান নয়। কক্ষের উচ্চতা মাত্র ৪ ফুট। গুহা কক্ষের প্রবেশ পথটিও অত্যন্ত ছোট, প্রায় ৩½ ফুট × ২ ফুট। বারান্দার তিনদিক ঘিরে প্রায় একহাত চওড়া টানা একটি পাথরের বেঞ্চি আছে, যা নাকি পাহাড়ের গা থেকে খনন করে বার করা। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, এ জাতীয় পাথরের বেঞ্চি উদয়গিরি খণ্ড-গিরির একটি বৈশিষ্ট্য; অনেক গুহাতেই আছে। এ ধরণের পাথরের লম্বা টানা-বেঞ্চি ভারতবর্ষের অন্য কোন কৃত্রিম গুহাবাসে

দেখতে পাওয়া যায় না। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নাসিককে কেন্দ্র করে এবং অজন্তাতে হীনযানী বৌদ্ধদের যে-সব পার্বত্যগুহা দেখতে পাওয়া যায় তাতে এ-রকম টানা বেঞ্চি নেই, আছে ছোট ছোট তক্তাপোষের মত প্রস্তরাসন। একজন শ্রমণের শয়নের উপযুক্ত সেগুলি। দ্বিতীয়তঃ এখানে ঐ টানা বেঞ্চি বারান্দাতে অবস্থিত, ফলে শ্রমণেরা দল বেঁধে এখানে বসলে উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পেতেন। অপরপক্ষে বৌদ্ধ বিহারে প্রস্তরাসনগুলি অধিকাংশই গুহাভ্যন্তরে—ফলে সেগুলি শয়নের জন্যই নির্মিত, উপবেশনের জন্য নয়।

জয়বিজয় গুম্ফার দু' পাশে দুটি দ্বারপাল, একটি পুরুষ ও একটি রমণী। প্রবেশদ্বারদ্বয়ের উপর যে অর্ধচন্দ্রাকার খিলান সে-দুটিকে যুক্ত করে জমির সমান্তরাল যে 'ফ্রিজ' তাতে অর্ধোত্থিত (bas-relief) ভাস্কর্যের নিদর্শন। দেখতে পাচ্ছি—কয়েকজন রমণী একটি বৃক্ষকে পূজা করতে আসছেন। এই ভাস্কর্যে বৌদ্ধ প্রভাব অনস্বীকার্য। সাঁচি-ভারহুতের বিশেষ জাতের রেলিং, বোধিদ্রুমের পূজা, স্তূপপূজা, গজলক্ষ্মী এবং স্বস্তিকাচিহ্ন প্রাচীন গুহাগুলিতে বারে বারে দেখতে পাচ্ছি। এই লক্ষণগুলি দেখে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হান্ট, স্টার্লিং প্রভৃতি পূর্বসূরীরা আন্দাজ করেছিলেন যে এগুলি বৌদ্ধ গুহা। পরবর্তীকালে প্রাচ্যবিশারদরা বলেছেন, যে এইসব প্রমাণ সত্ত্বেও মেনে নিতে হবে যে এগুলি জৈন সন্ন্যাসীদের আবাস-স্থল, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নয়। সেই পরবর্তী প্রাচ্য-বিশারদদের নির্দেশানুসারে মেনে নেওয়া হয়েছে যে উদয়গিরি-গণ্ডগিরির সব কিছুই জৈনধর্মের, বৌদ্ধদের নয়। আমার মনে হয়েছে এই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে জেমস্ ফার্গুসনের মতবাদ। তিনিই তাঁর গ্রন্থে পূর্ব-সূরীদের সমস্ত মত নস্যাৎ করে সর্বপ্রথম[১] এই মতবাদ ঘোষণা

১) "Nor is any trace of Buddhism found among them ; the figures of Gaja-Laxmi or Sri, of snakes, sacred trees, the

করেছিলেন। ফলে তাঁর পরবর্তীযুগের সকল পণ্ডিতই মনে করেন এগুলি জৈন গুহা—বৌদ্ধ প্রভাবমুক্ত। অথচ আশ্চর্য, এ মতবাদের পক্ষে কেউ কোন জোরাল যুক্তি দেখাননি,—অন্ততঃ আমার নজরে পড়েনি। আমার এ ধারণা ভ্রান্ত হলে এবং কোন পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাধিত হব।

এই প্রসঙ্গে একটি ক্লেশকর অধ্যায়ের অবতারণা করতে বাধ্য হচ্ছি। ফার্গুসন-সাহেবের সঙ্গে নানা বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতবিরোধ হয়েছিল। অজন্তা ও উড়িষ্যার স্থাপত্যশিল্পের বয়স নিয়ে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ বাদানুবাদের কথা প্রাচ্য-সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন। ফার্গুসন তাঁর গ্রন্থে একাধিকবার রাজেন্দ্রলালকে (তখন স্বর্গতঃ) আমন্ত্রণ করেছেন, এমনকি কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত কটু ভাষায়[১]। রাজেন্দ্রলাল এ পথের পথিকৃৎ—নানান বিষয়ে তাঁর ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ ফার্গুসনও এমন অনেক উক্তি করে গেছেন যা পরে ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁদের গবেষণা একেবারে নিষ্ফল হয়েছে এ কথা বলা অনুচিত। আমার তো মনে হয়েছে যে রাজেন্দ্রলালের মতের বিরোধিতা করতে গিয়ে ফার্গুসন কিছুতেই মানতে

Swastika and other symbols are as much Jaina as Buddhist, and in several of the caves—not perhaps the earliest—are found figures of the Jaina Tirthankars and their attendants."—History of Indian and Eastern Architecture, Vol II pp 11 12—Sir J Fergusson

১ "Even as late as in 1880, Babu Rajendralal Mitra who had the most ample opportunities of examining every details of the Orissan Caves had no suspicion of their being other than Buddhist origin, and his reading of the Hathi Gumphā inscription—like the whole of his works (i e. Antiquities of Orissa, 1875) is simply worthless"—Ibid pp 11 foot note

রাজি হননি যে, উড়িষ্যার এই গুহাগুলিতে কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরও বাস ছিল।

এ কথা অনস্বীকার্য যে গুহাগুলির নির্মাণ সময়ে কলিঙ্গের রাজ-ধর্ম ছিল জৈন। করবেল জৈন ছিলেন; কিন্তু তা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না যে, এ গুহাগুলির কোনটিতেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন না। সম্রাট অশোক তো ঘোর বৌদ্ধ ছিলেন, তবু তাঁর আদেশে এবং অর্থ সাহায্যে বরাবর পর্বতে অজীবক জৈন সম্প্রদায়ের জন্য সুদামা, লোমশ ঋষি, কর্ণকৌপর ইত্যাদির গুহা খনন করান হয়। অশোক-পৌত্র সম্রাট দশরথ বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নাগার্জুন পর্বতে জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য গোপিকা গুহাটি খনন করান। কলিঙ্গরাজ করবেল এঁদের পরবর্তী যুগের রাজা। তাঁর বা তাঁর কোন অধঃস্তন পুরুষের পক্ষেও জয়বিজয় প্রভৃতি গুহা (যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক সুতীব্রভাবে পাওয়া যাচ্ছে) বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য তৈরী করা অসম্ভব কেন হবে? এই যুগেই কাথিয়াওয়াড় রাজ্যের জুনাগড়ে, গিরনারে বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীরা পাশাপাশি গুহা নির্মাণ করে বাস করেছেন। বহু শতাব্দী পরেও এলোরাতে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা পাশাপাশি গুহা নির্মাণ করে বাস করেছেন। একমাত্র উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতেই সেটা কেন অসম্ভব বিবেচিত হয়েছে তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সুস্পষ্ট বৌদ্ধ প্রতীক—গজলক্ষ্মী, নাগপূজা, বোধিদ্রুম, মকরমূর্তি, ভারহুত রেলিং এবং বিশেষত ত্রিরত্ন ('বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' এই মন্ত্রের প্রতীক একটি ত্রিশূলের মত ফলক, যা নাকি বৌদ্ধ স্তূপের উপর প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়; সেই চিহ্নটি রানীগুম্ফার খিলানের উপরও দেখা যায়) আর স্বস্তিকা[১]

১) ফার্গুসন বলেছেন, স্বস্তিকাচিহ্ন জৈন ও বৌদ্ধধর্মে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। কথাটি ঠিক নয়। জৈন স্বস্তিকা দক্ষিণাবর্ত (clockwise)। সপ্তম তীর্থঙ্কর সুপর্শনাথের মূর্তির পদতলে যে স্বস্তিকা-চিহ্ন থাকে তা দক্ষিণাবর্ত।

প্রভৃতির ইঙ্গিত অস্বীকার করে কেন এগুলি শুধুমাত্র জৈন সম্প্রদায়ের বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা আমি উপলব্ধি করতে পারিনি।

অনন্তগুম্ফা, তত্ত্বগুম্ফা : এবার আমরা তৃতীয় পর্যায়ের দুটি গুহার প্রসঙ্গে আসতে পারি। এ-দুটি কিন্তু উদয়গিরি পর্বতে নয়, পার্শ্ববর্তী খণ্ডগিরিতে। অনন্তগুম্ফায় একটি মাত্র কক্ষ (২৪′ × ৭′), যার সম্মুখে প্রায় ৭ ফুট চওড়া একটি বারান্দা আছে। প্রথমাবস্থায় এ গুহায় চারটি প্রবেশ দ্বার ছিল ; বর্তমানে দুটি দ্বার ও একটি জানালা আছে। দ্বারের উপর ফ্রিজ অংশে একই রকম অলঙ্করণ—স্বস্তিকা, ত্রিরত্ন, গজলক্ষ্মী, সর্পশীর্ষ, বোধিদ্রুম এবং ভারহুত-সাঁচি স্তূপের বিশেষজাতের রেলিং বা বেদিকা। বৌদ্ধ ভাস্কর্যের ছাপ যে অতি স্পষ্ট একথা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ সে কথা কিন্তু ফার্গুসনও তাঁর "কেভ টেম্পলস্ অফ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে স্বীকার করেছেন—তবু বলেছেন, গুহাগুলি জৈন সন্ন্যাসীদের।

তত্ত্ব গুম্ফার দুটি অংশ উপর নীচে অবস্থিত। স্থানীয় লাইসেন্স-প্রাপ্ত গাইড আমাকে বলেছিলেন 'তত্ত্ব' শব্দটা এসেছে 'তোতা' থেকে। গুহা ভাস্কর্যে তোতাপাখী সমেত একটি নারীমূর্তিও তিনি দেখিয়ে ছিলেন। এ জাতীয় নির্দেশনা থেকে দর্শক গুহাগুলির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কতটা ধারণা নিয়ে যাবেন তা ভেবে দেখা দরকার।

পর্যায়ক্রমে তত্ত্বগুম্ফা ১, ২ দেখার পর আমরা আসি অনন্ত-গুম্ফাতে। তারপর প্রায় পাশাপাশি তিনটি গুম্ফা—নবমুনি, বারো-ভূজি ও ত্রিশূল। শেষোক্ত দুটিকে একত্রে বলা হয় সাতবক্র বা সাত ঘরা। শেষোক্ত গুহায় চব্বিশ জন জৈন তীর্থঙ্করের অর্ধোত্থিত পাথরের মূর্তি আছে। এগুলি পরবর্তী যুগের। চব্বিশ জন জৈন

খণ্ডগিরি পর্বতে সাতবক্র গুহায় সুপর্শনাথের পদতলে স্বস্তিকাচিহ্নটি লক্ষণীয়। কিন্তু বৌদ্ধ স্বস্তিকা-চিহ্ন বামাবর্ত। অনন্তগুম্ফায় যে স্বস্তিকাটি আছে সেটি বামাবর্ত (anti clockwise)। রানীগুম্ফা, গণেশগুম্ফাতেও এ জাতীয় বামাবর্ত স্বস্তিকা চিহ্ন আছে।

তীর্থঙ্করের নাম আমরা জানি, তাঁদের সনাক্ত করার উপায়ও আমরা জানি—প্রত্যেক তীর্থঙ্করের বিশেষ এক চিহ্ন বা প্রতীক আছে। গুহা প্রাচীরে মূর্তিগুলি পর্যায়ক্রমে সাজান নেই। প্রতীকচিহ্ন থেকেও তাঁদের সনাক্ত করার অসুবিধা ঘটেছে এজন্য যে অনেক ক্ষেত্রেই চিহ্নগুলি ভেঙে গেছে। আমরা তাঁদের সনাক্ত করবার একটা চেষ্টা করতে পারি।

চব্বিশজন জৈন-তীর্থঙ্করের প্রতীক-চিহ্ন সম্বন্ধে মূল সূত্রটি পাওয়া যাচ্ছে জৈন অভিধানকারিক হেমচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত শ্লোকে :

বৃষো গজোশ্ব প্লবগঃ ক্রৌঞ্চোজ্জং স্বস্তিকঃ শশী।
মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়্গী মহিষঃ শূকরস্তথা॥
শ্যেনো বজ্রং মৃগশ্ছাগো নন্দাবর্ত্তো ঘটোঽপি চ।
কূর্ম্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফণীসিংহোঽতাং ধ্বজঃ॥

অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে প্রতীক-চিহ্নগুলি হচ্ছে—বৃষ, হস্তী, অশ্ব, প্লবগ (বনমানুষ), ক্রৌঞ্চ, অব্জ (পদ্ম), স্বস্তিক, শশী, মকর, শ্রীবৎস-চিহ্ন, খড়্গী (গণ্ডার) মহিষ, শূকর, শ্যেন, বজ্র, মৃগ, ছাগ, নন্দাবর্ত্ত, ঘট, কূর্ম্ম, নীলোৎপল, শঙ্খ, ফণী এবং সিংহ।

আলোচ্য সাতবক্র গুহাটি পূর্বমুখী। গুহায় প্রবেশ করে সম্মুখের প্রাচীরে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রাচীরে) ষোলোটি মূর্তি দেখতে পাব, ডান দিকের দেওয়ালে (দক্ষিণ প্রাচীরে) এবং বামদিকের দেওয়ালে (উত্তর প্রাচীরে) চারটি করে মূর্তি আছে। দক্ষিণ দিক থেকে যদি মূর্তিগুলিকে আমরা চিহ্নিত করি তবে বলব—দক্ষিণ প্রাচীরে আছে মূর্তি নং ১—৪, পশ্চিম প্রাচীরে ৫—২০ এবং উত্তর প্রাচীরে মূর্তি নং ২১—২৪। এর ভিতর যে মূর্তিগুলির প্রতীক-চিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় না সেগুলি হচ্ছে মূর্তি নং—১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ এবং ২৩। তবু যেগুলি চিহ্নিত করা যাচ্ছে তার ফাঁক-গুলি আন্দাজে ভরা যায়। আমি যেভাবে তাঁদের পর্যায়ক্রমে সাজিয়েছি তা এখানে সন্নিবেশিত করে দিলাম :

	নাম	জন্মস্থান	প্রতীক	গুহায় অবস্থান	
				মূর্তিসংখ্যা	প্রাচীর
১	আদিনাথ বা ঋষভনাথ	বিজিতা নগরী	ঋষভ	১	দক্ষিণ
২	অজিতনাথ	অযোধ্যা	হস্তী	২	ঐ
৩	সম্ভব নাথ	শ্রাবস্তী	অশ্ব	৩	ঐ
৪	অভিনন্দন	অযোধ্যা	বনমানুষ	৪	ঐ
৫	সুমতীনাথ	ঐ	ক্রৌঞ্চ	৫	ঐ
৬	পদ্মপ্রভা	কৌশাম্বী	পদ্ম	৬	ঐ
৭	সুপর্শনাথ	কাশী	স্বস্তিকা	৭	ঐ
৮	চন্দ্রপ্রভা	চন্দ্রপুর	অর্ধচন্দ্র	৮	ঐ
৯	পুষ্পদন্ত	কনন্দীনগরী	কুম্ভীর	১৭	ঐ
১০	শীতলনাথ	ভদ্রপুর	শ্রীবৎস চিহ্ন	১১	ঐ
১১	শ্রেয়াংশনাথ	সিংহপুর	গণ্ডার	১৩	উত্তর
১২	বাসপূজ্য	চম্পাপুরী	মহিষ	১২	পশ্চিম
১৩	বিমলনাথ	চম্পেযপুর	শূকর	১৩	ঐ
১৪	অনন্তনাথ	অযোধ্যা	শ্যেন	৯	ঐ
১৫	ধর্মনাথ	রত্নপুরী	বজ্র	১০	ঐ
১৬	শান্তিনাথ	হস্তিনাপুরী	হরিণ	১৬	ঐ
১৭	কুন্থনাথ	ঐ	ছাগল	১৭	ঐ
১৮	অরনাথ	ঐ	নন্দাবর্ত	১৮	ঐ
১৯	মল্লিনাথ	মথুরা	কলস	১৯	ঐ
২০	মুনিসুব্রত	রাজগৃহ	কূর্ম	১১	উত্তর
২১	নামিনাথ	মথুরা	নীলপদ্ম	২০	পশ্চিম
২২	নেমিনাথ	সৌরীপুর	শঙ্খ	২২	উত্তর
২৩	পার্শ্বনাথ	কাশী	সর্প	১৫	পশ্চিম
২৪	বর্ধমান মহাবীর	কুন্দগ্রাম	সিংহ	২৪	উত্তর

এর ভিতর আটটি দণ্ডায়মান মূর্তি, বাকি ষোলোটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দণ্ডায়মান মূর্তিগুলির দু' পাশে চামরধারী সেবকমূর্তি, উপরে দুটি করে গন্ধর্বমূর্তি। কোথাও কোথাও পদতলে নাগ-নাগিনী বা শ্রমণদের মূর্তি খোদাই করা। কৈশোরে যাঁরা কিশোর পত্রিকায় ধাঁধার পাতাটি নিয়ে সময় কাটাতেন তাঁরা নিজেরাই প্রতীক-চিহ্ন দেখে দেখে মূর্তিগুলিকে সনাক্ত করার চেষ্টা করতে পারেন—জিগ্‌স-ধাঁধা সমাধানের আনন্দ পাবেন।

অনন্তগুম্ফা, নবমুনি ও সাতবক্র গুহাগুলি চক্রাকারে একটি বৃহদায়তন জৈনমন্দিরকে ঘিরে আছে। যদিও এটি মাত্র আজ থেকে দুশ বৎসর পূর্বে নির্মিত তবু এই পর্যায়েই তা উল্লেখ করে যাওয়া গেল। এই মন্দিরের পশ্চিমে নাকি একটি বৌদ্ধ স্তূপও ছিল—আমি সেটির সন্ধান পাইনি।

এবার শেষ পর্যায়ের দুটি গুহার প্রসঙ্গে আসা যাক। সে দুটি উদয়গিরিতে।

গণেশ গুম্ফা : উদয়গিরির উত্তর-পূর্ব প্রান্তে, বস্তুতঃ উদয়গিরি পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে গণেশ গুম্ফার অবস্থিতি। এটি একটি একতলা গুহা, প্রায় ৩০ ফুট লম্বা এবং ১০ ফুট গভীর। সম্মুখে একটি বারান্দা, তাতে পাঁচটি স্তম্ভ এবং দুটি অর্ধস্তম্ভ (pilaster)। গুহাটি আবিষ্কারের সময়ে দক্ষিণদিকের দুটি স্তম্ভকে ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল—পুরাতত্ত্ববিভাগ সে দুটি পুনরায় তৈরী করেছেন; কিন্তু প্রাচীন যুগের যে-দুটি স্তম্ভ টিকে আছে সে দুটিকে আমরা বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করতে পারি। এই স্তম্ভগুলির কোন পাদদেশ (base) নেই। মাঝখানে কিছুটা অংশ বিষ্ণুকাণ্ড (অর্থাৎ আটকোনা, octagonal); তার উপর ও নীচের অংশ ব্রহ্মকাণ্ড (চতুষ্কোণ, square)। স্তম্ভশীর্ষ (abacus) বলে কিছু নেই—তার দু-প্রান্তে দুটি নক্‌শা-কাটা ব্যাকেটে নারীমূর্তি। লক্ষণীয় যে নীচের চতুষ্কোণ ব্রহ্মকাণ্ডের ধারগুলি মাটি থেকে লম্বভাবে বা খাড়াভাবে ওঠেনি;

কাণ্ডটি অল্পভাবে মোটা থেকে সরু হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ এখানকার অধিকাংশ স্তম্ভই এই জাতের। স্তম্ভ দেখেই পশ্চিমখণ্ডের বিভিন্ন জাতের স্থাপত্যেব জাত নির্ণয় সম্ভব, ভারতীয় স্থাপত্যে সে সুবিধা নেই—তবু বলতে পারি উদয়গিরি-খণ্ডগিরিব এই স্তম্ভগুলির বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। সমসময়ে নির্মিত বৌদ্ধ স্থাপত্য কীর্তি, যথা: ভাজা-কনডেনকান্থেবী, অজন্তা, ভারহুত-সাঁচীতে এ জাতেব স্তম্ভ দেখা যায় না। তাই এই বিশেষ জাতের স্তম্ভের একটি নক্শা চিত্র— ৪-এ সংযোজন করা গেল। বারান্দার পিছনে পাশাপাশি দুটি কক্ষ, প্রত্যেকটিতে দুটি করে প্রবেশদ্বার। তাব উপবে জমির সমান্তবালে ফ্রিজ-অংশে না না ন জাতেব মূর্তি ও নক্শা। এর ভিতর দুটি অংশে মনে হয় দুটি চিত্র-কাহিনী পবিবেশন করা হয়েছে—যেমন চিত্র কাহিনী দেখেছি সমসাময়িক সাঁচীর তোরণে অথবা অজন্তার নবম-দশম গুহার আলেখ্যে। প্রচণ্ড ভৌগোলি-' দূবত্ব সত্ত্বেও মূর্তিগুলির আকতিতে, বেশভূষায় এবং অল্‌টো-রিলিভো-উপস্থাপনের কায়দায় বেশ একটা সাযুজ্য অনুভব করা যায়। মূর্তিগুলির নীচ দিয়ে জমির সমান্তরালে 'থভ' ও 'সূচী'-র নক্শা সাঁচী ও ভারহুতের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

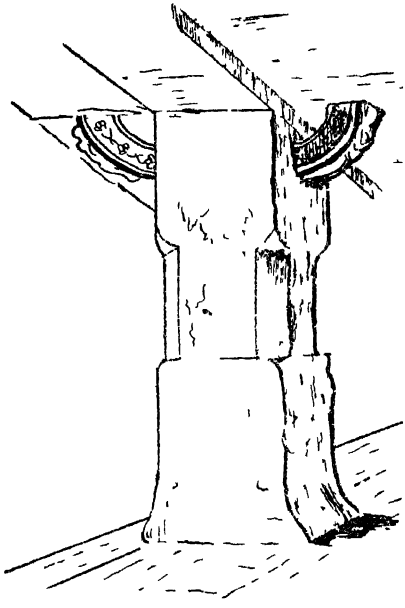

চিত্র ৪ ॥ গণেশগুম্ফার স্তম্ভ

প্রথম চিত্রটি দেখে মনে হয় কোন একজন রাজা সসৈন্য শিকারে

যাচ্ছেন। দেখছি, রাজা একটি হরিণকে বধ করবার জন্য শরসন্ধান করছেন। হরিণটি কিন্তু সাধারণ হরিণ নয়, সে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। কারণ, তার দুটি পাখা আছে। পরবর্তী দৃশ্যে দেখছি রাজা বিস্ময়াহত, হরিণটি তাঁর পদতলে বসে আছে এবং একজন বনদেবী রাজাকে কিছু বলছেন। জানি না, শিল্পীর বক্তব্য বিষয়টি কী ছিল; কিন্তু এ চিত্রের সঙ্গে শরভ-জাতক কাহিনীর বেশ মিল আছে। শরভ জাতকেও রাজা হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলেন; সেখানে হরিণটি ছিল স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। সেখানেও বনদেবী রাজাকে নিষেধ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন এ গুহা বৌদ্ধ গুহা নয়—কিন্তু জাতকের গল্প কি সে যুগে সর্বজনীনতা লাভ করেনি? জানি না।

দ্বিতীয় চিত্রটিকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সনাক্ত করেছেন[১] অনাদিকালের লোকগাথা উজ্জয়িনীর বাসবদত্তা কাহিনীর সঙ্গে, যে কাহিনী যুগে যুগে উজ্জয়িনীর কথাকোবিদ বৃদ্ধরা বলে গেছেন (কালিদাসের মেঘদূত স্মর্তব্য)। আচার্যের মতে এ কাহিনীতে আমরা দেখছি কোশলরাজ উদয়নের সাহায্যে উজ্জয়িনীর রাজকন্যা বাসবদত্তার পলায়ন কাহিনী। কাহিনীর চারটি অংশ, বাম থেকে দক্ষিণে পর পর সাজান। সর্ববামে দেখছি—হস্তীপৃষ্ঠে কোশলরাজ উদয়ন, নায়িকা বাসবদত্তা এবং উদয়নের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজপ্রাসাদ থেকে পলায়নপর। আরও দেখছি—উজ্জয়িনী রাজার সৈন্যদল রাজকন্যার অপহরণে বাধা দিতে এসেছে। উদয়ন দুইভাবে এ বাধা অতিক্রম করছেন—প্রথমতঃ তরবারির সাহায্যে; দ্বিতীয়তঃ কিছু স্বর্ণ মুদ্রা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বাধাদানকারী অর্থগৃধ্নু সৈনিকেরা স্বর্ণ মুদ্রা কুড়িয়ে নিচ্ছে হুড় মুড়িয়ে।

পরবর্তী দৃশ্যটিতে দেখছি—হস্তী এসে পৌঁছেছে কোশলনগরীতে। হাতীটি নতজানু হয়ে বসেছে। আরোহীরা অবতরণ করেছেন এবং

১) Arthavallava Mohanti Memorial Lectures. Dr. S. K. Chatterji, p 54

রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এ দৃশ্যে বাসবদত্তার হাতে একটি বীণা (মূল কাহিনীতে এই বীণাটিই ছিল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। উদয়ন বাসবদত্তার সান্নিধ্যে এসেছিলেন বীণা বাজান শেখাতে গিয়ে)। শেষ দৃশ্য—দক্ষিণতম অংশে দেখছি, কোশলরাজ এবং বাসবদত্তা নিভৃতে আলাপনরত। (চিত্র—৫ I দ্রষ্টব্য)

শিল্প বস্তুটির এই সনাক্তিকরণ যদি গ্রাহ্য হয় তাহলে বলতে হবে এটিই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ (secular) প্রথম কাহিনী-চিত্র। কারণ সাঁচী-ভারহুত-অজন্তার সমসাময়িক কাহিনীগুলি হয় জাতক থেকে সঙ্কলিত, নাহলে বুদ্ধের জীবনী থেকে। উদয়ন বাসবদত্তা কাহিনী নেহাতই গল্পকথা!

আমার মনে অবশ্য কয়েকটি খটকা আছে। প্রথম কথা, এই রোমান্টিক কাহিনীতে শিল্পী উদয়নের মন্ত্রীকে এতটা প্রাধান্য দিলেন কেন? প্রথম তিনটি দৃশ্যেই ঐ বাহুল্য-চরিত্রটি রয়েছে আমাদের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে। এ ছাড়া যে মূর্তিটিকে আচার্য সুনীতিকুমার উদয়নের সেনাপতি বলে চিহ্নিত করছেন সেটি আকারে ছোট—যেন কিশোরের মূর্তি। তৃতীয়তঃ দ্বিতীয় দৃশ্যে নায়িকার কাঁধে এবং তৃতীয় দৃশ্যে ঐ কিশোরের কাঁধে যেন আর একটি শিশুর মূর্তি রয়েছে। সেই শিশুটি কে? চতুর্থতঃ শেষ দৃশ্যে নায়িকার মূর্তিটি, তার বসার ভঙ্গি যেন বিষাদগ্রস্তার। আর নায়ক যেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন! এইগুলি বাসবদত্তা-উদয়ন কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায় না।

এজন্য আমার মনে হয়েছে এটা বিশ্বান্তর জাতকের কাহিনী নয় তো? জাতক কাহিনী অনুসারে—রাজপুত্র বিশ্বান্তর ছিলেন দানবীর। একবার কলিঙ্গদেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়। কলিঙ্গবাসীদের দুঃখে রাজপুত্র রাজহস্তীটিকে দান করে দেন। দেশবাসী আপত্তি জানায় কিন্তু রাজপুত্র বিশ্বান্তরের সহায়তায় কলিঙ্গবাসীরা হস্তীটিকে নিয়ে নিজ দেশে পলায়ন করে। এজন্য ক্ষুব্ধ হয়ে প্রজাবৃন্দ মহারাজের কাছে রাজপুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে এবং রাজা সঞ্জয়

পুত্রের নির্বাসন দণ্ড দেন। দানবীর বিশ্বান্তর স্ত্রী মাদ্রী, পুত্র কাহ্ন-জিন ও শিশুকন্যা কৃষ্ণাকে নিয়ে বনবাসে চলে যান। সেখানে এক-দিন যখন মাদ্রী বনফল আহরণে অন্যত্র ব্যস্ত তখন একজন ব্রাহ্মণ এসে বিশ্বান্তরের কাছে ভিক্ষা চায়। বিশ্বান্তর অনন্যোপায় হয়ে নিজ পুত্র কন্যাকে দান করে বসেন। দিবাবসানে বনফল আহরণ করে ফিরে এসে মাদ্রী এ সংবাদ পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেন। বিশ্বান্তর কী সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পান না। এ কাহিনীটি আমার 'অপরূপা অজন্তা' গ্রন্থে আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি। আলোচ্য শিল্পকর্মটি যদি বিশ্বান্তর জাতক কাহিনী হয় তাহলে বলব, প্রথম দৃশ্যে দেখছি কলিঙ্গবাসী কর্তৃক রাজহস্তীর অপহরণ। দ্বিতীয় দৃশ্যে পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী সমভিব্যাহারে বিশ্বান্তরের বনযাত্রা। তৃতীয় দৃশ্যে কাহ্নজিনের স্কন্ধে কৃষ্ণা এবং শেষ দৃশ্যে বিষাদগ্রস্তা মাদ্রীকে বিশ্বান্তরের সান্ত্বনাদানের প্রয়াস। এ-ক্ষেত্রেও অবশ্য একাধিক আপত্তির কারণ আছে। প্রথমতঃ বিশ্বান্তর হস্তীপৃষ্ঠে বনযাত্রা করেননি, করেছিলেন রথে; দ্বিতীয়তঃ বিশেষজ্ঞদের মতে এটি জৈন গুহা—বৌদ্ধ গুহা নয়, ফলে জাতক কাহিনী এখানে চিত্রিত হবার সম্ভাবনা অল্প।

কাহিনীটি যাই হোক না কেন একটা কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। গণেশগুম্ফা খননের প্রায় সমসময়ে, (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই) হয়ত বা বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর আগে-পরে ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রান্তে শিল্পীরা যে ঢঙে, যে স্টাইলে চিত্র এঁকেছেন, মূর্তি গড়েছেন তাদের পরস্পরের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। আলোচ্য প্যানেলের পুরুষ মূর্তি—তিনি উদয়নই হন অথবা বিশ্বান্তরই হন—যে ডিজাইনের শিরোভূষণ ধারণ করেছেন ঠিক ঐ ধরণের শিরস্ত্রাণ পরতেন ভারহুতের যক্ষ অথবা অজন্তা দশম গুহায় কাশী-রাজ। এখানকার মেয়েটির পায়ের মল যে স্যাঁকরা বানিয়েছিল সেই যেন কপিলাবস্তু-মহিষীর (সাঁচী উত্তর তোরণে তৃতীয় প্যানেলে, যেখানে শুদ্ধোধন ও মহাগৌতমী এসেছেন নগ্রোধারাম বিহারে

তথাগত দর্শনে) পায়ের মলটি বানিয়েছিল এবং বানিয়েছিল কাশী-রাজমহিষীর চরণ নূপুর (অজন্তা দশমগুহা, ষড়দন্ত জাতক)। উদয় গিরির রাজপুরুষ আর ভারহুতের কুবের যক্ষ কি একই ভঙ্গিতে কোমরবন্ধ বাঁধতেন ? অজন্তা দশমগুহায় ষড়দন্ত জাতকে কাশীরাজ যে ভঙ্গিতে মূর্ছাতুরা মহিষীকে ধরতে চেয়েছিলেন, এখানেও শেষ দৃশ্যে নায়কের হুবহু সেই ভঙ্গি। অজন্তা সপ্তদশগুহায় (অনেক পরবর্তী যুগে) বিশ্বান্তর জাতকে বিষাদগ্রস্তা মাদ্রীর ভঙ্গিমার সঙ্গে

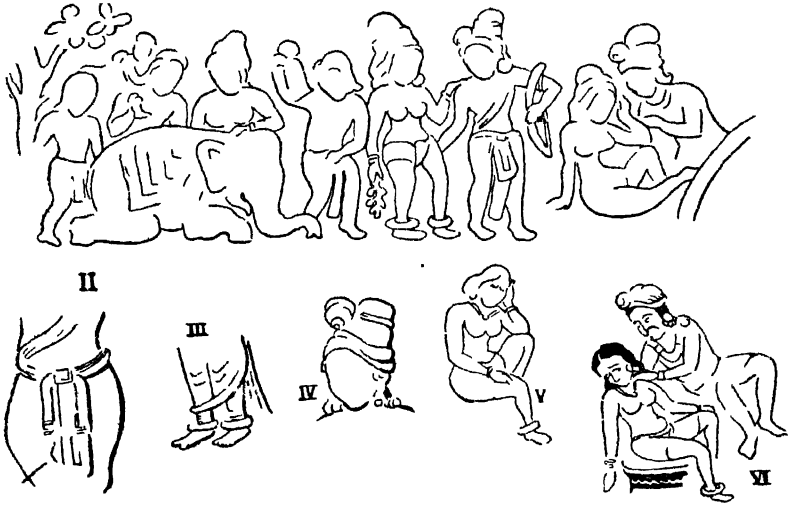

চিত্র—৫ ॥ গণেশগুম্ফার ভাস্কর্য

I— গণেশগুম্ফার অর্ধোত্থিত ভাস্কর্য-কাহিনীর শেষাংশ

II— ভারহুত কুবের যক্ষের কোমরবন্ধ (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী)

III— সাঁচী উত্তর-তোরণে রানীর পায়ের মল (ঐ)

IV— অজন্তা দশম-গুহায় রাজার শিরোভূষণ (ঐ)

V— ঐ বিষাদগ্রস্তা কাশীরাজ মহিষী, ছদ্দন্তজাতক (ঐ)

VI— ঐ রাজা কর্তৃক রানীকে সান্ত্বনাদান, ঐ ঐ

এবং দশমগুহায় (সমসময়ে) কাশীরাজ মহিষীর ভঙ্গিমার সঙ্গে এই প্যানেলের শেষদৃশ্যে নায়িকার ভঙ্গিটিও তুলনীয় (চিত্র— ৫)।

এই শিল্প নিদর্শনগুলি প্রায় সমসাময়িক হলেও এদের ভৌগোলিক দূরত্ব এত বেশী যে সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক শিল্পী অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। অথচ সাদৃশ্যগুলিও একেবারে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিতে পারছি কই ? কেমন করে এমন হল ?

রানীগুম্ফা : অজন্তাতে আমরা দেখেছি, প্রথম যুগে বৌদ্ধ শ্রমণেরা একটি মাত্র চৈত্য এবং একটি মাত্র বিহার তৈরী করেছিলেন ; কিন্তু কালে যখন ক্রমাগত বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল ওখানে আসতে শুরু করেন তখন ওঁরা আরও চৈত্য আরও বিহার নির্মাণ করতে বাধ্য হন। উদয়গিরিতেও মনে হয় সেই একই কারণে রানীগুম্ফাটিকে খনন করতে হয়েছিল। চিত্র—২-তে দেখতে পাচ্ছি ইতিপূর্বে খোদাই করা গুম্ফাগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে যেন রানীগুম্ফাকে ঘিরে রেখেছে। অর্থাৎ ওদের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত এই গুহাটি ছিল বিশেষ প্রয়োজনে শ্রমণদের সম্মিলিত হবার স্থান। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে যেমন চৈত্যে শ্রমণরা পূজা করতে আসতেন এবং বিহারে বাস করতেন, বোধকরি তেমনিভাবে এই জৈন সন্ন্যাসীরা অর্ধচন্দ্রাকার গুহাগুলিতে বাস করতেন এবং রানীগুম্ফাতে সমবেত হতেন সম্মিলিত আরাধনার উদ্দেশ্যে। সেজন্যই এই রানীগুম্ফার মাঝখানে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। স্বর্গপুরী অথবা জয়বিজয় গুহাতেও এ রকম প্রাঙ্গণ ছিল ; মনে হয় শ্রমণদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ার পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রাঙ্গণের প্রয়োজন অনুভূত হল—এবং সেজন্যই রানীগুম্ফার এই বিচিত্র রূপ।

গুহামন্দিরটি দ্বিতল। উপরতলার বারান্দাটি প্রায় ৬২ ফুট লম্বা। এতে ছিল নয়টি স্তম্ভ। পশ্চিমদিকের দুটি স্তম্ভ ছাড়া সবগুলিকেই ভগ্নাবস্থায় পাওয়া যায় ; পুরাতত্ত্ব বিভাগ সেগুলিকে নূতন করে তৈরী করেছেন। অজন্তাতে বা বৌদ্ধগয়াতে যে ভুল করা হয়েছে সৌভাগ্য

ক্রমে এখানে কর্তৃপক্ষ সে ভুল করেননি। উপরোক্ত দুই স্থানে মেরামতের কাজ এমনভাবে করা হয়েছে যে, সাধারণ দর্শক বুঝে উঠতে পারেন না—কোনটা আদিমরূপ, কোনটা মেরামতির কারিগরি। এ-ক্ষেত্রে সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। বারান্দার পরে পাশাপাশি চারটি গুহা-কক্ষ। প্রতিটি ঘরে দুটি করে দ্বার— বারান্দার দিকে। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার দ্বার নেই। বস্তুতঃ কোনও ভারতীয় গুহাতেই এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার দ্বার, যাকে বলি intercommunication door, সে-জাতীয় দ্বার নেই। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়, অজন্তায়, এলোরাতে অমন অসংখ্য পাশাপাশি গুহা কক্ষ আছে; সর্বত্রই শুধু একদিকে দরজা— বারান্দার দিকে। এখানে ঘরগুলির মাপ ১৫′ × ৯′, উচ্চতাও মাত্র ৪-৫ ফুট। দরজাগুলি ছোট; প্রায় ৪′ × ২′, ঐ টা না

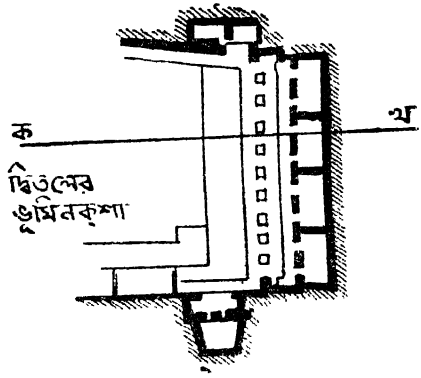

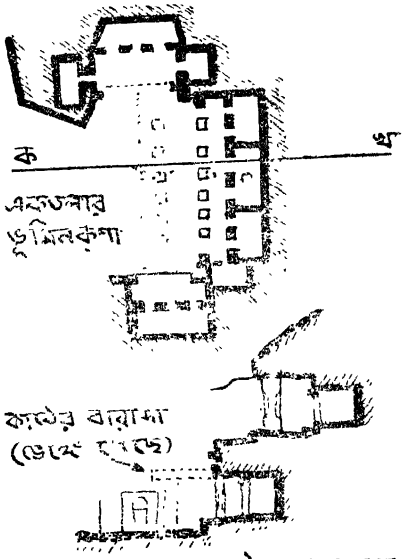

ক-খ রেখায় কাটা সেকসান
স্কেল : ৫০′ = ১″

চিত্র—৬ ॥ রানীগুম্ফার প্ল্যান

বারান্দার দুই প্রান্তে আরও দুটি কক্ষ আছে এবং বারান্দাটি দুদিকে সমকোণে বেঁকে গেছে। দ্বিতলে পূর্ব প্রান্তের বারান্দায় একটি প্রশস্ত প্রস্তরাসন আছে। মনে হয় মাঝখানের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যখন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত তখন প্রধান শ্রমণ ঐ প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট হয়ে তা প্রত্যক্ষ করতেন।

গুহামন্দিরটির একতলা ও দ্বিতলের ভূমি নক্শা (প্ল্যান) এবং 'ক-খ' রেখায় ছেদ করা একটি সেক্সানাল এলিভেসানও যুক্ত করেছি চিত্র—৬-এ।

মাঝখানের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটির মাপ ৪৯ ফুট × ২৪ ফুট। আগেই বলেছি, একতলার খোলা ছাদ ও স্তম্ভগুলি কালে ভেঙে যায়। তখন ঐ বিধ্বস্ত অংশটি কাঠের কড়ি-বরগা স্তম্ভ দিয়ে তৈরী করার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। সে কাজের অবশ্য চিহ্ন-মাত্র অবশিষ্ট নেই, না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ কাঠ দু-হাজার বছর ধরে অবিকৃত থাকে না। কিন্তু কাঠের কড়ি একতলার যে অংশে নিজভার ন্যস্ত করত সেখানে পাথরে যে গর্তগুলি করা হয়েছিল তার চিহ্ন এখনও আছে। এর ফলে ঐ অংশের ভাস্কর্যও নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতলের ঐ অংশের ভাস্কর্য কিন্তু অক্ষত রয়েছে। এবার ঐ ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে আসা যাক।

অন্যান্য গুহায় যেমন ফুল লতা-পাতা, রেলিং, এবং নাগ-নাগিনী, গন্ধর্ব ইত্যাদি দেখেছি এখানেও তা আছে—এ ছাড়াও কতকগুলি অদ্ভুত সুন্দর নমুনা আছে। একটি সিংহবাহিনী নারী মূর্তি, রাজা কনবেল ও তাঁর পত্নী, কতকগুলি হাতীর ভাস্কর্য লক্ষ্য করার মত। এ-ছাড়াও বারান্দার 'ফ্রিজ' অংশে কিছু অর্ধোত্থিত (half relief) মূর্তি আছে, যা দেখে বোঝা যায় সেগুলি শুধুমাত্র অলঙ্কার নয়—শিল্পী কি যেন একটা কাহিনী বলতে চান, যার অর্থ স্পষ্ট নয়—ইঙ্গিতটা মর্মভেদী! একই কাহিনী দুটি বিভিন্ন অংশে খোদাই করা। প্রথমে দেখছি, একজন পুরুষ নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছেন এবং একজন রমনী তাঁর চরণপ্রান্তে সেবারতা। এ-দুটি মূর্তির ব্যাখ্যা

নিষ্প্রয়োজন—নিতান্ত একটি মামুলী দাম্পত্য চিত্র। ইচ্ছামত আপনি ঐ পুরুষ-রমনীর নামকরণ করতে পারেন—বলতে পারেন, ওরা দুজন চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরামচন্দ্র-সীতা অথবা জতুগৃহে অচলা-মহিম ; কিম্বা 'ঘরে বাইরে'র ঘরে বিমলা-মহেন্দ্র। এরপরই দেখছি নাটকের তৃতীয় চরিত্রের আবির্ভাব—দ্বিতীয় একজন পুরুষ। নায়িকাই তাকে হাতে ধরে নিয়ে আসছে—পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে নিশ্চিন্ত-নির্ভর স্বামীর সঙ্গে। অচলা অথবা বিমলা যেমন স্বামীর বন্ধুর প্রতি আতিথেয়তায় কার্পণ্য করেনি। তার পরের দৃশ্যটাকে আমি যদি প্রতীকী বলে মনে করি তাহলে পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। চাক্ষুষ দেখছি—একটি নারী ও একটি পুরুষ মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধ করছে। আমার তো মনে হয়েছে এ দৃশ্যে নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বই ফুটে উঠেছে। নবাগত নায়কের আকর্ষণে ওই ভাবেই কি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়নি 'গৃহদাহের' অচলা অথবা 'ঘরে বাইরে-'র মক্ষিরানী ? এ দ্বন্দ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণামটি খোদাই করা হয়েছে পরবর্তী দৃশ্যে—যেখানে দেখছি, নবাগত পুরুষটি সবলে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের হতভাগিনী নায়িকাকে।

অতি ক্ষুদ্র একাঙ্ক নাটিকা—কিন্তু নিঃসন্দেহে সে বিয়োগান্ত নাটক স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ চিত্র-কাহিনীর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা জানি না। এক এক পণ্ডিত এক এক অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা দাখিল করেছেন। আমাদের জাতীয় অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যা বলছেন তার বঙ্গানুবাদ ঃ

> "গল্পটিকে কি এভাবে সাজানো যায় ? সিংহল দ্বীপে যক্ষিনীদের একটা বদনাম ছিল যে, তারা পথহারা নাবিকদের আহ্বান করে নিজ আবাসে নিয়ে যেত এবং অতিথি সৎকারের নামে তাদের আপ্যায়ন করে ঘুম পাড়িয়ে হত্যা করত। অতিথির নরমাংসে রাক্ষসীরা উদরপূর্তি করত! প্রথম দৃশ্যটি মনে করা যেতে পারে তারই একটি প্রতিচ্ছবি। সুখসুপ্ত নাবিকের পাশে

তার রক্তলোলুপ নায়িকার প্রতীক্ষা! দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখছি, দ্বিতীয় একজন নাবিক ঐ একইভাবে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে আসছে রাক্ষসী গৃহস্বামিনীর হাত ধরে! কিন্তু এই দ্বিতীয় নাবিক সহসা যক্ষিনীর চাতুরী ধরে ফেলে এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। শেষ দৃশ্যে দেখছি মায়াবিনী রাক্ষসীকে পরাভূত করে নাবিক তাকে অপহরণ করছে—নিয়ে যাচ্ছে নিজ রাজ্যে। এ জাতীয় কাহিনী বৌদ্ধ শাস্ত্রে একাধিক আছে—যথা: মহাবংশে সিংহল বিজয় অথবা জাতকের ১৯৬ নং কাহিনীটি।

"সে যাই হোক, স্বীকার করতেই হবে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর।"[১]

কেউ কেউ বলছেন, এ চিত্র-কাহিনীর বিষয়বস্তু হচ্ছে কলিঙ্গে যবনরাজ কর্তৃক প্রভাবতীদেবীর অপহরণ এবং ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কর্তৃক তার উদ্ধার কার্য[২]।

আমরা গবেষক নই, রসিকমাত্র, তাই ও সাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন খাতে বইতে পারে।

দেখছি, মূর্তিগুলি দু-হাজার বৎসরের প্রাচীন—মহাকালের নিষ্ঠুর কশাঘাতে মূর্তিগুলির সৌন্দর্য, তাদের কমনীয়তা, মাধুর্য ম্লান হয়ে গেছে, ক্ষয়িত হয়ে গেছে। তবু যেন ঐ অবহেলিত প্রাচীর গাত্রে তিনটি কুশীলব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতীক্ষা করে আছে আপনার দু-ফোঁটা চোখের জলের প্রত্যাশায়। আমাদের তো মনে হয়েছে এ কাহিনীর বক্তব্য বিনা ব্যাখ্যাতেই সোচ্চার:

১) "Artavallabha Mahanti Memorial Lectures' first series by Dr. S. K. Chatterji (Orissa Sahitya Akademi, Bhubaneswar) p. 56

২) Orissa and Her Remains (1912)-pp. 42 , by M. M. Ganguly.

"স্পষ্ট করে দেখিনে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধেনা তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়েব পরে ডাকাত এসে হবণ করল মেয়ে,
এই বাবতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতাব চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জনার মত।"

আমাব তো মনে হয়েছে ঐ মূর্তিগুলি খোদাই হবাব দু-হাজার বছর পরে এক কবি যেমন কোন এক বামুনমারা দিঘির ঘাটে পাকুড়-তলিব মাঠে বসে এক আদিবিশ্ব ঠাকুরমায়ের ঝিম্ ঝিমানি সুবে শুনতে পেয়েছিলেন অনাদিকালের সেই গ্রাম্য ছড়াটিতে—'ঢাকিরা ডাক বাজায় খালে বিলে, সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাত দলের মেলে।'—ঠিক তেমনি দু-হাজার বছর আগের কোন শিল্পী অমনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন আজকের দুনিয়াব একটি মর্মান্তিক সামান্য ঘটনা। ছেনি-হাতুড়ি হাতে তিনিও অনুভব করেছিলেন 'হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টনটনানি, পাঁজরগুলোব তলায়-তলায় ব্যথা হানি।' তাই আমি মেনে নিতে পারিনি যে ঐ মেয়েটি সিংহলেব কোন মাযাবিনী রাক্ষসী। আমার চোখে ও এ-যুগেব আমাদের 'পাড়ার কালো মেয়ে—ঝুড়ি ভ'বে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম, সামান্য তার দাম, ঘরের গাছেব আম আনত কাঁচামিঠা' কবি যাকে 'আনির বদলে ভুলে চার-আনিটা' দিয়ে বলতেন! দেখছি, অন্ধ কলু বুড়ির সমর্থ নাতনীটিকে কোন্ গোঁয়ার খুনি কেড়ে নিয়ে ভাগছে! বিশ্ববিশ্রুত জাতীয় অধ্যাপকের শাস্ত্রীয়-ব্যাখ্যা আমরা মানতে না পারলেও নিশ্চয় তিনি ক্ষুব্ধ হবেন না—কারণ তার গুরুই তো বলে গেছেন:

"শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে,—
উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার, বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে॥"

দু-হাজার বছর ধরে খালে বিলে ঢাকিরা এই আসুরিক ক্ষমতার জয়ঢাক বাজিয়েই চলেছে—আর রাজশক্তির বুড়ো হাতি গলার ঘণ্টা ঢন্‌ঢনিয়ে অন্যমনস্কভাবে তার পাশ দিয়ে চলে গেছে! হয়তো সেই শাশ্বত নারীর চিরন্তন অবমাননারই একটি দলিল ঐ পাথরের গায়ে আঁকা আছে মহাকালের খাতায়!

কাহিনীগুলির বক্তব্য যাই হোক না কেন এ গুহা এবং গণেশ গুম্ফার ভাস্কর্যগুলি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের অতি সুন্দর নিদর্শন। যাকে ইংরেজিতে বলে ক্লাসিকাল। পারস্য বা গ্রীক শিল্পের ছাপ এদের উপর নেই—এরা নিছক ভারতীয় শিল্পের নমুনা। ফার্গুসনের মতে এই ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি ভারহুত ও সাচী শিল্পের অগ্রজ এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন।[১] যদিও বর্তমানে এ মত আর মানা চলে না।

এ-দুটি বাস-রিলিফ ছাড়া রানী গুম্ফায় আরও একটি ভাস্কর্যের নমুনা আছে যা থেকে বোঝা যায় খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বেও কলিঙ্গের এই একান্তবাসী গুহা-শিল্পীর দল বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন না। তাঁদের সমসময়ে এবং কিছুকাল পূর্ব থেকেই গ্রীক, ব্যাক্‌ট্রিয়ান ও পারসীক শিল্পধারা উত্তরখণ্ডে ভারতীয় শিল্পে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। সেই উত্তর-পশ্চিম বায়ুকোণের বায়ু এই সুদূর কলিঙ্গদেশেও প্রবাহিত হয়েছিল। সিংহবাহিনী নারী মূর্তিটির পাশে একটি দ্বারপালের মূর্তিতে দেখছি সেই প্রভাব। দ্বারপালের পায়ে জুতা ও মোজা, পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক-জাতীয়

১) "The Bharhut sculptures, however, having shown us how perfect the native art was at a very early date, have considerably modified our opinion on the subject; and those in the Rāni Cave, being so essentially Indian in their style, now appear to me the oldest."—History of Indian and Eastern Architecture Vol. II. p 15, James Fergusson.

কুর্তা, মাজায় কোমরবন্ধ এবং বাম কটিবন্ধে যে তরবারি ঝুলছে তা ঋজু রোমক তরবারি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা যেতে পারে যে, সম্রাট অশোক তাঁর বেতন-ভুক্ত সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রীক ও ব্যাক্‌ট্রিয়ান সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন। অশোকের কলিঙ্গ বিজয়েব সময় নিঃসন্দেহে এ জাতীয় বিদেশী সৈন্য হাজারে হাজারে কলিঙ্গদেশে এসেছিল এবং হয়তো তোশলীতে মগধরাজের প্রতিনিধিব সেনাবাহিনীতেও ছিল। ফলে পূর্ব-প্রান্তবাসী কলিঙ্গ শিল্পীর পক্ষে ঐ বিজাতীয় সৈন্যের আকৃতি বা সাজ পোশাক অজানা ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আদি হিন্দু যুগ [৫৭৫ খ্রীঃ—৮০০ খ্রীঃ]

উদয়গিরি-খণ্ডগিরির শিল্পীদলের উত্তর-সাধকরা যেন হঠাৎ হারিয়ে গেল। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব থেকে প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ধরে এই শিল্পীদলকে আমরা উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে গুহা খননের কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখেছি। কিন্তু তার পরেই একটা বিরাট ফাঁক। কলিঙ্গের দেব-দেউলে পরবর্তী সংযোজন প্রায় পাঁচ ছয় শত বছর পরে। উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে ঐ গুহাশিল্পীর দল কোথা থেকে এসেছিলেন, কেন এসেছিলেন, সে সম্বন্ধে তবু কিছুটা আন্দাজ করতে পারি—কিন্তু তাঁরা কেমন করে হারিয়ে গেলেন সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। সম্রাট অশোকের আদেশে বরাবর পর্বতে, বিহারে, পাঁচটি জৈন গুহা খনন করা হয়েছিল একথা আগেই বলেছি। অশোক-পৌত্র দশরথের আদেশক্রমে গোপিকা গুহাটি ও অজীবক জৈন সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত হয়। এ সবই কলিঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিকে অবস্থিত। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন সুঙ্গ ও কাণ্বরাজেরা পাটলিপুত্র অধিকার করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘোষণা করলেন—অশ্বমেধ যজ্ঞের ধোঁয়ায় আবৃত হয়ে গেল মগধের রাজধানী তখন ঐ জৈন গুহাশিল্পীর দল স্বতঃই স্থানান্তরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। বিহারের দক্ষিণেই উড়িষ্যা রাজ্য—যার রাজা করবেল জৈন ধর্মাবলম্বী। সুতরাং উদয়-গিরিতে জৈন শিল্পীর দল কোথা থেকে এবং কেন এসেছিলেন তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। তাঁরা এসেছিলেন কলিঙ্গ নগরের চেদি রাজের আশ্রয়ে। বর্তমান শিশুপালগড়ই মৌর্য আমলের তোশলী এবং সম্ভবতঃ সেইটিই মহাভারতবর্ণিত চেদি রাজের রাজধানী কলিঙ্গনগর।

কলিঙ্গরাজ করবেলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর রাজ্য দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিজিত হয়েছিল। ক্ষমতাশালী পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে করবেল যেভাবে মগধ জয় করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে শ্রীসতকর্ণীর উত্তরসাধক গৌতমীপুত্র সতকর্ণী করবেলের মৃত্যুর পরেই কলিঙ্গরাজ্য বিধ্বস্ত করেন। করবেল যে রাজবংশের সন্তান সেই মহামেঘবাহন বংশের হাত থেকে রাজদণ্ড চলে গেল অন্ধ্রের সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সতকর্ণীর হাতে। কলিঙ্গদেশ হল অন্ধ্রের সাতবাহনরাজার করদ রাজ্য। প্রায় তিনশ বছর ধরে কলিঙ্গদেশ ছিল অন্ধ্র সাতবাহনদের অধিকারে। এই সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন নেই। শুধু দুটি যক্ষমূর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তি দুটি উদয়গিরি পর্বতের অনতিদূরে ডুমডুমা গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে ভুবনেশ্বরের যাদুঘরে রাখা আছে। যক্ষমূর্তি দুটির একই মাপ একই আকার—জোড়-মেলান। মনে হয় কোনও তোরণের দুই স্তম্ভে অথবা কোন প্রবেশ-দ্বারের দু-পার্শ্বে তারা শোভিত ছিল। এ-দুটি মূর্তির আকৃতি, অলঙ্কার, বস্ত্র ও ভঙ্গি সাচী স্তূপের যক্ষমূর্তির মত। উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতেও কয়েকটি যক্ষমূর্তি আছে—সেগুলি যেন এই দুটি মূর্তিরই অনুকরণ অর্থাৎ পরবর্তী সংযোজন। এ-ছাড়া অন্ধ্র যুগের কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে শিশুপালগড়ে অথবা ভুবনেশ্বরে—সেগুলি মুদ্রা।

অন্ধ্র-অধিকার শেষ হচ্ছে তৃতীয় শতাব্দীতে, শিশুপালগড়ও পরিত্যক্ত হয়েছিল প্রায় ঐ সময়ে। তারপর আবার এক বন্ধ্যা অন্ধ-যুগ। এ অন্ধযুগ শুধু কলিঙ্গেরই নয়, সারা ভারতবর্ষের। কুশান বংশের পতনের পর এবং গুপ্ত যুগের সূচনার পূর্বে সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসই অন্ধকারে অবলুপ্ত। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এ-যুগে কুশানদের পরে মুরুণ্ডা রাজবংশ কিছুদিন কলিঙ্গদেশ শাসন করেন। কুশানদের মত মুরুণ্ডারাও বহিরাগত। জৈনগ্রন্থ অভিধান-রাজেন্দ্র মতে পাটলীপুত্রের জনৈক মুরুণ্ডা রাজার বিধবা মহিষী জৈনধর্মে

দীক্ষিত হন—পুরাণেও অন্ধ্র যুগের পরে এবং গুপ্ত যুগের পূর্বে তের-জন মুরুণ্ডারাজের নাম পাওয়া যায়।[১] এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ গ্রন্থ দত্তাবংশে[২] উল্লিখিত দন্তপুরের কাহিনীও স্মরণ করা যেতে পারে।

কুশীনগরে বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর যে আটটি শেষচিহ্ন আটজন ভারতীয় নৃপতির মধ্যে বণ্টন করা হয় তার ভিতর বাম শ্ব-দন্তটি পড়েছিল কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তের ভাগে। কলিঙ্গরাজ সেই পবিত্র শ্ব-দন্তের উপর একটি ছোট্ট স্তূপ নির্মান করান—স্থানটির নাম হয় দন্তপুর। ক্রমে ব্রহ্মদত্তের পুত্র কাশীরাজ, পৌত্র সুনন্দ এবং প্রপৌত্র গুহশিব পর পর তিনটি স্তূপ নির্মাণ করে আদিম স্তূপটিকে বৃহদায়তন করে তোলেন। গুহশিব নিজ রাজ্য থেকে ব্রাহ্মণ ও জৈন সম্প্রদায়ের লোকদের বিতাড়ন করেন এবং তাঁরা পাটলীপুত্রের মগধরাজ পাণ্ডুর শরণাপন্ন হন। যে-আমলের কথা তখন কলিঙ্গরাজ গুহশিব ছিলেন পাটলীপুত্ররাজ পাণ্ডুর করদ রাজা। পাণ্ডু সবকথা শুনে ঐ শ্ব-দন্তটি নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন এবং মহা আড়ম্বরে তার পূজার ব্যবস্থা করেন। স্বয়ং পাণ্ডুরাজই যখন বৌদ্ধ হয়ে যাবার মত মনোভাব দেখালেন তখন জৈন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্ররোচনায় উজ্জয়িনীর রাজপুত্র দন্তকুমার ঐ শ্ব-দন্তটি কৌশলে অপহরণ করেন —এবং তা সুদূর সিংহলে পাঠিয়ে দেন। বৌদ্ধধর্মীরা বিশ্বাস করেন, সিংহলের অনুরাধাপুরের থুমারাপ স্তূপে আজও সেই শ্ব-দন্তটি সুরক্ষিত আছে।

দত্তাবংশের এই মূল কাহিনীটি ৩১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন সিংহলী ভাষায় লিখিত হয়েছিল। হিন্দুপুরাণেও এ কাহিনীর স্বীকৃতি আছে। কাহিনীটির ভিতর ঐতিহাসিক সত্য যথেষ্ট পরিমাণেই আছে বলে অনুমান করা যায়।[১] অন্তত এটুকু আমরা অনুমান করতে পারি

---

১) Ancient India, No. 5, pp. 100-101

২) Dathāvansa, Edited and Translated by Dr.B. C. Law.

৩) বলা বাহুল্য বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের মাত্র তিনপুরুষ পরেই এ ঘটনা

যে, কলিঙ্গ রাজ্যের উপর মুরুণ্ডারাজের অধিকার অন্ধ্র যুগের পর অনস্বীকার্য।

৩২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ থেকে গুপ্ত-যুগের সূচনা ধরা যেতে পারে। গুপ্তযুগের দ্বিতীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৩৭৬ অব্দ) যে দিগ্বিজয় করেন সে তালিকায় কোশলের (মহানদী উপত্যকার উত্তরাংশ) নাম পাচ্ছি; এ ছাড়া এরণ্ডপল্লীর দামনরাজ, দেবরাষ্ট্রের কুবেরও সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করেন। শেষোক্ত দুজন নৃপতি কলিঙ্গেরই সামন্ত রাজা; তাঁরা গুপ্তসম্রাটের দিগ্বিজয় প্রতিহত করতে পারেননি বটে কিন্তু স্বাধীন রাজা হিসাবেই সম্ভবতঃ রাজত্ব করে যান। তবু গুপ্তযুগের ছাপ যে ঐ সূত্রে কলিঙ্গে আসতে শুরু করে এ কথা বুঝতে পারা যায়। সমুদ্রগুপ্তের পরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের আমলে সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের যে পুনরভ্যুত্থান হয় তার তরঙ্গ কলিঙ্গের তীরেও এসে লাগে। কলিঙ্গদেশের অনেক তাম্র শাসনে দেখছি গুপ্ত-অব্দের সময় সঙ্কেত। ফলে পরবর্তীকালের কলিঙ্গের দেব-দেউলে নানাভাবে গুপ্তযুগের ছাপ পড়া অস্বাভাবিক নয়—তবু উড়িষ্যাতে যে স্থাপত্য-শিল্প ক্রমে বিকাশ লাভ করল তার একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, যা অনন্যসাধারণ—যার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থাপত্যের হুবহু মিল নেই।

কলিঙ্গের দেব-দেউলের ইতিহাসে বিবর্তনটা এসেছে যে সূত্রে তাকে এক নিঃশ্বাসে বলতে পারি—'বৌদ্ধ-জৈন-বৌদ্ধ—পাশুপত (শৈব)—বিষ্ণু।' সাল-শতাব্দী দিয়ে ঐ সূত্রটিকে বাঁধতে হলে সংক্ষেপে বলা যায়—মৌর্য অধিকার শেষ হবার পর জৈন যুগ হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম খ্রীষ্টাব্দ। বৌদ্ধ যুগ তার পরের প্রায় তিন চারশ' বছর। শৈব-যুগ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী

ঘটেনি। গুহাশিব নিশ্চয়ই অনেক পরের যুগের লোক। কারণ, অশোকের পূর্বে কলিঙ্গরাজ্য কখনও মগধ অধীনে ছিল না।

এবং তারপর বৈষ্ণবদের যুগ। বলা বাহুল্য যে, এক একটি সময়কাল এক এক যুগে চিহ্নিত করার মানে এ নয় যে, অন্য দেবতার উপাসকেরা সে যুগে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন। শৈব-যুগেও বিষ্ণুমন্দির নির্মিত হয়েছে অথবা বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম স্থানবিশেষে প্রসারলাভ করেছে। এ ছাড়া মহাযানী বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিকের দল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তান্ত্রিকেরা বৌদ্ধযুগের শেষ পর্যায় থেকে বরাবরই কলিঙ্গের দেব-দেউলে প্রভাব বিস্তার করেছে। কলিঙ্গের দেব-দেউলের বিবর্তনকে এই যে মোটামুটি চারটি যুগে ভাগ করলাম তাদের উত্থান-পতনের সামগ্রিক ইতিহাসটা সর্বপ্রথমেই সংক্ষেপে আলোচনা করে নিলে ভাল হয়।

জৈনযুগ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। মৌর্য-যুগের অবসানে মগধে যখন সুঙ্গ রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন তখন জৈন শিল্পীর দল জৈন ধর্মাবলম্বী চেদীরাজ কববেলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেন। করবেলের পতনের পরে জৈন শিল্পী দলের আর খোঁজ পাই না। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় থেকেই সে রাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা একটি খুঁটি গাড়েন।

কলিঙ্গরাজ্যে বৌদ্ধদেব প্রভাব যে অতি প্রাচীনকাল থেকে ফল্গুধারায় প্রভাবিত ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। ব্রহ্মদত্তের দন্তপুরের কথা পূর্বেই বলেছি; বিনয়পিটকে দেখছি বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বলাভের পর তাঁর কাছে যে কজন বণিক দেখা করতে এসেছিলেন—সেই উরুবিল্ব গ্রামে—তাঁরা উক্কলের লোক। পণ্ডিতেরা বলেছেন উক্কল হচ্ছে উৎকলই। সুতরাং আদি যুগ থেকেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কলিঙ্গের সম্পর্ক রয়ে গেছে। মৌর্যোত্তর যুগেও আর্যদেব, নাগার্জুন, দিঙনাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ অর্হতেরা দ্বিতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কলিঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে গেছেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈনিক পরিব্রাজক তাঁর 'উ-টু' বা ওড্র দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, সে দেশে শতাধিক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম তিনি দেখেছিলেন;

এবং আরও বলেছেন ওড্র দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল 'পু-শী-পো-খিলি' মহাবিহার। কটক-জেলায় এই পুষ্পগিরি মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুতঃ কটকে 'আসিয়া' পর্বতমালায় ললিতাগিরি, উদয়গিরি এবং রত্নগিরি বিহার বৌদ্ধধর্মের সে-কালীন একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল এটা বোঝা যায়। আরও পরবর্তীযুগে সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে এই মহাবিহারে এল এক নূতন ভাব-তরঙ্গ। এ যাবৎকাল ঐ সব সঙ্ঘরামে ছিল মহাযানী বৌদ্ধদের আধিপত্য। এইবার এল বজ্রযানীদের যুগ। মহাযানীদের মতে আদি বুদ্ধের উপর আরোপিত হয়েছিল শূন্যতা গুণ, এখন আদি বুদ্ধের পরিবর্তে এলেন রজ্রসত্ত্ব এবং তাঁর গুণ হল বজ্র। এ তো তত্ত্বের কথা—কিন্তু সেই 'বজ্র' লাভের জন্য যে সব প্রক্রিয়া শুরু হল তা ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক আচারের মত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মদ্যপান শুরু করলেন, মাংস ভক্ষণে আপত্তি নাই, এমনকি নরহত্যা আর বামাচার শুরু হয়ে গেল বজ্র-যানীদের মধ্যে। তান্ত্রিক অর্হৎ নাগার্জুন এলেন পুষ্পগিরি বিহারে, আরও পরে এলেন অনঙ্গ বজ্র এবং ইন্দ্রভূতি। নালন্দা থেকে এলেন প্রজ্ঞা—যিনি চীন সম্রাটের কাছে অবতংশতকের শেষ অধ্যায় নিয়ে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মমহামাত্যদের আদেশে।

মোট কথা উপকূলভাগের অনেকস্থানে বৌদ্ধদের ঘাঁটি টিকেছিল দীর্ঘকাল। বালেশ্বর জেলার অযোধ্যা, কোপারি, সোলামপুর, ফুলবনীতে বাউধ; এবং কটকজেলার বাণেশ্বরনশী, ললিতাগিরি, উদয়াগিরি এবং রত্নগিরিতেই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের ঘাঁটি। ভুবনেশ্বর যখন শৈব মন্দিরে প্রায় ভরে গেছে তখনও এই কয়টি বিহারের অন্তরালে বজ্রযানী বৌদ্ধরা তাঁদের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এবার দেখা যাক জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে পর্যুদস্ত করে কলিঙ্গে কেমন করে শৈবপূজারীদের প্রাধাণ্য বিস্তার হল। আগেই বলেছি, গুপ্তযুগের প্রভাবও পড়েছিল কলিঙ্গতে সমুদ্রগুপ্তের আমল থেকে।

তদানীন্তন কলিঙ্গের সামন্তরাজা দ্বিতীয় মাধবরাজ একটি তাম্রশাসনে গুপ্তাব্দ দিয়ে সময়কাল চিহ্নিত করেছিলেন। গুপ্ত-সংবৎ ৩০০-তে (অর্থাৎ ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে) দেখছি, দ্বিতীয় মাধবরাজ নিজেকে মহারাজ শশাঙ্কের করদ-রাজ বলে বর্ণনা করছেন। শশাঙ্ক ছিলেন শিব-উপাসক, গৌড়ের বিখ্যাত সম্রাট, যাঁর সঙ্গে হর্ষবর্ধনের ইতিহাস-বিখ্যাত সংগ্রাম হয়েছিল। প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যেমন একই সঙ্গে ভারতাকাশে তিন-সূর্যের উদয় হয়েছিল—মগদের পুষ্যমিত্র, কলিঙ্গের করবেল এবং অন্ধ্র সাতবাহনেব শ্রীসতকর্ণী—এই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদেও তেমনি একই সঙ্গে কয়েকজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী সম্রাটের অভ্যুত্থান হয়েছিল ভাবত মহা-উপদ্বীপে। কান্যকুব্জের হর্ষবর্ধন, গৌড়ের শশাঙ্ক. প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের ভাস্করবর্মা এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী। চারজন সম্রাটের মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কের প্রতিই ইতিহাস সুবিচার কবেনি। তার কারণও আছে। এ-যুগের ইতিহাস বস্তুতঃ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন-ৎসাঙেব বিবরণের উপর গড়ে উঠেছে ; এবং যেহেতু শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধদের বিপক্ষ শিবিরে তাই তাঁকে প্রায় নর-রাক্ষসেব রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু শশাঙ্ক সম্বন্ধে হিন্দু পুরাণ-শাস্ত্র অন্য কথা বলে। একাম্র-পুবাণ মতে শশাঙ্কই ভুবনেশ্বরে ত্রিভুবনেশ্বব মন্দিরেব প্রতিষ্ঠাতা—কলিঙ্গে শিব-পূজার প্রথম পূজারী। একাম্র-পুবাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শিব এবং ব্রহ্মার একটি কথোপকথন লক্ষণীয়। পিতামত ব্রহ্মা মহাদেবকে বলছেন যে, তাঁর ইচ্ছা মর্ত্যে শিবপূজার প্রবর্তণের উদ্দেশ্যে তিনি ত্রিভুবনেশ্বরে একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে এক অদৃষ্টপূর্ব মন্দির নির্মাণ করান। প্রত্যুত্তরে মহাদেব বলছেন, "হে পিতামহ বিভুতেশ্বর, এ কাজ আপনার নয়। কলিযুগের একপাদ অতিক্রান্ত হলে আমার মস্তকস্থিত শশাঙ্ক ভূতলে অবতীর্ণ হবেন এবং ত্রিভুবনেশ্বরে আমার জন্য একটি অক্ষয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।"

স্বর্ণাদ্রি-মহোদয়, একাম্র-চন্দ্রিকা এবং কপিল-সংহিতায় স্পষ্টাক্ষরে

বলা হয়েছে যে, ত্রিভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মূর্তির উপর একটি অপূর্ব মন্দির গঠন করাই হচ্ছে সম্রাট শশাঙ্কের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এমন জোরের সঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে একথা লেখা হয়েছে যে সম্রাট শশাঙ্ক ভুবনেশ্বরে একটি অপূর্ব শিব মন্দির নির্মাণ করান যে সে কথা অবিশ্বাস করার উপায় নেই। প্রশ্ন হচ্ছে সেটি তাহলে কোন মন্দির ?

ভুবনেশ্বরে এখনও যে প্রাচীন শিবমন্দিরগুলি খাড়া আছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে পাশাপাশি তিনটি মন্দির—ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর এবং শত্রুঘ্নেশ্বর। তাদের আদিমরূপ বোঝা দুষ্কর, কোন-ক্রমে টিকে আছে তারা। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলছেন, সে তিনটি মন্দিরের গঠনকাল ৫৭৫ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সম্রাট শশাঙ্কের শাসন-কালের কিছু পূর্বে। ফলে এ তিনটি মন্দির নয়। পরবর্তী মন্দির-গুচ্ছ হচ্ছে পরশুরামেশ্বর এবং তার সময়কালীন কয়েকটি মন্দির। গঠনসৌকর্যে পরশুরামেশ্বর একটি অপূর্ব মন্দির এবং এর সময়কাল ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ ; কিন্তু নানান্ কারণে এটিই শশাঙ্কদেবের মন্দির বলে মনে করতে পারছি না। প্রথমতঃ সমস্ত পুরাণেই দেখছি বলা হয়েছে শশাঙ্কদেবের প্রতিষ্ঠিত মূর্তি ত্রিভুবনেশ্বর ; দ্বিতীয়তঃ একাম্র-পুরাণে মহাদেব বলছেন যে শশাঙ্কদেব শিবলিঙ্গ তৈরী করাননি। একটি আম্রবৃক্ষের পাদমূলে তাঁর 'স্বয়ম্ভু-মূর্তির' উপর শশাঙ্কদেব 'ত্রিভুনেশ্বরের' মন্দিরটি গঠন করেন। এর একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত হতে পারে যে, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মূর্তির উপরেই গৌড়-সম্রাট শশাঙ্ক একটি মন্দির নির্মাণ করান। লিঙ্গরাজ স্বয়ম্ভু-মূর্তি, অনাদিকাল থেকেই সেখানে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত—কাশীর কেদারেশ্বরের মত অথবা কেদারনাথ তীর্থের লিঙ্গের মত।

এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে পুরাতত্ত্ববিদদের মতে লিঙ্গরাজ মন্দিরের গঠনকাল অনেক পরবর্তী যুগের—শশাঙ্ক-দেবের অন্তত চারশ বছর পরে। কিন্তু আমরা কি মনে করতে পারি

না যে, শশাঙ্কদেবের মূল মন্দির ভগ্নদশায় উপনীত হওয়ায় পরবর্তী কলিঙ্গরাজ সেটির পরিবর্তে একই স্থানে এই দ্বিতীয় মন্দির গঠন করেন? একই বিগ্রহের উপর একাধিক মন্দির নির্মাণের অসংখ্য উদাহরণ আছে।

পুরাণমতে গৌড়েশ্বর ভুবনেশ্বরে শিবপূজার ভগীরথ বলে বর্ণিত হলেও আমরা দেখেছি যে তাঁর সময়কালের বহু পূর্ব হতেই ভুবনেশ্বরে শিবমন্দিরের নির্মাণকার্য চলেছে। বস্তুতঃপক্ষে কলিঙ্গ রাজ্যে শৈব উপাসনার ভগীরথ শশাঙ্কদেব নন—লাকুলীশ। তিনি সম্ভবতঃ প্রথম শতাব্দীর ধর্ম প্রচারক। পাশুপত ধর্মের প্রবক্তা তিনি। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সংঘাত, জৈন ধর্মের সঙ্গেও। পাশুপততন্ত্রে, একাম্র-পুরাণে এবং কপিল-সংহিতায় তাঁর কীর্তি কাহিনী বর্ণিত! লাকুলীশের অষ্টাদশ প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন—নকুলীশ, কৌশিক, গার্গ্য, মৈত্রেয়, ঈশাণ ইত্যাদি। কলিঙ্গ থেকে জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বিতাড়নে এবং পাশুপত-শৈব উপাসনার প্রবর্তনে লাকুলীশের অবদান অসামান্য। ক্রমে লাকুলীশের উপর দেবত্ব আরোপিত হল। তাঁকে চতুর্ভুজ রূপেও কল্পনা করলেন মন্দির ভাস্করের দল। সবচেয়ে মজার কথা—যে বুদ্ধদেবকে বিতাড়িত করে তিনি শৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন উত্তরকালের কলিঙ্গ-ভাস্করের দল তাঁকে সেই ধ্যানীবুদ্ধের অতি পরিচিত মূর্তিতে কল্পনা করল। পদ্মাসনে-বসা লাকুলীশের মূর্তির সঙ্গে বুদ্ধদেবের ধর্মচক্রপ্রবর্তণ-মুদ্রায় বসা মূর্তির পার্থক্য অতি সামান্য। শতকরা নিরানব্বই জন দর্শক লাকুলীশের ঐ মূর্তিকে বুদ্ধমূর্তি বলে ধরে নেবেন।

শৈবদের সঙ্গে বৌদ্ধদের যে দীর্ঘদিন সংঘাত চলেছিল তার নানান্ পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভাস্করেশ্বরের লিঙ্গের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি;—বৈতাল মন্দিরের যূপ-শৈলে একটি বুদ্ধমূর্তির ব্যঞ্জনা পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন। সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি নেই—আছে একমাত্র যূপ-শৈলে, বলি-স্থানে। একাম্র-পুরাণের

পঞ্চবিংশতি থেকে দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত দেবদানব যুদ্ধের বিবরণটিও লক্ষ্য করার মত। পুরাণকার বলছেন, গন্ধাবতী নদী (ভুবনেশ্বরে অবস্থিত নদীটির নাম গাঙ্গোয়া) তীরে দেবতারা শিব-পূজার নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করার সময় দৈত্য হিরণ্যাক্ষ সসৈন্য এসে যজ্ঞনাশ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র পরাভূত হয়ে পালিয়ে যান এবং মহাদেবের শরণাপন্ন হন। অতঃপর মহাদেব যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যাক্ষকে সসৈন্য পরাজিত করেন—দৈত্য-সেনা-পতি কালনেমী নিহত হন এবং হিরণ্যাক্ষ সসৈন্য পার্বত্যগুহায় আশ্রয় নিয়ে তপস্যার মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

এ নিছকই গল্প কথা; কিন্তু গন্ধাবতী নদীর অবস্থিতি -পার্বত্য-গুহায় তপস্যার ইঙ্গিত লক্ষণীয়। আরও বলি, খণ্ডগিরির অনতিদূরে গাঙ্গোয়া নদীর ধারে পাশাপাশি দুটি প্রাচীন গ্রাম আছে আজও। তাদের নাম যগমারা এবং যগসারা।

মোট কথা ভুবনেশ্বরে শৈব মন্দিরের প্রবর্তন অন্তত ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছিল। কেমন করে শিব পূজার দেশে বিষ্ণু এলেন সে কথা আপাতত থাক। ইতিহাস আলোচনাও শশাঙ্কের কলিঙ্গ বিজয় পর্যন্ত বলে আপাতত আমরা থামব। এবার বরং ভুবনেশ্বরে প্রথম যুগের যে শিব মন্দিরগুলি আজও টিকে আছে সেগুলি দেখতে শুরু করা যাক।

আগেই বলেছি, ভুবনেশ্বরের প্রাচীনতম মন্দির যা আজও টিকে আছে তা হল ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর এবং শত্রুঘ্নেশ্বর। দর্শনীয় সেখানে যা কিছু আছে তা পুরাতত্ত্ববিদদের জন্য। আমরা বরং আমাদের মন্দির দর্শন শুরু করব পরশুরামেশ্বর মন্দির থেকে।

পরশুরামেশ্বর মন্দির: আকারে মন্দিরটি খুবই ছোট, কিন্তু কলিঙ্গ স্থাপত্যের ইতিহাসে এটিই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—কারণ এই পরশুরামেশ্বর মন্দিরের ভিতরেই আমাদের সন্ধান করতে হবে সেই বীজটি যেটি উত্তরকালে লিঙ্গরাজ-কোনার্কের অপূর্ব

মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। মন্দিরের দুটি অংশ—একটি মূলমন্দির, যার ভিতরে গর্ভগৃহে আছেন বিগ্রহ, যার চূড়ায় মন্দির শিখর ; এবং দ্বিতীয়টি তার সামনে লম্বাটে একটি আটচালা। সামান্য খাঁজকাটা

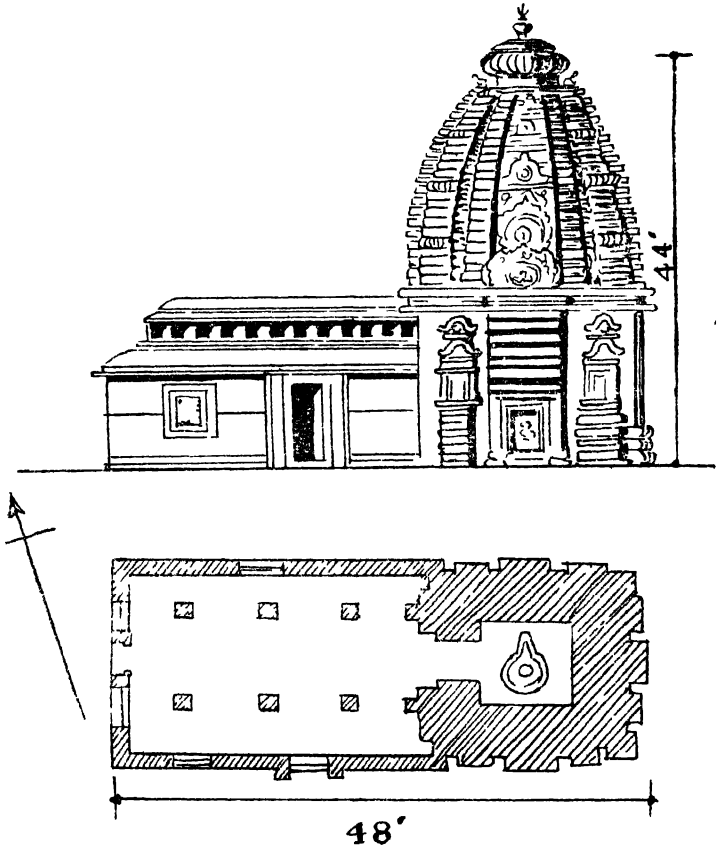

চিত্র—৭ ॥ পরশুরামেশ্বরের ভূমি নকশা ও সম্মুখ দৃশ্য

থাকলেও মূল মন্দিরটি মোটামুটি চৌকা—বর্গক্ষেত্র। সামনের আটচালা অংশ লম্বাটে—আয়তক্ষেত্র ; তার ভিতরে দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভ। ঐ স্তম্ভের উপরের ছাদটি চালচালা এবং দেওয়ালের উপরে চারচালা। উড়িষ্যা-স্থাপত্য অনুযায়ী এই লম্বাটে ঘরটির

নাম 'জগমোহন'; কিন্তু সে প্রসঙ্গে এখনও আসিনি আমরা—ঐ সম্মুখস্থ ও সংলগ্ন অংশটিকে বাংলায় আটচালা বলছি বলে আপত্তি করার কিছু নেই, কারণ তখনও এই গঠনে বৃহত্তর বাংলার ছাপই ছিল।[১] দুটি অংশের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য মাত্র ৪৮ ফুট, মন্দির-শিখরের উচ্চতাও মাত্র ৪৪ ফুট। বেশ বোঝা যায়, আটচালা অংশটি মূল-মন্দিরের পরবর্তী সংযোজন, প্রায় একশ বছর পরে তৈরী।

(চিত্র—৭)-এ পরশুরামেশ্বর মন্দিরের ভূমি নক্শা (প্ল্যান) এবং (চিত্র—৮)-এ দক্ষিণ পশ্চিম থেকে দেখা একটি স্কেচ-চিত্র দেওয়া গেল।

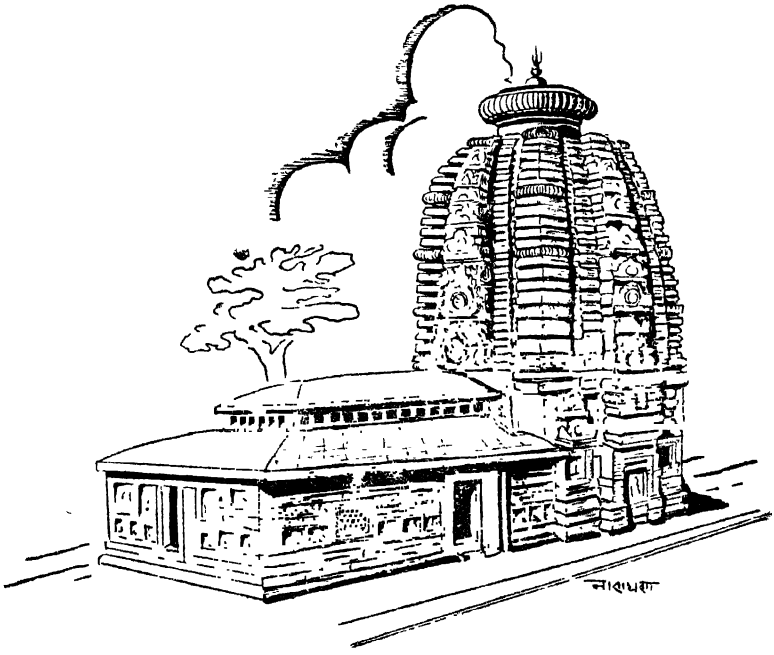

চিত্র—৮ ॥ পরশুরামেশ্বর—দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে

মূল-মন্দিরের তিন দিকের কুলুঙ্গিতে তিনজন পার্শ্বদেবতার মূর্তি ছিল

১) 'প্রাচীন বাঙলার রেখ দেউল বা শিখর দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই উহাদের সহিত ভুবনেশ্বরের শক্রঘ্নেশ্বর, পরশুরাম, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায় এবং কালের দিক দিয়া যে ইহারা সমকালীন

—দক্ষিণে গণেশ, পূর্বে কার্ত্তিকেয় এখনও আছেন; উত্তর দিকে ছিলেন মহিষমর্দিনী, তিনি অপসৃত। চতুর্ভুজ গণেশ বসে আছেন সিংহাসনে—তাঁর শুণ্ডটি হস্তস্থিত লড্ডুক-থালিকার দিকে। উপরে একটি চৈত্যগবাক্ষ, তাতে নটরাজ মূর্তি। পূর্বদিকের কুলুঙ্গিতে দ্বিভুজ কার্ত্তিকেয়, পদতলে ময়ূর। কার্ত্তিকেয়র দক্ষিণহস্তে মাতুলুঙ্গ এবং বামে শক্তি। কার্ত্তিকেয়র উপরে লিন্টেলে হর-পার্বতীর বিবাহদৃশ্যটি মনোরম। মাঝখানে পদ্মাসনে বসে আছেন অগ্নি—তাঁর বামে হর এবং পার্বতী, পদতলে গণেশ। অগ্নির দক্ষিণে স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মা পূর্ণঘটে জল ঢালছেন। সর্বসমেত তেরটি মূর্তি খোদাই করা হয়েছে একই পাথর কেটে। তার উপর চৈত্যগবাক্ষে লাকুলীশের মূর্তি—যা নাকি বুদ্ধমূর্তি বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। উত্তর দিকের কুলুঙ্গি থেকে বৃহত্তর মহিষমর্দিনীর মূর্তিটি অপসারিত হয়েছে; কিন্তু উপরে ছোট কুলুঙ্গিতে অপর একটি ক্ষুদ্র মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে।

চিত্র—৯ ॥ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি
পরশুরামেশ্বর

এবার সামনের আটচালা অংশের মূর্তিগুলি দেখা যাক। দক্ষিণ পূর্ব কোণ থেকে যদি আমরা জগমোহনটিকে প্রদক্ষিণ করি তবে পর পর যে মূর্তিগুলি দেখা যাবে তা এইভাবে সাজানো।

(ক) প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুর একটি দণ্ডায়মান আভঙ্গ মূর্তি। (চিত্র—৯)

তাহা বুঝা যায়···অনেক ক্ষেত্রে জগমোহনের পরিবর্তে সম্মুখদিকের দেয়ালে একটি অলিন্দের সংযোজন আছে।'—বাঙালীর ইতিহাস, ৮১৮ পৃষ্ঠা—ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়।

উপরের ডানহাত এবং মুণ্ডটি ভেঙ্গে গেছে। বামে[১] একটি নারী মূর্তি দক্ষিণে[১] একটি বামন। বিষ্ণু মূর্তি সমভঙ্গ করে তৈরী করার শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে।[২] এ-ক্ষেত্রে সেই শাস্ত্র নির্দেশ মেনে চলা তো হয়ই নি বরং প্রতিটি নির্দেশের বিপরীতে কাজ করা হয়েছে! এর পিছনে একটা ব্যঞ্জনা আছে, যা তলিয়ে দেখলে তবেই রসাস্বাদন সম্ভব। কিন্তু তার পূর্বে অতি সংক্ষেপে শিল্প শাস্ত্রের কিছু প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন।

শিল্পাচার্য বলছেন,"ভারতীয় মূর্তিগুলিতে সচরাচর চারি প্রকারের ভঙ্গি বা ভঙ্গ দৃষ্ট হয়। যথা :—সমভঙ্গ বা সমপাদ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ।"[৩]

সমভঙ্গে মূর্তিটি দুই পায়ের উপর সমভাবে ভর দিয়ে ডাইনে,

১) মূর্তি আলোচনাকালে বাম বা দক্ষিণ বলতে মূর্তির বাম বা দক্ষিণ বোঝাবে, দর্শকের নয়।

২) "বিষ্ণু সূর্য প্রভৃতি যে-সকল মূর্তি দুই পার্শ্ব-দেবতা বা শক্তির সহিত গঠন করা হয়, তাহাতে···মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা সমভঙ্গ ঠামে কোন এক পার্শ্বদেবতার দিকে কিঞ্চিৎ-মাত্র না হেলিয়া একেবারে সোজাভাবে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহেন আর তাঁহার দুইপার্শ্বে যে দুই দেবতা বা শক্তি—যিনি দক্ষিণে আছেন তিনি, যিনি বামে আছেন তিনিও—ত্রিভঙ্গ ঠামে উভয়েই প্রধান দেবতার দিকে নিজের নিজের মাথা হেলাইয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকেন। ইহাতে দুই পার্শ্বমূর্তি দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ত্রিভঙ্গ ঠামে রচনা করিতে হয়। যথা :—শিল্পীর বামে ও প্রধান মূর্তির দক্ষিণ পার্শ্বে যিনি তাঁহার মস্তক শিল্পীর দক্ষিণ দিকে ও নিজের বাম দিকে এবং শিল্পীর দক্ষিণে ও প্রধান মূর্তির বামে যিনি তাঁহার মস্তক শিল্পীর বাম দিকে ও নিজের দক্ষিণ দিকে হেলিয়া রহে। দুই পার্শ্বদেবতা এই দুই বিপরীত ত্রিভঙ্গ ঠামে রচনা না করিলে সম্পূর্ণ মূর্তির সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং দুই পার্শ্বদেবতা প্রধান দেবতা হইতে বিপরীতমুখী হইয়া অবস্থান করেন।"—ভারতশিল্পে মূর্তি, অবনীন্দ্রনাথ। পৃঃ ২৮, ২৯।

৩) ভারতশিল্পে মূর্তি, অবনীন্দ্রনাথ।

বা বাঁয়ে কিছু মাত্র না হেলে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার দুই পাশে 'ভর' সমান হয়, যদিও হাতের মুদ্রা পৃথক হতে পারে (চিত্র—১০)। বুদ্ধ সূর্য এবং বিষ্ণু মূর্তি সমভঙ্গে তৈরী করা বিধেয়।

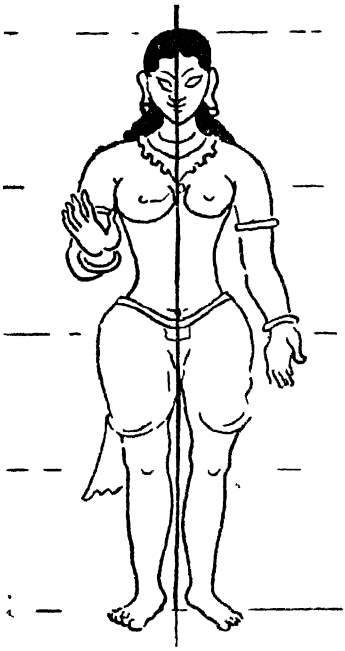

চিত্র—১০ ॥ সমভঙ্গ মূর্তি

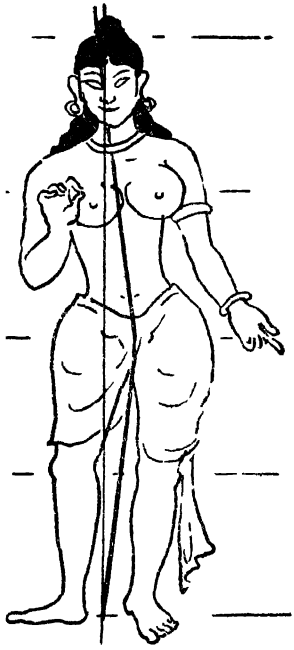

চিত্র—১১ ॥ আভঙ্গ মূর্তি

আভঙ্গ ঠামে মূর্তির কটিদেশ কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা থেকে এক অংশ (তালের চতুর্থাংশ, অর্থাৎ মূর্তি যদি 'দশতাল' হয় তাহলে এক অংশ = সম্পূর্ণ উচ্চতার ১/৪০) সরে থাকে। বোধিসত্ত্ব অথবা অধিকাংশ সাধু পুরুষদের মূর্তি আভঙ্গ ঠামে তৈরী করা হয় (চিত্র—১১)।

ত্রিভঙ্গ ঠামে মূর্তি তিনবার বাঁক খায়। মৃণালদণ্ডের মত বা অগ্নিশিখার মত পদতল থেকে কটিদেশ পর্যন্ত একদিকে, কটি থেকে

কণ্ঠ পর্যন্ত তার বিপরীত দিকে এবং কণ্ঠ থেকে শিরোদেশ পর্যন্ত পুনরায় অন্যদিকে বাঁক নেয় (চিত্র-১২)। যেহেতু যুগল-মূর্তিতে স্ত্রী থাকে পুরুষ মূর্তির বামে তাই মিলন বা সখ্যভাব প্রকাশ করতে স্ত্রী মূর্তির গ্রীবা এমনভাবে বাঁকান হয় যাতে স্ত্রী-মস্তক দক্ষিণে (শিল্পীর বামে) এবং পুরুষ মূর্তির মস্তক বামে (অর্থাৎ শিল্পীর

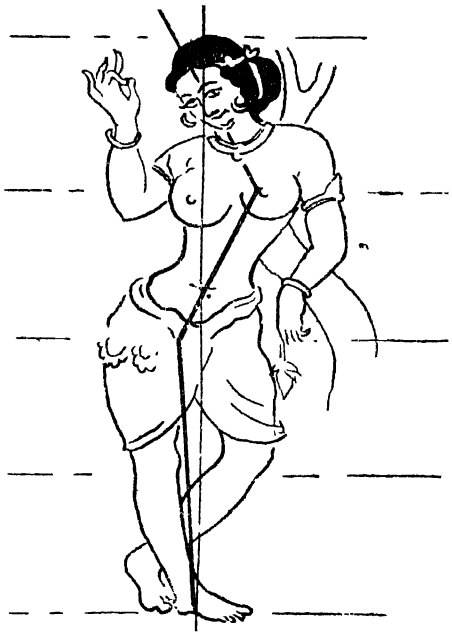

চিত্র—১২ ॥ ত্রিভঙ্গ মূর্তি

দক্ষিণে) হেলে থাকে। অপরপক্ষে অভিমান বা খেদ বোঝাতে অর্থাৎ কলহান্তরিতা, খণ্ডিতা প্রভৃতি নায়িকার ক্ষেত্রে স্ত্রী মস্তক নিজের বামে অর্থাৎ পুরুষ মূর্তির বিপরীতে বাঁক নেয়।

অতিভঙ্গ ঠামে "ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিই অধিকতর বঙ্কিমতা দিয়া রচিত হয় এবং ঝড়ে যেরূপ গাছ তেমনি মূর্তির কটিদেশ হইতে উর্ধ্বদেহ কিম্বা কটি হইতে পদতল পর্যন্ত অংশ বামে দক্ষিণে পশ্চাতে অথবা

সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। অতিভঙ্গ ঠাম শিবতাণ্ডব দেবাসুরযুদ্ধ প্রভৃতি মূর্তিতেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মূর্তিতে গতিবেগ, নর্তন শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদি দেখাইতে হইলে অতিভঙ্গ ঠামে গঠন করা বিধেয়।"[১] (উদাহরণ—বিখ্যাত নটরাজ মূর্তি এবং চিত্র—১৪)

এবার আমরা আমাদের ঐ বিষ্ণু মূর্তিটির (চিত্র—৯) প্রসঙ্গে ফিরে আসি। শাস্ত্র নির্দেশানুসারে যদিও বিষ্ণু মূর্তি সমভঙ্গ হবার কথা তবু শিল্পী এটিকে আভঙ্গ রূপে কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, পার্শ্বদেবদেবীর মস্তক মূর্তির দিকে বাঁক নেয়নি, নিয়েছে বিপরীত দিকে। কিন্তু শিল্পাচার্যের কথামত কই আমরা তো উপলব্ধি করছি না "দুই পার্শ্ব-দেবতা এই দুই বিপরীত ত্রিভঙ্গ ঠামে রচনা না করিলে সম্পূর্ণ মূর্তির সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে।" তার কারণ আছে। শিল্পাচার্য নিজেই তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বলেছেন, "ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কেহ যেমন ধার্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া বা তাহার গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রহিয়া কেহ শিল্পী হয় না। সে কী বিষম ভ্রান্তি যে মনে করে মাপিয়া-জুখিয়া শাস্ত্র সম্মত মূর্তি প্রস্তুত করিলেই শিল্প-জগতের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শিল্পলোকের আনন্দ বাজারে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।"[২] শাস্ত্রকার স্পষ্টই বলে গেছেন সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্, যার ব্যাখ্যায় শিল্পাচার্য বলেছেন—"যখন পূজার জন্য প্রতিমা গঠন করিবে কেবল তখন শাস্ত্রের মত মানিয়া চলিবে, অন্যপ্রকার মূর্তি গঠনকালে তোমার যথা অভিরুচি গঠন করিতে পার।"[৩]

তা তো বুঝলাম। তবুও যে একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। শিল্পীর এ ধরণের অভিরুচি হল কেন? শাস্ত্রনির্দেশের বিপরীত পথে তিনি কেন গেলেন? আসুন বিচার করে দেখি।

---

১) ভারতশিল্পে মূর্তি, অবনীন্দ্রনাথ, পৃ : ২৯

২) ঐ পৃ : ২

৩) ঐ পৃ : ৩

প্রথমতঃ পার্শ্বদেবতা দুটি আকারে সমান নয়—স্ত্রী মূর্তিটি দীর্ঘকায়, পুরুষ খর্বকায়। কিন্তু পুরুষ মূর্তিটি তেমনি কিঞ্চিৎ স্থূলকায় হওয়ায় পাল্লা দুদিকেই সমান আছে। পার্শ্বদেবতা দুটি যদি সমান দৈর্ঘ্যের এবং সমান আকারের হত তাহলেই সমভঙ্গের সমতাছন্দ (Symmetry) ঠিকভাবে ফুটে উঠত। যেহেতু তা সম্ভবপর নয় তাই শিল্পী সমভঙ্গের পরিবর্তে মূল মূর্তিটিতে আভঙ্গ ঠাম আরোপ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ দুই পার্শ্বদেবতার ভঙ্গিমায় যেন সেই ব্যঞ্জনাটি ফুটে উঠেছে যেটি আমরা দেখতে পাই কুতুব-মিনার দর্শনার্থীর ভঙ্গিতে। কুতুব-মিনারের নীচে দাঁড়িয়ে তার উচ্চতা অনুধাবন করতে হলে আমাদের মস্তক কুতবের বিপরীত দিকেই বাঁকাতে হয়। এখানেও দুই পার্শ্বদেবতা যেন মধ্যস্থিত বিষ্ণু মূর্তির মহিমা অনুধাবন করতে

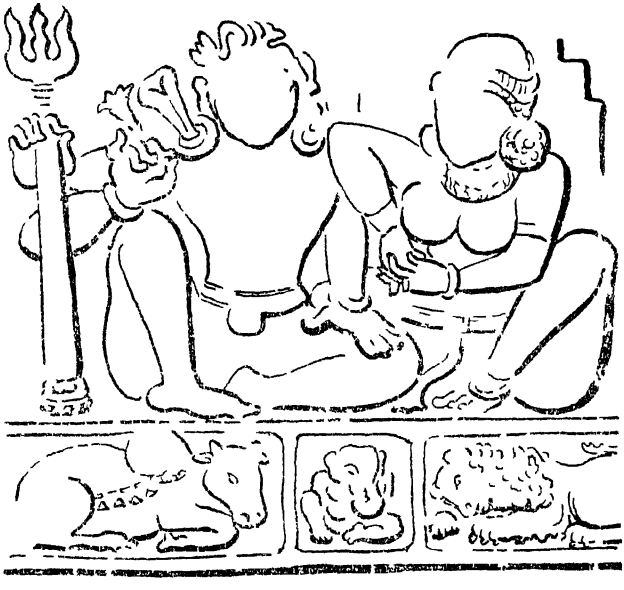

চিত্র—১৩ ॥ হরপার্বতী (পরশুরামেশ্বর)

ঘাড় বেঁকিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে চাইছে। এইভাব ফুটে উঠেছে বলেই সামগ্রিকভাবে মূর্তিটি অপূর্ব রূপ নিয়েছে। সৌন্দর্যের হানি তো হয়ই নি বরং সার্থক হয়ে উঠেছে ভাবব্যঞ্জনা!

(খ) বিষ্ণু মূর্তির দক্ষিণে বিশ্রম্ভালাপরত হরপার্বতীর একটি মূর্তি। শিবের হাতে ত্রিশূল, দক্ষিণ কর্ণমূলে সর্পকুণ্ডল ও ধুতুরা। প্রস্তরাসনের একদিকে বৃষ অপর দিকে সিংহ, মাঝখানে গণেশ। লক্ষণীয় শিবের মাথা পার্বতীর বিপরীতে বাঁকান। শিল্পাচার্যের সূত্র অনুযায়ী ধরে নিতে হবে শিবের মনে কিছু বিরাগ জন্মেছে। আমরা কল্পনা করতে পারি, পটভূমিকা আমাদের বাঙলা দেশের আগমনী গানের—অর্থাৎ মা দুর্গা বুঝি বাপের বাড়ি যাবার বায়না নিয়ে দরবার করতে এসেছেন ভোলানাথের কাছে; আর তাই মহাদেবের মেজাজ খারাপ! এবং সেইজন্যই বোধকরি দুর্গার সোহাগ উথলে উঠেছে—একটি হাত তিনি রেখেছেন আশুতোষের কাঁধে! দুর্গার দুটি হাতের কুণ্ঠাজড়িত আঙ্গুল কিভাবে জড়াজড়ি করে আছে তাও লক্ষণীয়। মায়ের অঙ্গুলিতে 'বাপের-বাড়ি-যাবার-বায়না'-র একটি দুর্লভ ব্যঞ্জনা! (চিত্র—১৩)

(গ) পরের প্যানেলটিতে অর্ধনারীশ্বরের একটি দুষ্প্রাপ্য ভঙ্গিমা। অষ্টভুজ এই অর্ধনারীশ্বর নৃত্যরত—অতিভঙ্গ মূর্ছনায়। এই ধরণের অদ্ভুত ভঙ্গিমায় অষ্টভুজা অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আর কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। (চিত্র—১৪)

তিনটি মূর্তির পরে প্রবেশদ্বারের ছেদ। দ্বার পার হয়ে আবার তিনটি প্যানেলে তিনটি মূর্তি।

(ঘ) প্রথমেই দেবরাজ ইন্দ্রের একটি সমভঙ্গ উপবিষ্ট মূর্তি—ক্রোড়ের উপর বজ্রটিকে দুই হাতে ধরে আছেন। ঐরাবৎ কিন্তু অনুপস্থিত। ইন্দ্র হচ্ছেন অষ্টদিকপালের অন্যতম—সুতরাং এরপর অপর সাতটি দিক্‌পতিকে আমরা দেখবার আশা করতে পারি।

(ঙ) ইন্দ্রের পরে মহিষবাহন যম, দণ্ডধারী—দক্ষিণ দিকপতি।

(চ) যমের পরে আসন পেয়েছেন বরুণ, তাঁর বাম হস্তে পাশ।

এরপর জাফরিকাটা একটি গবাক্ষ, সেটি অতিক্রম করলে আবার তিনটি মূর্তি পাওয়া যাবে। (ছ) বায়ু, (জ) কুবের এবং (ঝ) তৃতীয় মূর্তিটি অপসৃত—সম্ভবতঃ ছিল অগ্নির। ঈশান ও নৈর্ঋতকে আমি খুঁজে পাইনি।

চিত্র—১৪ ॥ অর্ধনারীশ্বর অতিভঙ্গ মূর্তি (পরশুরামেশ্বর)

এই প্রসঙ্গে বলে "খি পরশুরামের মন্দিরে যেভাবে অষ্টদিক-পালের মূর্তি পাশাপাশি বসানো হয়েছে কলিঙ্গ মন্দির-স্থপতিতে পরবর্তীযুগে সেভাবে তাঁদের বসান বে-আইনি হয়েছিল। অষ্ট-দিকপালের আটটি মূর্তি অনেক মন্দিরেই আছে—আছে রাজা-রানীতে, লিঙ্গরাজ কিম্বা কোনার্কের ভোগ মণ্ডপে ; কিন্তু তাঁরা আট জন মন্দিরের আটটি নির্দিষ্ট কোণায় স্থান পেয়েছেন। উত্তর, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম কোণে যথাক্রমে কুবের, ঈশাণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ ও বায়ুকে সেখানে খুঁজে পাবেন। শুধু তাই নয়, অষ্টদিকপতির আটটি শক্তি-মূর্তিরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল পরবর্তী যুগে।

যেহেতু মন্দিরের চারপাশের দৃশ্য ছবিতে এঁকে দেখান যায়নি তাই জগমোহনের পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বের মূর্তিগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে প্রধান মূর্তিগুলির নামোল্লেখ মাত্র করা গেল—ঈশান, নৈর্ঋত, চামুণ্ডা, বরাহী, ইন্দ্রানী, শিবানী, ব্রহ্মানী, কুমারী ইত্যাদি।

জগমোহনের পশ্চিমপ্রান্তে, মূল প্রবেশদ্বারের উপরে গজলক্ষ্মীর মূর্তি। গজলক্ষ্মীর মূর্তির পরিকল্পনা অতি প্রাচীন। সাঁচি ভারহুতের প্রাচীনতম অংশে বৌদ্ধ শিল্পীরা এ মূর্তি খোদাই করেছেন। একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে যে—যে যুগে বৌদ্ধ শিল্পীরা গজলক্ষ্মীর মূর্তি প্রথম খোদাই করেছিলেন তখনও মহাযান ধর্মমত প্রসার লাভ করেনি—বুদ্ধ মূর্তি তখনও তৈরী হয়নি, বৌদ্ধ দেবদেবী—অবলোকিতেশ্বর, তারা, জম্ভল, মঞ্জুশ্রী ইত্যাদি কোনও মূর্তির পরিকল্পনা তখনও হয়নি। ফলে গজলক্ষ্মীর পরিকল্পনা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে বৈকি। এ মূর্তি বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের দেব-দেউলে সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। লক্ষ্মী পদ্মাসনে বসে আছেন এবং দু-দিক থেকে দুটি হস্তী শুঁড়ে করে জল ঢালছে। গজলক্ষ্মী মূর্তির দুদিকে দুটি লম্বাটে প্যানেল। দক্ষিণে (গজলক্ষ্মীর দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তর দিকে) কুনকী হাতীর সাহায্যে জংলী হাতী ধরার একটি দৃশ্য, বামে শিবপূজার একটি প্যানেল। নীচে বাদ্যযন্ত্র সহকারে কয়েকটি মূর্তি। এই নৃতরত মূর্তিগুলির সাবলিল ভঙ্গিমা, তাদের পোশাক, শিরোভূষণ, অলঙ্কার খুঁটিয়ে দেখবার জিনিস। উচ্চতা অনুপাতে মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ কিছু স্থূলকায়, কিন্তু ভারতীয় মূর্তির যে ব্যঞ্জনা তার আদিমরূপ এখানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বহু শতাব্দীর অবক্ষয়ে নৃত্যরতা বালি পাথরের মূর্তিগুলির নাক-মুখ-চোখ ক্ষয়ে গেছে, তবু বহিরঙ্গের কিছুটা আভাস (চিত্র—১৫) তে এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

এ মন্দির সম্বন্ধে আর একটি কথা বলব। জগমোহন থেকে মূল

মন্দিরে প্রবেশ পথের যে দ্বার তার উপর আটটি গ্রহের (নয়টি নয়, কেতু অনুপস্থিত) মূর্তি খোদাই করা। সেখানে একটি শিলালেখ আছে যা থেকে মন্দিরটির নির্মাণকাল আন্দাজ করা হয়েছে হরফের

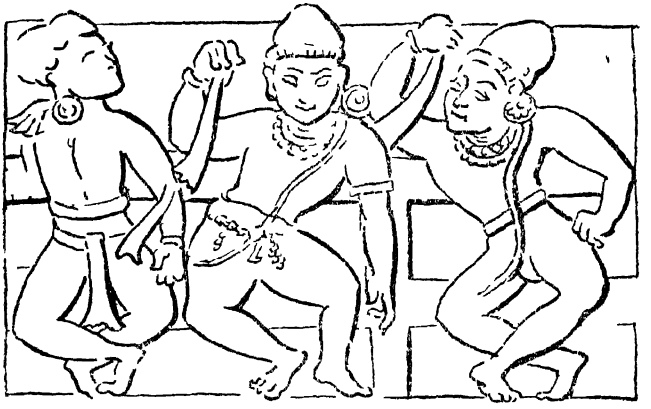

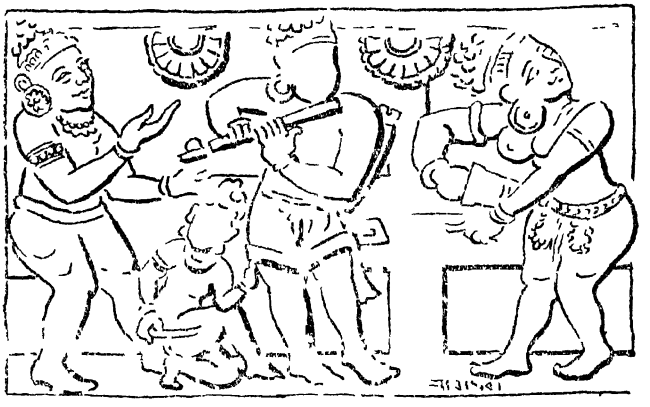

চিত্র—১৫ ॥ গীতবাদ্যরত মূর্তি—পরশুরামেশ্বর প্রবেশদ্বার

হের ফের দেখে। সেই শিলালেখে মন্দিরটির নাম পাওয়া গেছে পারাসেশ্বর। প্রথম যুগের পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন ওটা বর্ণাশুদ্ধি —আসলে মন্দিরটির নাম পরশুরামেশ্বর। পরে অবশ্য অনেকে মনে

করেন নামটি সম্ভবতঃ ছিল 'পরাসরেশ্বর' ; কারণ 'পরাশর' ছিলেন অন্যতম পাশুপত-আচার্য, লাকুলীশের শিষ্য। কিন্তু মন্দিরের নামটি পরশুরামেশ্বরই রয়ে গেছে।

প্রথম যুগের তিনটি মন্দিরের কথা বলেছি, পরশুরামেশ্বরের

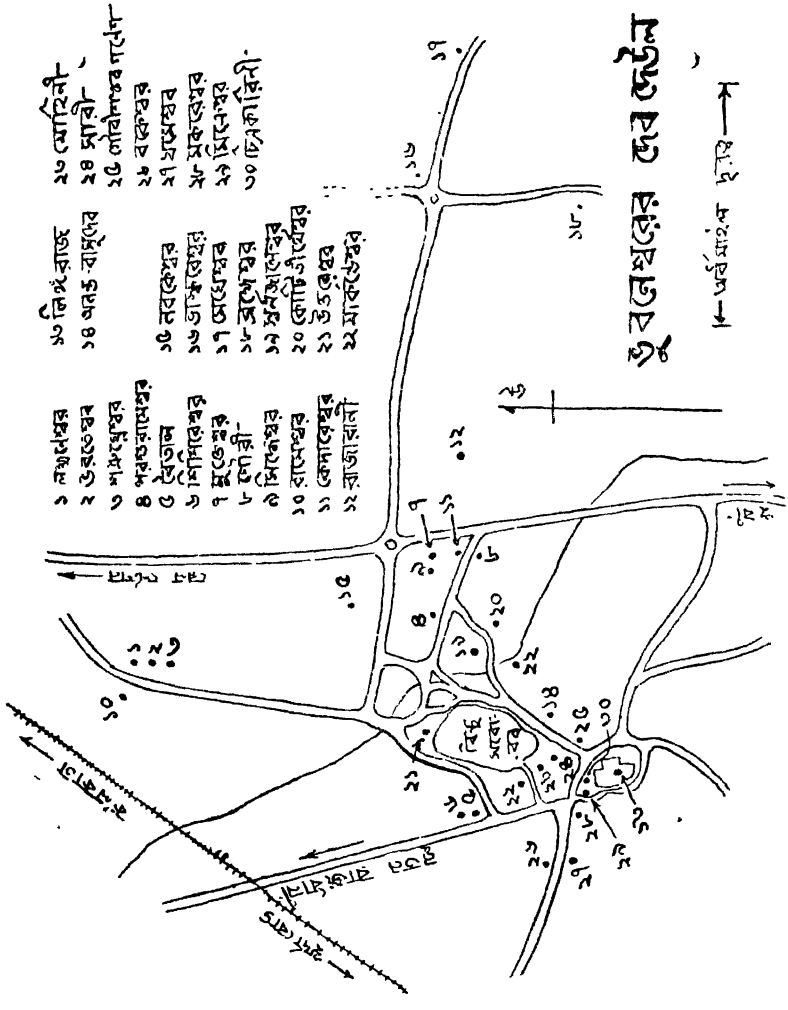

চিত্র—১৬ ॥ ভুবনেশ্বরের দেব দেউল

সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা গেল। তারপরে সম্ভবতঃ ঐ শতাব্দীতেই আরও কয়েকটি মন্দির ভুবনেশ্বরে নির্মিত হয়েছিল। যেমন, স্বর্ণজালেশ্বর, উত্তরেশ্বর, পশ্চিমেশ্বর, মোহিনী, গৌরী-শঙ্কর-গণেশ ইত্যাদি। এগুলি অধিকাংশই আকারে ছোট এবং ভগ্নপ্রায়। আমরা এগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছি না—যাঁদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে তাঁরা এ মন্দিরগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। প্রাচীন মন্দিরগুলির অবস্থান সম্বন্ধে স্থানীয় লোক এবং রিক্সা-ওয়ালারা প্রায়ই খবর রাখে না; তাই (চিত্র—১৬)-তে ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির অবস্থান দেখান হয়েছে। আমরা এরপর বিন্দু-সরোবরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত বৈতাল দেউলটি দেখতে যাব।

কিন্তু তার পূর্বে কলিঙ্গের মন্দির-স্থাপত্য সম্বন্ধে আমাদেব মোটামুটিভাবে জেনে নিতে হবে। বিভিন্ন অংশের নামগুলি যদি জানা থাকে তাহলে মন্দিরে অবস্থিত কোন শিল্পনির্দশনের অবস্থিতি অতি সহজেই বোঝান যাবে। পৃথিবীকে যেমন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে নেওয়ায় কোন শহরের অবস্থিতি সহজে বোঝান যায়, এ ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হবে। কলিঙ্গ শিল্পীর দল ভূমি নক্শা (প্ল্যান) এবং সম্মুখ দৃশ্যকে (এলিভেসান) এমন সুন্দর-ভাবে ভাগ করেছেন যে ছবি না এঁকেও কোন শিল্পবস্তুর অবস্থিতি জানান যায়।

নাগর-স্থাপত্যেব যে কয়টি ধারা উত্তর-খণ্ডে প্রসিদ্ধিলাভ করে তার আদিগুরু নাকি স্বয়ং বিশ্বকর্মা। সেই নাগর-স্থাপত্যের যে বিশেষ রূপটি কলিঙ্গ রাজ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তার আদিগুরু কে তা আমরা জানি না। আর পাঁচটা ভারতীয় বিদ্যার মত এটিও ছিল গুরুমুখী বিদ্যা। অর্থাৎ এক একটি অঞ্চলে এক একটা 'ঘরাণা' তৈরী হয়েছিল। পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনার্কের এই ত্রিকোণ-ভূখণ্ডে প্রায় সহস্রাব্দিকাল যে মহান শিল্পীর দল মহাকালের বুকে শাশ্বত চিহ্ন রেখে গেছেন তারও প্রথম উদ্গাতার পরিচয় আমরা পাইনি।

ইতিহাস বলতে আমরা বুঝি রাজবংশের কীর্তি ও অপকীর্তির তালিকা। তাই কেশরীবংশ আর গঙ্গাবংশের দীর্ঘ তালিকাই শুধু দেখতে পাচ্ছি পুরীর তালপাতার পুঁথিতে—ঐ মহান শিল্পীদলের কারও নাম সেখানে নেই। সুপণ্ডিত নির্মলকুমার বসু অনেক অনুসন্ধান করে খান ছয়েক হাতে লেখা পুঁথির সন্ধান পেয়েছিলেন—কলিঙ্গের স্থাপত্য-শিল্প বিষয়ে। তার ভিতর 'ভুবন-প্রদীপ'ই হচ্ছে প্রধান। এই ছয়খানি পুঁথি থেকে তিনি সার সঙ্কলন করে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।[১] তাঁর পূর্ববর্তী বাঙ্গালী বাস্তুকার শ্রীমনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় উড়িষ্যার স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে যে সব সূত্র লিপিবদ্ধ করে গেছেন[২] তার সঙ্গে শ্রীবসুর নির্দেশে স্থানে স্থানে প্রভেদ আছে। আবার রাজেন্দ্রলালের[৩] সূত্রগুলির সঙ্গে এই দুই গ্রন্থের নির্দেশে যথেষ্ট পার্থক্য। তবু ঐ সব প্রামাণ্য গ্রন্থের সার নিয়ে এবং মোটামুটি 'ভুবন-প্রদীপ' অবলম্বন করে আমরা উড়িষ্যা স্থাপত্যের মূলসূত্রগুলির সন্ধান করতে পারি :

মন্দিরের মূল প্রাণ কেন্দ্রটি হচ্ছে গর্ভগৃহ অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র কক্ষে মূল দেববিগ্রহটি রক্ষিত হয়েছে। এইটিই প্রাণ কেন্দ্র ; কিন্তু পূজা-অর্চনার নানান্ অনুষ্ঠানের জন্য শুধুমাত্র ঐ গর্ভগৃহটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে চলে না। ফলে তৈরী করতে হল আরও কয়েকটি সংলগ্ন অংশ—জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। এ যেন অনেকটা ভদ্রাসন করার মত। লা করবুশিয়ে বলেন, The house is a machine for living in (বাড়ি হচ্ছে বাস-করার একটি যন্ত্র) মাথা গুঁজবার ঠাঁই চাই বলেই বাড়ি তৈরী করি—কিন্তু বসত-বাড়িতে শুধু শয়নকক্ষ থাকলেই তো চলবে না—এস-জন বস-জনের

১) Canons of Orissan Architecture, 1933—Prof. N. K. Bose.

২) Orissa and her Remains, 1910—Shri M. M. Ganguly.

৩) Antiquities of Orissa, 1875—Shri R. Mitra.

জন্য চাই বৈঠকখানা, রন্ধনের জন্য চাই পাকশালা, সকলে সমবেত হবার জন্য চাই প্রাঙ্গণ। গর্ভগৃহটি আকারে ছোট—ছোট করাই বিধি, তাই ভক্তদের এবং তীর্থ যাত্রীদের দর্শন করার সুযোগ দিতে মূলমন্দিরের সম্মুখে তৈরী করতে হল জগমোহন। তারপর ভক্তরা যাতে সমবেত হয়ে সম্মিলিত সঙ্গীত বা নৃত্য পরিবেশন করে দেবতার তুষ্টি সাধন করতে পারেন তাই জগমোহনের সামনে তৈরী করতে হল নাটমন্দির। ভোগ-রাগের জন্য তার সম্মুখে ভোগমণ্ডপ। এই চারটি অংশকে একই সরল রেখায় তৈরী করার আইন হল। এই চারটি ছাড়া হয়তো আরও কিছু প্রয়োজন থেকে যায়—যেখানে ভোগ পাক করা হবে, যেখান থেকে পানীয় জল আনা যাবে, যেখানে প্রধান পুরোহিত থাকবেন। কিন্তু সেগুলি মন্দিরের পরিকল্পনার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা নয়, সুবিধামত স্থানে তৈরী করা হত। তাই প্রথম পর্যায়ের মন্দিরে, ভবতেশ্বরে যেখানে দেখতে পাই শুধুমাত্র গর্ভ গৃহটি ; দ্বিতীয় পর্যায়ে, পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সমসময়ে সেখানে দেখছি যুক্ত হয়েছে জগমোহন। আরও পরের যুগে,—অনন্তবাসুদেবে দেখছি সেখানে ঐ চারটি অংশই তৈরী করা হয়েছে।

গঠন বৈচিত্র্যের স্থাপত্য-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি উড়িষ্যার দেব-দেউল চার প্রকারের ; যথা : রেখ-দেউল, ভদ্র-দেউল (বা পীড় দেউল), কাখর-দেউল এবং গৌড়ীয় দেউল। এর ভিতর গৌড়ীয় দেউল নিঃসন্দেহে বাংলা দেশ থেকে আমদানি। উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যে গৌড়ের দান সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় দেউলের সংখ্যা উড়িষ্যাতে খুব কমই নজরে পড়েছে আমার। দুটিমাত্র উদাহরণ আমি দেখেছি – পুরীর মার্কণ্ডেয় সরোবরের পাশে একটি এবং উত্তর পার্শ্ব সঙ্ঘারামের তোরণ পার্শ্বে একটি। ফলে গৌড়ীয় চারচালার এ জাতীয় মন্দিরের বিস্তারিত আলোচনা না করলেও চলবে। (চিত্র—১৭)-তে কাখর ও গৌড়ীয় দেউলের রেখ-

চিত্র দেওয়া গেল। কাখর দেউলের সংখ্যাও খুব কম। পাঁচটি মাত্র কাখর দেউল আমার নজরে পড়েছে—এর ভিতর বৈতাল ও গৌড়ী দেউল উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত—কাখর দেউল যেখানে দেখা গেছে সেখানেই দেখছি মূলবিগ্রহটি শক্তি মূর্তির। এটাকে ঠিক কাকতালীয় ঘটনা বলে মেনে নিতে মন

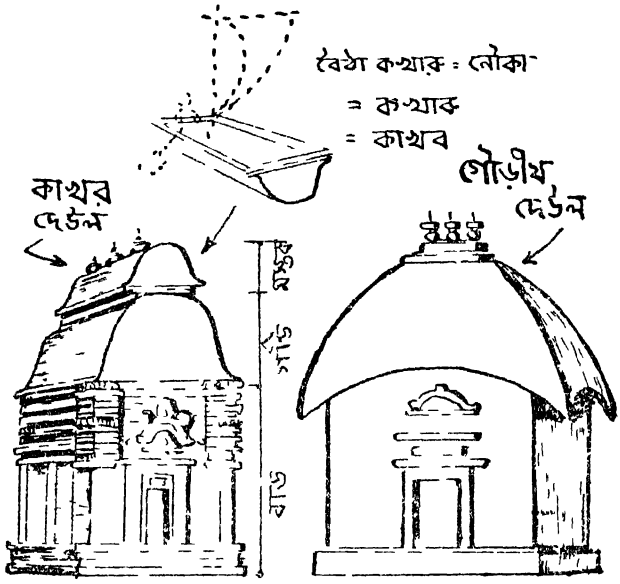

চিত্র—১৭ ॥ কাখর ও গৌড়ীয় দেউল

চায় না। অথচ পুরাতত্ত্ববিদেরা এর কোন কারণ খুঁজে পাননি।[১] আমার মনে একটি যুক্তির উদয় হয়েছে। শিল্পশাস্ত্রে রেখ ও ভদ্র দেউলকে যথাক্রমে পুরুষ ও রমনীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। রেখ-

১) "There are only five 'Kakhara deul' at Bhubaneswar all of which are dedicated to Sakti-worship—a fact difficult to explain away as a mere coincidence."
—Bhubaneswar, p 17, Archaeological Survey of India, by Smt. Debala Mitra.

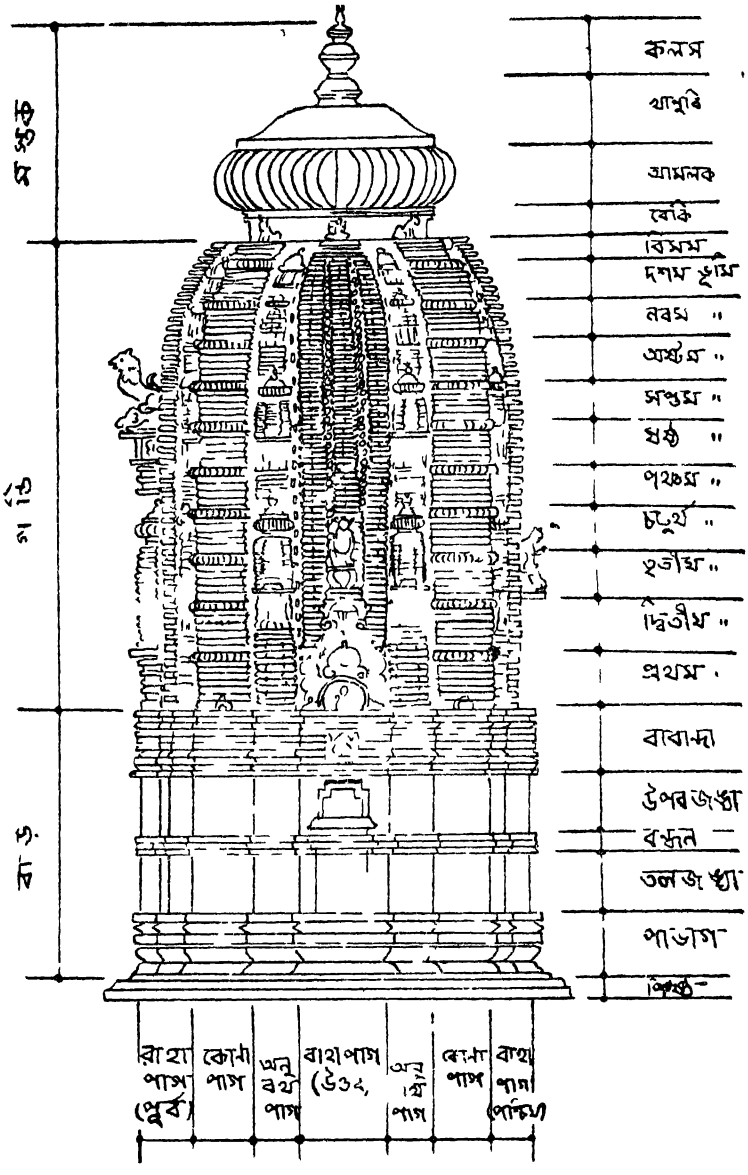

চিত্র—১৮ ॥ রেখ দেউল (সম্মুখ দৃশ্য)

দেউলের গর্ভগৃহে বা গম্ভীরায় স্থাপিত হন দেব বিগ্রহ—জগমোহনটি ভদ্র (পীড) দেউল—যেন বেখ-দেউলের স্ত্রীর ভূমিকায় তার সম্মুখে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে। (চিত্র—১৮ এবং চিত্র—১৯)-এ যথাক্রমে বেখ ও ভদ্র-দেউলের স্বরূপটা দেখান হয়েছে লিঙ্গরাজ মন্দিরের অনুকরণে। ওদের পাশাপাশি অবস্থায় দেখলে মনে হবে বর-কনে! কিন্তু বিগ্রহটি যখন 'দেব' না হয়ে 'দেবী' হবেন তখন স্থপতিবিদ যেন

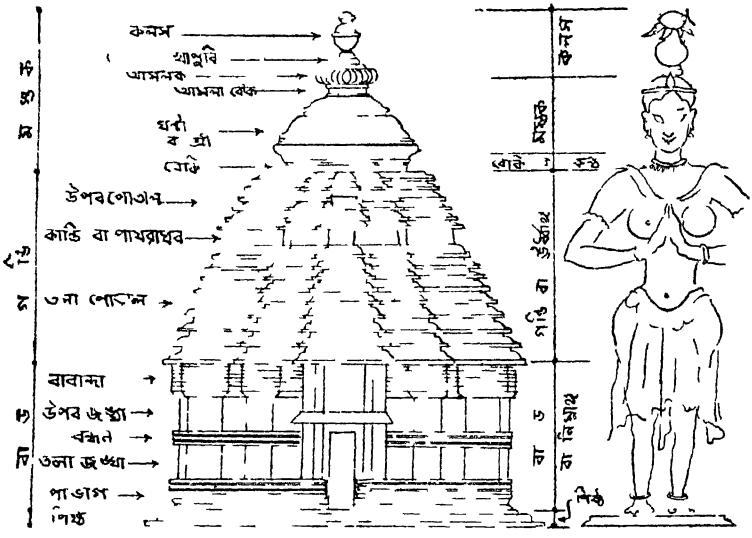

চিত্র—১৯ ॥ ভদ্র (অথবা পীড) দেউলের ব্যঞ্জনা
[লিঙ্গরাজ অনুকরণে]

একটা সমস্যায় পড়লেন। শক্তি-বিগ্রহের উপর পুরুষ-প্রতীকী বেখ-দেউল নির্মাণ করতে ভদ্রতায় বাঁধল তাঁর—অথচ বিগ্রহের উপর ভদ্র বা পীড-দেউল তৈরী করতেও সঙ্কোচ হয়—সেটা যেন দেবীর প্রতি অপমানকর। কারণ, এ যাবৎকাল সেটি দেববিগ্রহের উপর নির্মিত হয়নি, লেগেছে জগমোহন তৈরীর কাজে। বোধকরি সেইজন্যই দেবী-বিগ্রহের উপরে লিঙ্গ-প্রতীকী বেখ-দেউল তৈরী না করে

কখারু (নৌকো) ['কাখর' শব্দটা যা থেকে এসেছে]-প্রতীকী মন্দির নির্মাণ করার বিধান দিলেন তিনি। নৌকা তার গর্ভে যাত্রীদের ধারণ করে—তার পরিকল্পনা স্ত্রীরূপের।

জানিনা সাহিত্যিকের এ ব্যাখ্যা পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা কি চোখে দেখবেন।

বাকি যে দুটি থাকল, অর্থাৎ রেখ-দেউল ও ভদ্র-দেউল—তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য। উচ্চতার দিকে উভয় দেউলকেই স্থপতিবিদেরা প্রধান চারটি অংশে বিভক্ত করেছেন। যথা :—পিষ্ঠ, বাড়, গণ্ডী (বা রথক অথবা ছাপর) এবং মস্তক। রেখ এবং ভদ্র-দেউলের পিষ্ঠ ও বাড় অংশে বড় একটা ফারাক নেই—যা কিছু প্রভেদ তা ঐ গণ্ডীতে এবং কিছুটা মস্তকে। দেব-দেউলকে শিল্পী যেন কলসী মাথায় একটি মনুষ্য মূর্তি রূপে কল্পনা করেছেন। পিষ্ঠ যেন সেই মনুষ্য মূর্তির পাদপিঠ বা প্ল্যাটফর্ম। বাড় অংশটা হচ্ছে নিম্নাঙ্গ—পায়ের গোড়ালি থেকে নাভি পর্যন্ত। গণ্ডী হচ্ছে ঊর্ধ্বাঙ্গ—নাভি থেকে কণ্ঠ। মস্তক স্বনামধন্য। এই চারটি অংশের উপভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বলে রাখা ভাল যে রেখ এবং ভদ্র দেউলের ভূমি-নক্শা (প্ল্যান) হচ্ছে বর্গক্ষেত্র, অপর পক্ষে কাখর দেউলের ভূমি-নক্শা আয়তক্ষেত্র। শেষোক্ত দেউলে পিষ্ঠ বা পাদপিঠ নেই।

১॥ **পিষ্ঠ** (রেখ এবং ভদ্র) : শিল্পশাস্ত্র অনুসারে পিষ্ঠ আট রকমের হতে পারে। তাদের নামও পাচ্ছি : পদ্ম, সিংহ, ভদ্র, বেদী, সুথীর, খুর, কুম্ভ (অথবা কূর্ম) এবং পরিজঙ্ঘা। ভুবনপ্রদীপের নির্দেশানুসারে অধ্যাপক বসু এই বিভিন্ন প্রকার পিষ্ঠের স্বরূপ চিত্র-সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু অত বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের প্রবেশ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা গবেষক নই, রসপিপাসু।

২॥ **বাড়** (রেখ-এবং ভদ্র-দেউল) : মন্দিরের যে অংশের নাম

'বাড়' অর্থাৎ মনুষ্য দেহে যা-নাকি পায়ের পাতা থেকে নাভি দেশ, তাকে আবার পাঁচভাগে অথবা তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিন ভাগ মন্দিরকে বলে ত্রি-অঙ্গ—কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যেহেতু পঞ্চ অঙ্গ মন্দিরের সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী তাই আমরা এখানে পাঁচভাগের কথাই বিস্তারিত ভাবে বলছি। এই পাঁচটি ভাগ হল—পা-ভাগ, তল-জঙ্ঘা, বন্ধন, উপর-জঙ্ঘা এবং বরণ্ডি। মনুষ্য দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের সঙ্গে এই পাঁচ অংশের সাদৃশ্যটা (চিত্র—১৯)-এ বোঝাতে চেষ্টা করেছি। দুটি জঙ্ঘা অংশে সচরাচর মন্দির-ভাস্কর্যের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মূর্তিগুলি শোভিত হয়। অপর পক্ষে পা-ভাগ, বন্ধন ও বরণ্ডিতে থাকে জমির সমান্তরাল কতকগুলি উপভাগ। সবার নীচে পা-ভাগে থাকে এই রকম পাঁচটি উপভাগ, তাই পা-ভাগের চল্‌তি নাম 'পাঁচকাম'। তেমনি বন্ধনের নাম 'তিনকাম', যেহেতু সেখানে তিনটি উপভাগ। অনুরূপভাবে সবার উপরের ভাগ অর্থাৎ বরণ্ডির নাম 'সাতকাম', সেখানে সাধারণতঃ সাতটি উপভাগ।

এই উপভাগগুলির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে হলে বাড় অংশটা একটু বড় করে এঁকে দেখাতে হয়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে আমি যে মাপগুলি পেয়েছি সেটাকেই উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে (চিত্র—২০)। পাঁচকাম, তিনকাম এবং সাতকাম—তিনটি ক্ষেত্রেই দেখছি শেষ উপভাগটির নাম 'বসন্ত'। যে বর্ডারের শেষপ্রান্ত কোণাযুক্ত অথবা গোলাকার নয় তাকেই দেখছি বলা হচ্ছে 'পাটা'। আর কোণাযুক্ত বর্ডারের নাম 'কাণি' গোলাকৃতি হলে বলা হয় 'নলি'। কুম্ভ, পদ্ম অথবা পাদের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—তাদের আকৃতিতেই তাদের পরিচয়।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপভাগের মাপ কত হবে তাও নির্দেশ করেছেন শিল্পশাস্ত্রকারেরা—কিন্তু তাই বলে শিল্পীর স্বাধীনতাকে কোথাও খর্ব করা হয়নি। কারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রমও বেশ নজরে পড়ে। যেমন মুক্তেশ্বর মন্দিরের বিমানের বারান্দায় কাণি নেই তার পরিবর্তে

আছে পাটা। পরশুরামেশ্বরের মন্দিরে আবার পাটা কানি দুটিই নাই—পরিবর্তে আছে পাদ-কুম্ভ-বসন্ত। তা হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাগ-উপভাগ একই ছাচে ঢালা।

প্রশ্ন হতে পাবে, যদি প্রতিটি ভাগ-উপভাগ একই ছন্দে একই মাপে তৈরী হয় তাহলে বৈচিত্র কোথায়? মন্দিরগুলোতো সবই

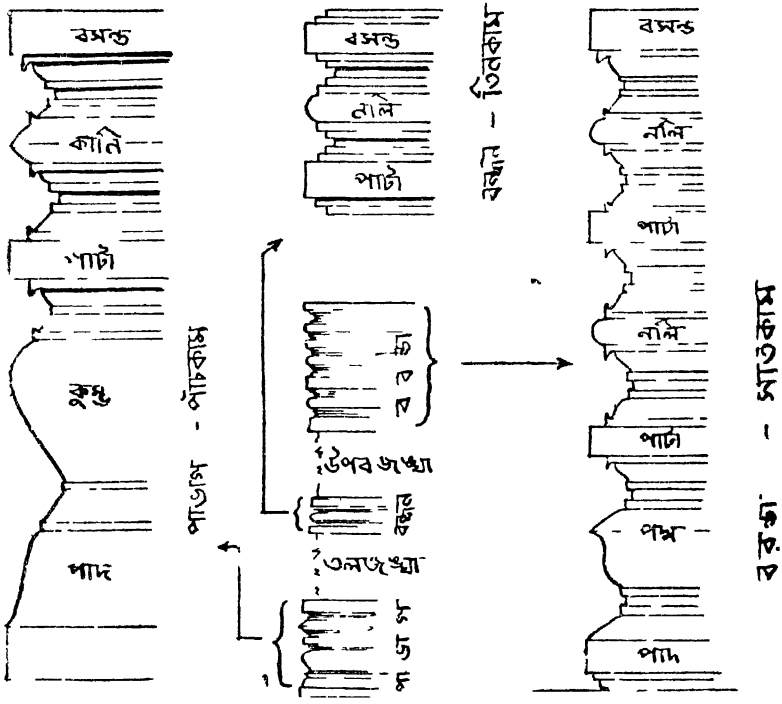

চিত্র—২০ ॥ 'বাড' অংশের শাস্ত্রসম্মত উপভাগ
[সিদ্ধেশ্বর দেউল অনুকরণে]

এক ঘেয়ে লাগবে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এ কথাব মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। (চিত্র—১৯)-এ ভদ্র-দেউলেব পাশে যে মনুষ্য মূর্তিটি আছে ওব কথাই বিবেচনা করুন। ওর বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের মাপের একটা অনুপাত আছে। এই পৃথিবীর তিনশ' কোটি

মানুষের দেহে বিশ্বনিয়ন্তা মোটামুটি সেই ছন্দের নিয়ম মেনে চলেছেন ; কিন্তু সেজন্য কি এই দুনিয়াতে বৈচিত্রের কোনও অভাব ঘটেছে ? কবন্ধ মূর্তি বাস্তবে দেখতে পাচ্ছেন না বলে আপনি কি দুঃখিত ?

বাড় অংশের বিভিন্ন ভাগের যে ছন্দ তার মূলসূত্রটি আবিষ্কার করতে হলে আমাদের কয়েকটি উদাহরণ নিতে হবে। ছয়টি উদাহরণ নীচের তালিকায় সংযুক্ত করলাম।

	পা-ভাগ বা পাঁচকাম	তলজঙ্ঘা	বন্ধন বা তিনকাম	উপর জঙ্ঘা	বরণ্ডি সাতকাম
সিদ্ধেশ্বর	৩′-১১″	৩′-৫″	১′-৩″	৩′-৫″	৩′-১০″
অনন্ত বাসুদেব					
জগমোহন	৩′-০″	২′-৬″	১′-০″	২′-৬″	৩′-০″
বড় দেউল	৪′-০″	৩′-৪″	১′-৪″	৩′-৪″	৪′-০″
লিঙ্গ রাজ					
নাট মন্দির	৪′-১১″	৪′-১″	১′-১″	৪′-১″	৪′-১১″
জগমোহন	৭′-০″	৬′-৬″	২′-০″	৬′-২″	৭′-১″
বড় দেউল	১০′-৫″	৯′-১০″	৩′-০″	৯′-৩″	১১′-০″

এইভাবে অনেকগুলি উদাহরণ নিয়ে দেখেছি কয়েকটি মোটামুটি মূল-সূত্র পাওয়া যায়। যেমন :—

ক) পা-ভাগ ও বরণ্ডির উচ্চতা প্রায় সমান।

খ) তল ও উপর জঙ্ঘার উচ্চতা প্রায় সমান।

গ) পা-ভাগ ও বরণ্ডির সম্মিলিত উচ্চতা অপর তিনটি অংশের যোগফলের সমান।

ঘ) বন্ধনটি উচ্চতায় পা-ভাগ বা বরণ্ডির এক তৃতীয়াংশ।

উপভাগগুলির মাপ নিয়ে বিচার করলেও দেখি তাদের অনু-

পাতের মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। সে অনুপাতটি এভাবে বলা যায়ঃ—পাদ : কুম্ভ : পাটা : কাণি : বসন্ত = ৪ : ৪ : ২ : ১ : ১।

কিন্তু উপভাগ নিয়ে অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার আমাদের না করলেও চলবে। ঐ সূত্র অনুসারে কোন মন্দির নির্মাণে তো আমরা ব্রতী হইনি—আমাদের উদ্দেশ্য মূল ছন্দটা মোটামুটি জেনে নেওয়া, যাতে সৌন্দর্য উপলব্ধিতে আমাদের সুবিধা হয়।

৩ক ॥ গণ্ডী (রেখ-দেউল) : বাড় অংশের সর্বোচ্চ উপভাগ বসন্তের উপরের অংশ হচ্ছে গণ্ডী এবং তার শেষ 'বিসমে'। প্রথম খানিকটা অংশ যেন খাড়া উঠে গেছে, তারপর ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে বেঁকেছে। একটা শক্ত বাঁশকে মাটিতে দৃঢ় ভাবে পুঁতে যদি তার আগায় দড়ি বেঁধে টানতে থাকি তাহলে সেটা বোধকরি ঐ ছন্দেই বাকবে। এ-ভাবে বাঁকার জন্য উপরের অংশের বিস্তার যখন বাড়ের বিস্তারের প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় তখনই গণ্ডীর শেষ। এই গণ্ডী অংশটিকে কয়েকটি ভূমিতে ভাগ করা হয়। (চিত্র—১৮)-তে রেখ-দেউলটি লিঙ্গরাজের বিমানের অনুকরণে আঁকা—ওখানে দেখছি, সর্বসমেত দশটি ভূমি আছে। প্রতিটি ভূমির সমাপ্তি-সূচক একটি খাঁজকাটা আমলকি ফলের চ্যাপ্টা সংস্করণ দেখতে পাচ্ছি, যাকে বলে ভূমি-আম ক।

৩খ ॥ গণ্ডী (ভদ্র-দেউল) : ভদ্র-দেউল বা পীড়-দেউলের গণ্ডী অংশ যেন একটি পিরামিড, যার মাথাটা জমির সমান্তরালে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এর ধারগুলি বক্র-রেখা নয়, সরল-রেখা, জমির সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কোণ রচনা করে উঠে গেছে। (চিত্র—১৯)-এ পীড-দেউলের (এটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের জগমোহনের অনুকরণে আঁকা) গণ্ডী অংশটি লক্ষ্য করলে দেখব সেটি যেন দ্বিতল—নীচের দিকে নয়টি জমির সমান্তরাল ধাপ (এগুলিকেই বলে পীড়) তারপর খানিকটা সিঁড়ির চাতালের মত ফাঁক, (তার নাম পায়রাঘর) এর পর উপর অংশের সাতটি পীড়। ঐ দুটি পৃথক অংশের নাম তল-

পোতাল ও উপর-পোতাল। ক্ষেত্র বিশেষে পোতালের সংখ্যা দুইয়ের বেশীও হতে পারে। যেমন : কোনার্ক মন্দিরের জগমোহন, সে ক্ষেত্রে মাঝের পোতালটির নাম হবে 'মাঝ-পোতাল'। দুটি পীড়ের মাঝখানের ফাঁকটুকুর নাম কান্তি।

৪ক ॥ মস্তক (রেখ-দেউল) : মস্তক-অংশের সর্বনিম্ন ভাগ 'বেকি' যেন বস্তুতঃ মস্তকের 'কণ্ঠ' যার উপর আমলক ও 'খাপুরির' মুণ্ডটা বসান। আমলক অলঙ্করণটি কলিঙ্গ স্থাপত্যে শুধু নয় নাগর স্থাপত্যের অন্যান্য শাখাতেও পরিদৃশ্যমান। আমলকি ফলের মত খাঁজ কাটা এই অলঙ্করণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গণ্ডী অংশে ভূমি আমলক রূপে ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি। এই প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডটি বস্তুতঃ চার ছয়খানি প্রস্তরখণ্ডের সমাহার। শুধুমাত্র অলঙ্করণের জন্যই নয়, একটি স্থূল পার্থিব প্রয়োজন সাধনের জন্যই এটির আমদানি। মন্দিরের গণ্ডী বা ছাপর-অংশের নির্মাণ-কৌশলটা হচ্ছে ধাপে ধাপে একটু একটু করে বাড়িয়ে দেওয়ার কায়দায়—ইংরেজীতে যাকে বলে 'কর্বেলিঙ'। ভারতীয় স্থপতিবিদেরা আর্চের ব্যবহার করেননি, সম্ভবতঃ তাঁরা আর্চ বা খিলানের মৌল সূত্রটা জানতেন না। প্রতিটি রদ্দায় পাথরকে নীচের রদ্দা থেকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে বসান হত এই কর্বেলিঙ-এর কায়দায়,—মশলার কোন জোড়াই থাকত না বটে তবে লোহার গজালের সাহায্যে একটি পাথরের সঙ্গে অপরটি যুক্ত থাকত। সবার উপরে ঐ প্রকাণ্ড 'আমলক' এবং তদুপরি 'খাপুরি' পাথর দুটি বসান হলে ভারসাম্য রক্ষিত হত। অর্থাৎ কোনভাবে উপর থেকে কেউ যদি আলতোভাবে ঐ প্রকাণ্ড পাথর-খানি তুলে নেয় তবে অন্যান্য রদ্দার ঝুঁকে থাকা পাথরগুলি হুড়-মুড়িয়ে গর্ভগৃহে পড়ে যাবার কথা। এই আমলকটি যেন কল্পিত মন্দির-মনুষ্যের মুখমণ্ডল যার উপর বসেছে 'খাপুরি' অর্থাৎ মাথার খুলি। খাপুরি ও আমলকের মিলন স্থল যেন ললাট অংশ—ত্রিপথ-ধারা। এর উপরে কলসি— যার তিনটি ভাগ ; কলস-পাদ, কলস-

হাঁড়ি ও কলস-গাড়ি (কলসির গলা)। কলস গাড়ির উপরে সর্বোচ্চ স্থানে আছে আয়ুধ—বা দেববিগ্রহের অস্ত্র। শিব মন্দিরে ত্রিশূল এবং বিষ্ণু মন্দিরে চক্র।

৪খ॥ **মস্তক** (ভদ্র-দেউল): ভদ্র বা পীড় দেউলের ক্ষেত্রে মস্তকাংশে সামান্য প্রভেদ হয়। (চিত্র—১৯)-এ বিভিন্ন অংশের নামগুলি উল্লিখিত হয়েছে। রেখ-দেউলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখব কলস ও আয়ুধ অংশে বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নেই; আমলকটি আকারে অনেক ছোট। কারণ আমলকের নীচে এবং বেকির উপরে যোজিত হয়েছে একটি নূতন অলঙ্কার—ঘণ্টা বা শ্রী। ঐ ঘণ্টার আবার নিজস্ব খাপুরি আছে, ত্রিপথধারার পরিবর্তে এসেছে সিজ্‌পত্র পাখুড়; এবং ঘণ্টার জন্য দ্বিতীয় একটি বেকি এসেছে যার নাম আমল-বেকি।

ভদ্র-দেউলের ক্ষেত্রে মস্তকাংশের উচ্চতা সাধারণতঃ এমন হয় যাতে গণ্ডী অংশের মূল কর্তিত-পিরামিডের শীর্ষবিন্দু যেখানে হওয়ার কথা সেখানেই মস্তকের সমাপ্তি হবে।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলি, পার্সি ব্রাউন বলেছেন রেখ-দেউলের গণ্ডী-অংশে ভিতরের দিকে ঐ যে কর্বেল করা অংশটা ঐখানেই উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের নাকি দুর্বলতা। বিভিন্ন উচ্চতায় যদি পাথরগুলি বীম বা কড়ির সাহায্যে যুক্ত হত তাহলে তাদের ভারসাম্য রক্ষিত হত আরও ভালভাবে। একটি চিত্রে (Plate LXXIV) তিনি লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিমানের ফাঁপা গণ্ডীটি দেখিয়েছেন কিন্তু আমার মনে হয় পার্সি ব্রাউন সাহেবের ধারণা ঠিক নয়।[১] কোনার্কে ভেঙে-পড়া রেখ-দেউলের লোহার বীম

১) "Within the tower (of the Rekha deul of the main temple of Lingaraja) is the cella 19 feet square, but instead of a ceiled chamber it is continued upwards somewhat in the manner of a well, or chimney, forming a hollow space throughout the entire height."—Indian Architecture, Buddhist and Hindu Period, (1942) p. 127—Percy Brown.

প্রমাণ দেয় যে ওই অংশটা পাত কূয়ার মত বরাবর ফাঁপা ছিল না। দু একটি অর্ধভগ্ন মন্দিরে আমি লক্ষ্য করেছি গণ্ডীর মাঝে মাঝে চাতাল তৈরী করা হত। লিঙ্গরাজেও যে তা আছে এটা বোঝা যায়। ঐ চাতালে উঠবার পথটিও ভুবনেশ্বরের পাণ্ডা আমাকে দেখিয়ে ছিলেন—সময় সংক্ষেপ থাকায় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেতে দেরী হবে ভেবে আমি নিজে গিয়ে সেটি অবশ্য দেখিনি।

এতক্ষণ পর্যন্ত মন্দিরের স্কাসাদ বা সম্মুখ দৃশ্যের দিকেই আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম এবার তার ভূমি-নক্শা বা প্ল্যানের প্রসঙ্গে আসি।

মন্দিরের ভূমি-নক্শা বিচার করে প্রথমেই নজরে পড়ছে যে মূল মন্দিরই হোক অথবা জগমোহন, নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ যাই হোক —ভিতরের অংশটা চতুষ্কোণ,—কোনও খাঁজ-কাটা নয়। কাখর-দেউলে সেটি আয়তক্ষেত্র, অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্র। ভিতরের দেওয়ালে খাঁজও নেই, কারুকার্যও নেই। অপরপক্ষে বাইরের প্রাচীরে অসংখ্য খাঁজকাটা। বস্তুতঃ ঐ খাঁজের সংখ্যার উপরেই মন্দিরের প্রকার ভেদ।

ভিতরের প্রাচীরের অনুকরণে বাহিরের প্রাচীরেও যদি কোন

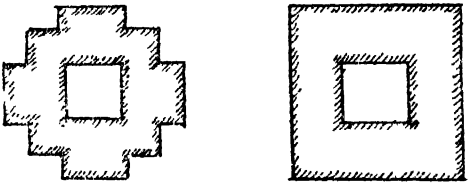

ত্রিরথ একরথ

চিত্র—২১ ॥ একরথ ও ত্রিরথ দেউল

খাঁজ-কাটা না হয় অর্থাৎ চতুষ্কোণ হয় তবে তাকে বলি **একরথ -দেউল** (চিত্র-২১)। বৈতাল-মন্দিরের জগমোহন ও বড়-দেউল (যার অপর নাম বিমান) অথবা পরশুরামেশ্বরের জগমোহন একরথ

দেউলের উদাহরণ। কিন্তু চারদিকের প্রাচীরে যদি মাঝের খানিকটা অংশ এমনভাবে বাইরে বেরিয়ে থাকে যে, যে-কোন দিক থেকে আমরা তিনটি তল দেখতে পাব তা হলে সে ক্ষেত্রে ঐ মন্দিরকে বলব **ত্রি-রথ-দেউল** (চিত্র-২১)। মাঝের বেরিয়ে-থাকা অংশটার নাম 'বাহা পাগ' আর দু কোণায় দুটি 'কোণা পাগ'। পরশুরামের বিমান (বড় দেউল) ত্রি-রথ-দেউলের উদাহরণ (চিত্র—৭)।

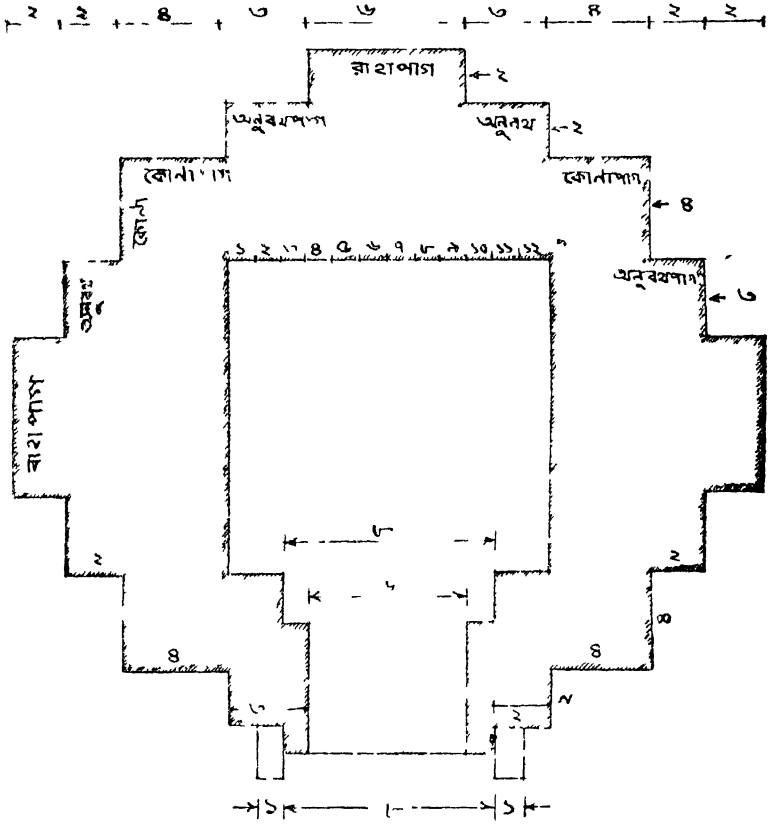

পঞ্চরথ দেউল

চিত্র—২২

সেখানে লক্ষণীয়—খাঁজ শুধু দেওয়ালের বাহিরের দিকেই আছে, ভিতরের দিকে নেই—ফলে রাহা পাগ অংশে দেওয়াল বেশী মোটা করে গাঁথতে হয়েছে।

এবার যদি প্রতিটি দেওয়ালকে তিনভাগের পরিবর্তে পাঁচভাগে ভাগ করি তাহলে পাব **পঞ্চরথ-দেউল** (চিত্র—২২)। আগের উদাহরণের মত মাঝখানে আছে রাহা পাগ, দুকোণায় দুটি কোণা পাগ কিন্তু তার মাঝে এবার দেখা দিয়েছে দুটি 'অনুরথ পাগ'। পুরী ও ভুবনেশ্বরে পঞ্চরথ-দেউলেরই প্রাধান্য। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় ; যথা—লিঙ্গরাজ, অনন্তবাসুদেব, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, মঘেশ্বর, রামেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর প্রভৃতির বিমান।

শাস্ত্রকার **সপ্তরথ** এবং **নবরথ** দেউলের কথাও বলেছেন। সপ্তরথ দেউলের একটি মাত্র উদাহরণ আমার নজরে পড়েছে—রাজারাণী মন্দিরের বিমান। তাও সেটা শাস্ত্রসম্মতভাবে খাঁজ-কাটা নয়। নবরথ দেউল আমি বাস্তবে দেখিনি।

শাস্ত্রে যদিচ বলা হয়েছে যে মন্দিরে প্রাচীরের ভিতরের দিকে কোন খাঁজ কাটা হবে না কিন্তু সে-আইনও যে সর্বত্র মেনে চলা হয়েছে তাও বলতে পারি না। রাজারাণী বা মুক্তেশ্বরের জগমোহন, এমন কি রাজারাণীর বিমানেও দেখছি খাঁজ কাটা হয়েছে। শিল্পীর স্বাধীনতা শুধু ভাস্কর্যেই নয়, স্থাপত্যের সমভাবে স্বীকৃত।

মোট কথা ভূমি-নক্শায় এই যে বিভিন্ন প্রকারের খাঁজ কাটা বা 'পাগ' কাটা হল সেই ছন্দ সমগ্র বাড় অংশে এবং গণ্ডী অংশে মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ এই পাগগুলি শেষ হবে একেবারে যেখানে গণ্ডী অংশ শেষ হয়েছে সেই বিসমে। মূল প্রাচীর অর্থাৎ রাহা পাগ যে-উচ্চতায় খাঁজ কেটে বাইরে বেরিয়েছে বা ভিতরে ঢুকেছে অন্যান্য পাগকে সেই ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে ততখানিই বাইরে বার হতে হবে অথবা ভিতরে ঢুকতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, বিভিন্ন অংশের এই যে এত এত নাম এগুলি

আমাদের জানবার কি দরকার ? প্রয়োজন আছে। এখন আমি যদি বলি 'পরশুরামেশ্বরের বিমানে দক্ষিণ রাহা পাগের তল জঙ্ঘায় একটি গণেশ মূর্তি আছে', তাহলে নক্‌শা ছাড়াই আপনারা সেটি মন্দির-দর্শনকালে খুঁজে পাবেন।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি কথা বলব। বাস্তুশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেন তাঁরা জানেন যে স্থাপত্য শিল্পে একটি 'বিশেষ একক' আছে যার নাম 'মডিউল' (module)। কলিঙ্গের মন্দির-স্থাপত্যের সেই মূল এককটি হচ্ছে সমচতুষ্কোণ গর্ভগৃহের যে দৈর্ঘ্য তার ষোড়শাংশ, দ্বাদশাংশ অথবা অষ্টমাংশ। মন্দিরের যে কোন অংশের (তা সে ভূমি-নক্‌শাতেই হোক অথবা সম্মুখদৃশ্যেই হোক) মাপ বোঝাতে শাস্ত্রকার এই বিশেষ এককের উল্লেখ করেছেন। সূক্ষ্ম মাপের সে বিড়ম্বনা আমরা সাধারণভাবে এড়িয়ে গেছি কিন্তু (চিত্র—২২)-এ পঞ্চরথ দেউলের ক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে আমরা সেটা দেখিয়েছি। (চিত্র--২২)-এ ঐ একক বা মডিউলটি হচ্ছে গর্ভগৃহের বিস্তারের দ্বাদশাংশ।

ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করে এবার আমরা পরবর্তী মন্দিরটি দেখব।

বৈতাল-দেউল ঃ বিন্দু সরোবরের পশ্চিম পারে এই শক্তি মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য আছে নানান্ কারণে। সবচেয়ে বড় কারণ এটি কাখর-দেউলের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ। মন্দিরের ভূমি-নক্‌শা ইংরাজী T-অক্ষরের মত। T-এর শীর্ষদেশ লম্বাটে বিমান, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং মাঝের অংশটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা জগমোহন। বিমান অংশের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে তিনটি করে খাঁজ এবং পশ্চিমাংশে পাঁচটি খাঁজ, পূর্ব-অংশে তো জগমোহন। প্রতিটি খাঁজের মধ্যে কুলুঙ্গির মত খাঁজ আছে, তাতে আছে মূর্তি—দেব মূর্তি এবং পার্থিব মূর্তি। প্রথমোক্ত-দের সনাক্ত করার জন্য প্রত্যেকটি দেব মূর্তিতেই মাথার পিছনে আছে জ্যোতিঃ প্রভা। বাড় অংশের পা

ভাগে পাঁচকামের পরিবর্তে চারকাম। পাদ-কাণি-পাটা-বসন্ত। বন্ধন অনুপস্থিত। গণ্ডী অংশে কিছুটা ভূমি ভাগ করা, উপরের অংশটা সম্ভবতঃ সবটাই পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে মেরামতি করা—আদিম কাঠামোর সরল অনুকরণ। জগমোহনের চারপ্রান্তে চারটি ছোট মন্দির—জগমোহনটির সঙ্গে পরশুরামেশ্বরের জগমোহনের যথেষ্ট সাদৃশ্য। সেই আটচালা পরিকল্পনা এবং উপর থেকে আলো

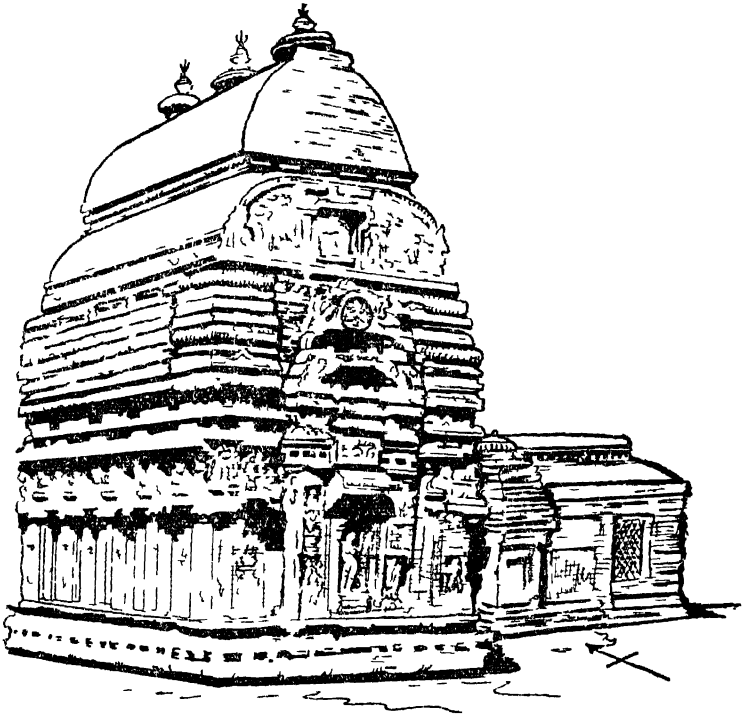

চিত্র—২৩ ॥ বৈতাল দেউল

আসার ফোকর (clearstory)। (চিত্র—২৩)-এ বৈতাল দেউলকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে যেভাবে দেখেছি তাই এঁকে দেখিয়েছি।

বিমানের দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রস্থ কুলুঙ্গিতে আছে চতুর্ভুজ একটি

দুর্গা মূর্তি। চার হাতে আছে—জপমালা, শূল, খড়্গ এবং পূর্ণকুম্ভ। দু' পাশে দুই সখী, উপরে দুটি উড্ডীয়মান গন্ধর্ব। এই মূর্তির দু' পাশের কুলুঙ্গিতে আছে মিথুন মূর্তি ও অলসকন্যা। দুর্গা মূর্তির উপরে চতুষ্কোণ একটি প্যানেলে হর-পার্বতীর যুগল মূর্তি ; তার উপর বৌদ্ধ চৈত্য গবাক্ষের অনুকরণ। তার কেন্দ্রে পাশুপত ধর্মের প্রবক্তা লাকুলীশের ধ্যানস্থ মূর্তি যার উপরে কীর্তিমুখ। লাকুলীশের কথা আগেই বলেছি, কীর্তিমুখ অলঙ্করণটা ভারতীয় মন্দির শিল্পে বহুল প্রচলিত। নাগর এবং দ্রাবিড় স্থাপত্যে সেটি সমভাবে আদরণীয়—তাই আসমুদ্র হিমাচলের দেবদেউলে তাকে দেখতে পাবেন।

বিমানের পশ্চিমে অর্থাৎ পিছনে যে পাঁচটি কুলুঙ্গি আছে তার কেন্দ্রস্থলে আছে একটি দ্বিভুজ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। পুরুষ হস্তে জপমালা ও কমণ্ডলু—স্ত্রীহস্তে দর্পণ। আভঙ্গ ঠামে দণ্ডায়মান এ মূর্তিটি সুন্দর। অন্যান্য কুলুঙ্গিতে মিথুন মূর্তি এবং অলসকন্যা।

বিমানের উত্তরদিকস্থ কেন্দ্রীয় অবস্থানে এ মন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন—অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী। মূর্তির দু'পাশে দুটি মিথুন মূর্তি। প্রসঙ্গত বলি, মূর্তির বামদিকস্থ মিথুন মূর্তির সঙ্গে কার্লে চৈত্যের প্রবেশপথে অবস্থিত একটি যুগলমূর্তির[১] আশ্চর্য সাদৃশ্য। মিথুন মূর্তিদ্বয়ের উপরে চতুষ্কোণ প্যানেলে একজোড়া করে সিংহ, তার উপরে দুটি সিংহ-সওয়ার, নীচে দুটি মনুষ্যমূর্তি। দুই সিংহের মাঝখানে একটি রাক্ষস অথবা সিংহের মুখ—যার মুখ দিয়ে মুক্তার মালা ঝরে পড়ছে—একেই বলি কীর্তি মুখ। মুক্তেশ্বর-মন্দির প্রসঙ্গে এ অলঙ্করণটিকে আমরা ভালো করে দেখব।

অষ্টভুজা এই মহিষমর্দিনী অতিভঙ্গ মূর্ছনায় পরিকল্পিত। মহিষ-মর্দিনীর মূর্তি ভুবনেশ্বরে অনেকগুলি দেখেছি কিন্তু এটি বিশেষভাবে

---

১) কার্লে চৈত্যের ঐ দুটি মূর্তি ঠিক মিথুন মূর্তি নয়—দাতা এবং তাঁর স্ত্রীর প্রতিমূর্তি। তার একটি আলোকচিত্র দেখতে পাবেন—"The Art of Indian Asia, Vol. II. plate 81, by H. Zimmer"-গ্রন্থে।

মনে দাগ কাটে একটি কারণে। লিঙ্গরাজ মন্দিরে বা অন্যত্র মনে হয়েছে দেবী সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মহিষাসুরকে বধ করছেন। দেবীর বীরত্ব এবং শক্তিমত্তার প্রকাশেই শিল্পী সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন ; কিন্তু এ মূর্তিটির ভাব-ব্যঞ্জনা যেন সম্পূর্ণ পৃথক। অতি অনায়াসে তিনি সম্মুখস্থ বাম হস্তের চাপে অসুর দমন করেছেন—দক্ষিণ হস্তধৃত ত্রিশূল যেন মহিষাসুরের কণ্ঠ বিদীর্ণ করতে নয়, সেটি যেন স্পর্শ মাত্র করে আছে—যেন ত্রিশূলের মাধ্যমে মৃত্যু নয়, মুক্তি দিচ্ছেন দেবী। মায়ের দৃষ্টি আনত, ভূপতিত অসুরের দিকে—তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ আস্য, মুখে প্রসন্ন তৃপ্তির আভাস। সে তৃপ্তি বিজয়িনীর নয়—দুর্বিনীত সন্তানকে সৎপথে আনার যে তৃপ্তি অনেকটা যেন তাই। আপনারা যদি সে ভাবটি না দেখতে পান তবে দোষ মূল ভাস্করের নয়, অধম অনুকারকের (প্লেট—২)।

জগমোহন অলঙ্করণবর্জিত, যদিও ভিতরে সপ্তমাতৃকা প্রভৃতি মূর্তি আছে।

বৈতাল দেউলের উত্তরে ঠিক পাশেই শিশিরেশ্বরের মন্দির।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মধ্যহিন্দু যুগ [৮০০ খ্রীঃ—১১০০ খ্রীঃ]

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে গুহা মন্দির যুগের পর আমরা প্রায় পাঁচ-ছয়শত বৎসর ব্যাপী এক বন্ধ্যা যুগ অতিক্রম করে উপনীত হয়েছিলাম আদি হিন্দু যুগে। তারপর প্রায় দু' শ বছর ধরে কলিঙ্গ স্থাপত্যের প্রথম যুগের দেব-দেউলগুলি গড়ে উঠ্‌তে দেখেছি আমরা —শক্রত্নেশ্বর, ভরতেশ্বর, (রামেশ্বর), শিশিরেশ্বর, পরশুরামেশ্বর এবং বৈতাল। এ যুগ শেষ হচ্ছে আনুমানিক নবম শতাব্দীর শুরুতে। আমাদের হিসাবে পরবর্তী যুগ—মধ্যহিন্দু যুগও শুরু হচ্ছে ঐ নবম শতাব্দীর শুরুতে। তাহলে এখানে আমরা যুগ বিভাগ করছি কেন? কালানুক্রমিক একটা ফাঁক তো নেই দুই যুগের ভিতরে। তা নেই, স্বীকার করছি—কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই যুগের মধ্যে মন্দির-স্থাপত্য চিন্তায় একটা এমন প্রভেদ আছে যাতে আমাদের একটি যুগবিভাগ করতে হয়েছে।

ইতিহাসে দেখছি এই যুগে সোমবংশী রাজন্যবর্গ ভৌমকরদের বিতারণ করে শাসনদণ্ড হাতে নিচ্ছেন। ভৌমকরেরা বর্ণ হিন্দু ছিলেন না। শিব শুনেছি আদিম যুগে ছিলেন অনার্যদের দেবতা; ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় তাঁকে জাতে তুলে নিয়েছিল। ভৌমকরেরাও শৈব ছিলেন, পরবর্তী বর্ণহিন্দুরাও শিবপূজা করেছেন;—কিন্তু ভৌমকর যুগে জৈন ও বৌদ্ধদের প্রতি যে বৈরীভাব ছিল এ যুগে যেন সেটা ক্রমে তিরোহিত হয়ে গেল। জৈন ও বৌদ্ধ দেব-দেবীরা হিন্দু মন্দিরে স্থান পেলেন। বুদ্ধ হলেন হিন্দুদের একজন উপাস্য দেবতা। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কলিঙ্গের স্থাপত্য ইতিহাসে এই আদি হিন্দু যুগ থেকে মধ্য হিন্দু যুগের সংক্রমণের মূলে আছেন একজন

যুগাবতার—আচার্য শঙ্কর। এ কথা পূর্বচার্যরা কেউ বলেননি; অনধিকারী আমার এ কথা কেন মনে হয়েছে তা বলি। শঙ্করাচার্য ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন; কিন্তু তার পূর্বেই তিনি পুরীধামে গোবর্দ্ধন-মঠের প্রতিষ্ঠা করে যান। ভারতের বিভিন্নস্থানে এমনকি তিব্বতে গিয়েও তিনি বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের তর্কে পরাভূত করেন বটে কিন্তু 'দশাবতার স্তোত্রে' বুদ্ধদেবকে দেবতার স্থান দেন। শৈবাবতার হওয়া সত্ত্বেও আচার্য শঙ্কর বৃহত্তর হিন্দুধর্মের ভগীরথ। ভৌমকরদের যুগাবসানে তাই গোবর্দ্ধন-মঠের প্রভাবে কলিঙ্গেও এল ধর্মসহিষ্ণুতার জোয়ার। যার প্রতিফলন আমরা দেখব এ যুগের প্রথম মন্দির মুক্তেশ্বরে। আর তাই বৈতাল ও মুক্তেশ্বর প্রায় সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও দুটি দু-যুগের মন্দির!

মুক্তেশ্বর-দেউল: পুরাতত্ত্ববিদেরা বলছেন এ মন্দিরটির নির্মাণ কাল ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের তিরোধানের প্রায় দেড়শ বছর পরে এবং পরশুরামেশ্বর-বৈতাল-শিশিবেশ্বরের পরে কিন্তু ব্রহ্মেশ্বরের পূর্বে। মন্দিরটি ছোট্ট; কিন্তু শুধু অপূর্ব কারুকার্যের জন্যই নয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের একটি যুগ সন্ধিক্ষণের এটি একটি প্রতীক। মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় 'মুক্তেশ্বর বালিপাথরে এক স্বপ্নের বাস্তবরূপ!' অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে এর সর্বাঙ্গ মণ্ডিত। কিন্তু সে কথা পরে, প্রথমে বলা দরকার এটিকে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের একটি দিক-চিহ্ন কেন বলছি।

এখানেই জগমোহনে পীড় বা ভদ্র-দেউলের প্রথম পরীক্ষা হতে দেখছি। পরশুরামেশ্বর, বৈতাল বা শিশিরেশ্বরের মত জগমোহন আর আঠচালা অথবা চারচালা নয়, এগারোটি পীড়ের সমাহার। আদিমরূপ বলে ঘণ্টা কলস-আমলক দেখতে পাচ্ছিনা সে পীড়-দেউলে। দ্বিতীয়তঃ মূর্তিগুলি এতদিন কুলুঙ্গির ভিতর চৈত্য-গবাক্ষের ভিতর দেখেছি—এবার দেখছি মূর্তিগুলো যেন বাইরে বেরিয়ে আছে, যাকে স্থাপত্যের ভাষায় বলে 'in alto-relievo'।

তৃতীয়তঃ বাড় অংশের শাস্ত্রসম্মত ভাগগুলি এখান থেকেই যেন মেনে চলা শুরু হল—পা-ভাগে পাচ্ছি পাঁচকাম, পাদ-কুম্ভ-পাটা-কাণি-বসন্ত। এর পর থেকে ঐ পঞ্চ ছন্দেই ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ

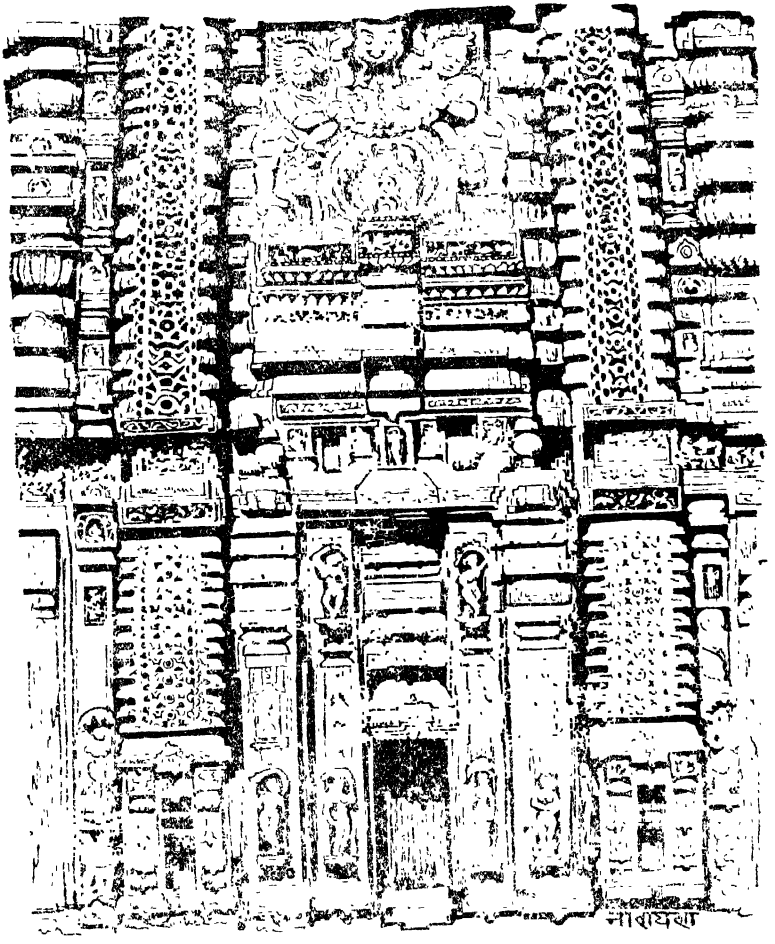

চিত্র—২৪ ॥ মুক্তেশ্বর দেউলের সম্মুখভাগ

মন্দিরের পা ভাগ নির্মিত হয়েছে। চতুর্থতঃ দেবমূর্তিগুলি বাহনযুক্ত হয়েছে—গণেশের পদতলে এসেছে মূষিক, কার্ত্তিকের ময়ূর, সপ্ত-

মাতৃকার ক্রোড়ে এসেছে শিশু। জগমোহন থেকে মূলমন্দিরে প্রবেশ পথের উপর লিণ্টেলে এতদিন দেখেছি অষ্টগ্রহ—এবার কেতু এসেছেন, দেখছি নবগ্রহের পূর্ণরূপ। পঞ্চমতঃ গণ্ডি বা রথক অংশে গজ-সিংহের পরিকল্পনাও এখান থেকে শুরু হল; এবং সবচেয়ে বড় কথা এই মন্দিরে রয়েছে প্রমাণ যে, জৈন-বৌদ্ধ-শৈব সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের বৈরিতার অবসান ঘটেছে। বৈতাল মন্দিরে যেখানে বুদ্ধ মূর্তির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল যূপ-প্রস্তরে—সে-স্থলে মুক্তেশ্বরের গায়ে দেখছি অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির মূর্তি, বুদ্ধমূর্তি এবং জৈন তীর্থঙ্করদের প্রতিমূর্তি! মুক্তেশ্বর সে অর্থে সত্যই 'মুক্তির-ঈশ্বর'—এ মহান উপদ্বীপে ধর্মসহিষ্ণুতার যে মৌল-সংস্কৃতি তা এখানে বিকশিত হয়ে উঠেছে শতাব্দীসঞ্চিত বৈরিতাকে অস্বীকার করে।

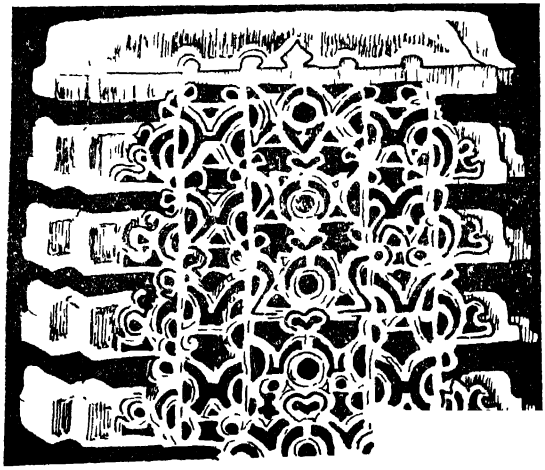

চিত্র—২৫ ॥ বাড অংশের ফাঁদ-গ্রন্থী (মুক্তেশ্বর)

মুক্তেশ্বরেই তাই ভুবনেশ্বর মন্দির-স্থাপত্যের এক যুগের অবসান এবং দ্বিতীয় যুগের সূচনা (চিত্র—২৪)। এটা কি সম্ভবপর হল আচার্য শঙ্কর ও গোবর্ধন মঠের ধর্মসহিষ্ণুতার প্রভাবে?

বিমানের উত্তর ও দক্ষিণ রাহাপাগে গণ্ডি অংশে চৈত্য গবাক্ষটি

একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। কলিঙ্গ স্থাপত্যে এর নাম 'ভো'। ভো-এর মাঝখানে যে মূর্তি থাকে তাঁর নামানুসারে ভো-র নানান্ প্রকার-ভেদ হয়, যেমন 'নারায়ণ ভো', 'সূর্য-ভো', নটরাজ-ভো প্রভৃতি। ভো-র উপর লক্ষ্য করে দেখুন একটি বিকশিত-দন্ত জন্তুর মুখ, তার মুখ থেকে মুক্তার মালা ঝরে পড়ছে। এর নাম কীর্তি মুখ। দু-পাশে দুটি সিংহ-নর মূর্তি, তারা কীর্তিমুখের মালাটিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাহাপাগের দু-পাশে দেখছি অনুরথ পাগে নিচে থেকে উপরে দুটি সুন্দর জাফরি-কাটা নক্শা। ফতেপুর সিক্রি, আগ্রাফোর্ট বা তাজমহলে পাথরের জালি-কাজ দেখে আমরা মুগ্ধ হই কিন্তু তার কয়েক শতাব্দী আগে কলিঙ্গ-ভাস্করের দল যে জাফরির কাজ করেছিলেন তাও কম

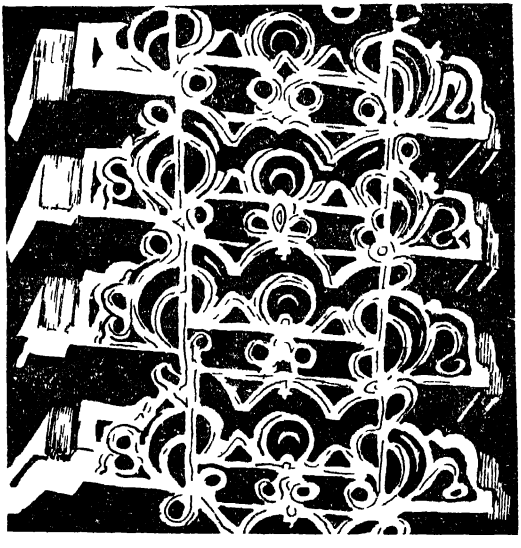

চিত্র—২৬ ॥ গণ্ডি-অংশের ফাঁদ-গ্রন্থী (মুক্তেশ্বর)

চমকপ্রদ নয়। কলিঙ্গ-স্থাপত্যের ভাষায় এর নাম ফাঁদ-গ্রন্থী। জাফরির কাজের সূক্ষ্মতা বোঝাবার জন্য পুনরায় ঐ অংশ দুটি বড় করে এঁকে দেখাবার চেষ্টা করছি (চিত্র—২৫)। লক্ষ্য করে দেখুন

বাড় অংশের নক্শা যে-হেতু দর্শকের দৃষ্টিপথে অপেক্ষাকৃত কাছে তাই গণ্ডি-অংশের চেয়ে (চিত্র—২৬) সেখানে সূক্ষ্মতর জালিকাজ।

দেউল এবং জগমোহন সম্মিলিতভাবে একটি পিষ্ঠের উপর তৈরী। সমস্ত মন্দিরটি ঘিরে একটি পাঁচিল। মন্দির-সমতল সংলগ্ন ভূ ভাগ থেকে নিচে। জগমোহনের সম্মুখে একটি অনুচ্চ তোরণ আছে—যা নাকি কলিঙ্গের অন্য কোনও মন্দিরে দেখিনি (চিত্র—২৭)। তোরণ স্তম্ভ দুটির পাদদেশ ব্রহ্ম কাণ্ড অর্থাৎ চারকোণা-বিশিষ্ট এবং তার উপরের অংশ রুদ্রকাণ্ড অর্থাৎ ষোলোকোণা-বিশিষ্ট। তার উপরে রত্নহার, আমলক এবং একটি প্রকাণ্ড অর্ধপদ্ম। অর্ধগোলাকৃতি উপরের অংশেও নানান্ ভাস্কর্য নিদর্শন। দু দিকে দুটি অর্ধ শায়িতা অলসকন্যা, দু-পাশে দুটি মানব। এবং দুই প্রান্তে দুটি মকর। সাঁচী তোরণের মত এই তোরণটির ঊর্ধ্বাংশের গুজন দেখে অবাক হতে হয়—কেমন করে এমন 'টিল্-হেভি' স্থাপত্য নিদর্শন এতদিন টিকে আছে!

জগমোহনের ভিতরটা কিন্তু অলঙ্করণবর্জিত নয়, খাঁজকাটা এবং মূর্তি-শোভিত। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুটি অপূর্ব জাফরি-কাটা গবাক্ষ। জাফরির চতুর্দিকে 'মানব-কর্কট ও কুম্ভীরের' একটি কাহিনী খোদাই করা। কুলুঙ্গিগুলিতে সম্ভবতঃ পার্শ্বদেবতাদের মূর্তি ছিল—সেগুলি অধিকাংশই অপসৃত। দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে মন্দির প্রদক্ষিণকালে পর্যায়ক্রমে যে দেবদেবীর মূর্তি পাব তা এই: বীণাবাদিনী পদ্মাসনা সরস্বতী, ভগ্নপ্রায় বরাহী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, গজাসুর-সংহাররত চতুর্ভুজ শিব, লাকুলীশ, দুর্গা, অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি, কুবের অথবা জম্ভল, পুনরায় ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় লাকুলীশ, বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধদেব, দুর্গার ভগ্নমূর্তি, পুনরায় কার্ত্তিক এবং সূর্য।

এ মন্দিরে নাগ ও নাগিনী মূর্তির প্রাবল্যও লক্ষণীয়। অবশ্য নাগিনী মূর্তি কলিঙ্গ দেশে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রূপায়িত হয়েছে। একেবারে প্রথম যুগের উদয়গিরি গুহা

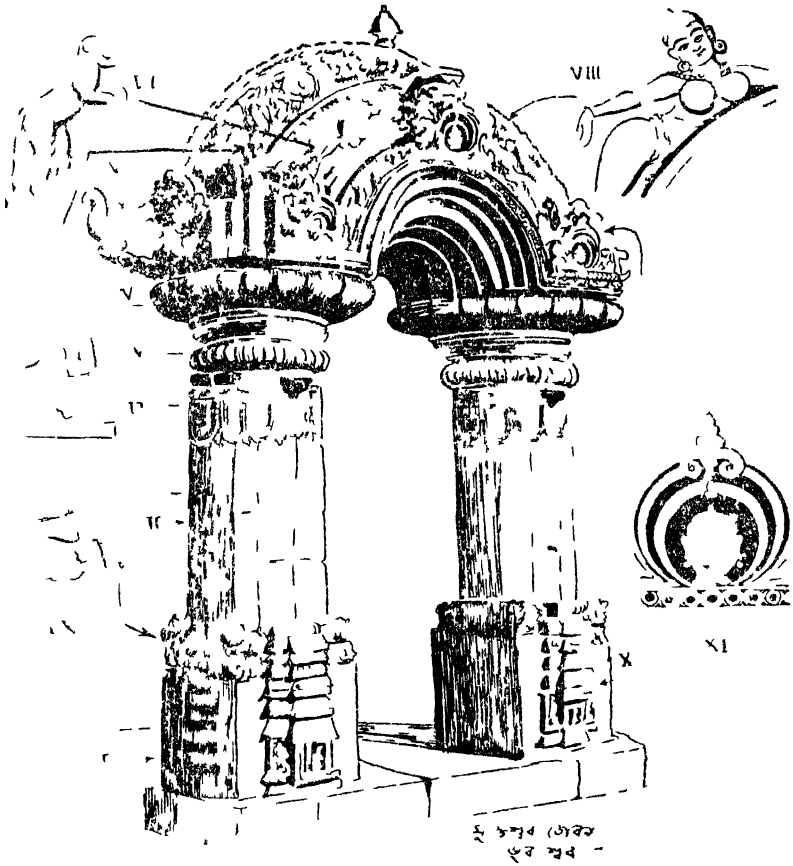

চিত্র—২৭ ॥ কারণ মুক্তেশ্বর দেউল

(I) বন্ধকাণ্ড (চতুষ্কোণ) পাদদেশ

(II) ষোলকোণা বিশিষ্ট রত্নকাণ্ড—মধ্যদেশ

III। রত্নহার	(IV) আমলক
(V) অধপদ্ম	(VI) মকরমুখ
(VII) বানর	(VIII) অলসকন্যা
(IX) গজসিংহ	(X) পীড়মূর্ত্তি

(XI) ভো

থেকে কোনার্কের মন্দির পর্যন্ত। বিমানের উপর থেকে জগমোহনের দিকে ঝুঁকে থাকা ব্র্যাকেটের উপর সিংহ মূর্তিটিও লক্ষণীয়। এটি পরবর্তী যুগের মন্দিরে এক অবিচ্ছিন্ন রূপ নিয়েছে। আর লক্ষণীয় এক শ্রেণীর অদ্ভুত জন্তুর মূর্তি। কলিঙ্গ স্থাপত্যে যার নাম 'বিরাল'। কমলাকান্ত এবং প্রসন্ন গোয়ালিনীর স্নেহধন্য আমাদের চিরপরিচিত চতুষ্পদের সঙ্গে এর নাম সাদৃশ্য থাকলেও আকৃতি-গত পার্থক্য প্রচুর। তাই আমরা বিড়ালে 'ড'-র পরিবর্তে 'র' দিয়ে, এ জীবটিকে উল্লেখ করব। এই 'বিরালের' মুখ হাতীর মত হতে পারে—তখন তিনি গজ-বিরাল, আবার রাক্ষস বা সিংহের মতও হতে পারে, তখন তিনি সিংহ-বিরাল। সচরাচর এঁর পদতলে দেখা যাবে পদদলিত কোন হতভাগ্য মানুষ অথবা একটি হস্তী। এঁর ব্যঞ্জনা হচ্ছে—বীরত্ব! এবম্বিধ বীর বিরালের সাক্ষাৎ বাস্তব জগতে না পেলেও উড়িষ্যার

চিত্র—২৮ ॥ সিংহ-বিরাল

মন্দিরে আপনি বারে বারে পাবেন—তাই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় (চিত্র—২৮)।

মুক্তেশ্বর মন্দিরের সংলগ্ন মারিচী-কুণ্ডের জলপানে বন্ধ্যানারী সন্তানসম্ভবা হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। মুক্তেশ্বরের দক্ষিণে কেদারেশ্বর এবং পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরকে সংলগ্ন মন্দিরই বলা চলে, যদিও তাদের নির্মাণ কাল দ্বিতীয় যুগের।

গৌরী-দেউল ঃ কালানুক্রমিক ভাবে দেখবার উদ্দেশে তাই কেদারেশ্বর মন্দিরকে অতিক্রম করে তার দক্ষিণে অবস্থিত গৌরী-দেউলটি এবার দেখব আমরা। বৈতালের মত এটিও কাখর-দেউল। দুঃখের কথা উর্ধ্বাংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে এটিকে পুনরায় নির্মাণ করতে হয়েছে। এখানেও দেখছি জগমোহনের দিকে রয়েছে একটি ঝাম্পান-সিংহ—যদিও বুঝতে পারি না সেটা আদিম অবস্থাতেও ছিল কি না; কারণ এও পুরাতত্ত্ব বিভাগের মেরামতি করা অংশে অবস্থিত।

গৌরী-দেউলের সঙ্গে মুক্তেশ্বরের সাদৃশ্য প্রচুর। দেউল অংশটা কাখর দেউলের নিয়ম অনুসারে লম্বাটে—পঞ্চরথ দেউল। বাড় অংশের অলঙ্করণ মুক্তেশ্বরের অনুরূপ। যদিও গণ্ডি-অংশে এর পার্থক্য প্রকট। মুক্তেশ্বরের মত ভূমি এবং আমলকে গণ্ডি-অংশ বিভক্ত নয়। মস্তক অংশে বর্তমানে একাধিক কলস আছে, যদিও মনে হয় আদিমরূপে একটি মাত্র শিখর ছিল।[১]

মূর্তিগুলি অধিকাংশই অক্ষত নেই। পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে কোন কোন মূর্তি মেরামতের চেষ্টা হয়েছে, তাতে তাদের রূপ আরও বিকৃত হয়ে গেছে! দক্ষিণ দিকের পূর্বদিকস্থ রাহাপাগে একটি এবং পশ্চিম দিকে আর একটি নায়িকা মূর্তি অটুট আছে—যা থেকে

১) "It is highly probable that the mastaka had originally a single Khākharā"—Bhubaneswar p. 42, Smt. Debala Mitra.

ভাস্করের দক্ষতা সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। প্রথমোক্ত নায়িকামূর্তি একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্তম্ভের উপর একটি পোষা পাখী; এবং শেষোক্ত মূর্তিটি আরও সুন্দর—দেখছি, নায়িকা তাঁর পায়ের নূপুর খুলে ফেলছেন। ব্যঞ্জনাটা মর্মস্পর্শী। এ নায়িকা বস্তুতঃ অভিসারিকা, পাছে চরণ মঞ্জিরের নিক্কণে শ্বাশুরী-ননদিনীর নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় তাই অভিসারিকার এই সাবধানতা!

গৌরী দেউলের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যহিন্দু যুগের প্রথম পর্যায়ের মন্দির-দর্শন শেষ হল আমাদের। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম মন্দির যেটি আমরা দেখব সেটি সিদ্ধেশ্বর। প্রায় সমসময়েই নির্মিত হয়েছিল সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর এবং রামেশ্বর। সময়কালটা একাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মন্দিরগুলি দর্শনের আগে আমাদের পক্ষে কলিঙ্গের ইতিহাস আবার কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া ভাল; তা'হলে বুঝতে পারব কোন রাজকুলের অনুগ্রহে মন্দির শিল্প এভাবে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাসকে আমরা ছেড়ে এসেছিলাম রাজা শশাঙ্কের আমলে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে। সপ্তম থেকে একাদশ এই চারশ বছরে ভারতের স্থাপত্য-ইতিহাসের গঙ্গায় অনেক জল বহে গেছে—বাঙলা-বিহারে পাল রাজাদের উত্থান-পতন ঘটেছে, কান্যকুব্জের প্রতিহার বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চণ্ডেলা বংশ উত্তর খণ্ডে উঠেছে ও পড়েছে। দাক্ষিণাত্যে পহ্লবেরা মহাবলীপুরম্ মন্দির নির্মাণ শেষ করেছেন, বাতাপীর প্রথম-চালুক্য বংশ অস্তমিত হয়ে কল্যাণীতে দ্বিতীয় চালুক্য বংশের অভ্যুত্থান ঘটেছে। কল্যাণীর মন্দিরগুলি শেষ হয়েছে। অজন্তার সব কয়টি গুহামন্দিরের কাজ অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে—এলোরাতে রাষ্ট্রকূটদের অর্থানুকূল্যে শেষ কয়টি গুহা সবে শেষ হল।

সুতরাং কলিঙ্গের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্পীদল নিশ্চয়ই এসব শিল্পকর্মের সংবাদ অন্ততঃ কিছু কিছু রাখতেন। পূর্বযুগের মত যাতায়াত এত দুঃসাধ্য ছিল না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে চালুক্য, পাল বা

কান্যকুব্জ রাজার দূত বিনিময় নিশ্চয়ই হত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কলিঙ্গের শিল্পীদল তাদের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ধারায় অন্য কোনও রাজ্যের প্রভাব মেনে নিতে রাজি হয়নি। শিল্প ক্ষেত্রে কলিঙ্গ আমদানি না করলেও রপ্তানি করেছিল বেশ কিছু। খাজুরাহে চণ্ডেল রাজবংশ কলিঙ্গ স্থাপত্যের রকমফের করেই তৈরী করেছিল অসংখ্য মন্দির। চালুক্যরা কলিঙ্গ অধিকার করেছিল বটে কিন্তু বিজিত জায়গা থেকেই শিল্পধারা নিয়ে গিয়েছিল নিজ দেশে - আমদানি করতে পারেনি কিছুই। বাদামীতে (আহিহলের অনতিদূরে) মন্দির শিল্পে তারই লক্ষণ দেখছি। ধারওয়াড় বাদামীতে মন্দির ও স্তম্ভের বিরাট কলিঙ্গ থেকেই গিয়েছিল। বাদামীতে ১-ন গুহার নটরাজের মূর্তির সঙ্গে দেখছি মুক্তেশ্বরের নটরাজ মূর্তির পরিকল্পনার অদ্ভুত সাদৃশ্য,— যেহেতু শেষোক্তটি বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাই বলতে পারি, বাদামীই এ মূর্তি কলিঙ্গ থেকে আমদানি করেছিল।

সে যাই হোক, শশাঙ্কের কলিঙ্গ বিজয়ের পর ইতিহাসের সূত্র তুলে নিয়ে বলতে পারি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদেই কলিঙ্গে দেখা দিল শৈলোদ্ভব রাজবংশ—গৌড়েশ্বরের করদ নয়, স্বাধীন কলিঙ্গের রাজা হিসাবেই। তাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না বটে তবু এটুকু বলা যায় যে, পরশুরামেশ্বর মন্দির নির্মাণকালে শৈলোদ্ভবেরাই কলিঙ্গের শাসক।

শশাঙ্ক অস্তমিত হতেই শৈলোদ্ভবেরা কলিঙ্গের সিংহাসন দখল করেছিল সম্ভবতঃ ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাদের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র ২৩ বছর পরে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন কলিঙ্গ বিজয়ে আসেন। শৈলোদ্ভবেরা প্রচণ্ড আঘাত খায়—সম্ভবতঃ তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক নূতন রাজবংশ সিংহাসন দখল করল সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি অথবা শেষপাদে—তারা ভৌমকর। প্রায় একশ বছর ধরে ঐ ভৌমকরেরা কলিঙ্গ শাসন করেছে। সেই একশ বছরের ভিতরে তৈরী হয়েছে বৈতাল, শিশিরেশ্বর প্রভৃতি মন্দির।

এই ভৌমকরদের আমলেই, সম্ভবতঃ রাজানুকূল্যে শৈবধর্মের মধ্যে তান্ত্রিক ধ্যানধারণা, মহাযান বজ্রযানের বামাচার প্রবেশ করে। শক্তি পূজাও তাদের আমলে প্রথম শুরু হল—দেখা দিল বৈতাল মন্দির, যার মূল বিগ্রহ চামুণ্ডার! স্বর্ণাদ্রি-মহোদয় পুরাণের সপ্ত-বিংশতি অধ্যায়ে শাস্ত্রকার বলেছেন "নৃমুণ্ডমালা-শোভিতা মহাশক্তি-ধারিনী কাপালিনী চামুণ্ডা বিন্দুসরোবরের পশ্চিমপ্রান্তে অধিষ্ঠিতা।" একাধিকবার 'কাপালিনী' উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় শব্দটা "কপালিনীর" ভ্রান্তরূপ নয়—কাপালিকের স্ত্রী রূপ। বৈতালমন্দিরে হয়তো সে যুগে নরবলী পর্যন্ত হত। ভুবনেশ্বরে অবস্থিত অন্য কোন মন্দিরের গর্ভগৃহ এত অন্ধকার নয়।

ভৌমকরদের শাসন শেষ হল নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং তখনই সোমবংশী রাজন্যবর্গের প্রথম নৃপতি জন্মেজয় কেশরীবংশের পত্তন করেন। ভৌমকররা সম্ভবতঃ ছিল তপশীল-সম্প্রদায়ভুক্ত—ভূঁইহার। বর্ণহিন্দুরা তাদের শাসনে তাই হয়তো খুশী ছিল না। ভৌমকরদের ধর্মমতে যে-সব বামাচার প্রবেশ করেছিল তাতেও গোঁড়া শৈব-পুরোহিতের দল সন্তুষ্ট ছিল না। বর্ণহিন্দু কেশরী রাজাদের অভ্যুত্থানে তাই খুশীই হয়েছিল মন্দির পুরোহিতের দল। মুক্তেশ্বরের মন্দিরে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মুক্তির মন্ত্র তাই কি আমরা শুনতে পেয়েছি কেশরী বংশের শুরুতেই?

মাদলা-পঞ্জী মতে যদিচ জয়তী কেশরী ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিঙ্গে কেশরীরাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু ইতিহাসের মতে রাজা জন্মেজয় (৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং জয়তী কেশরী আছেন দুজন। কেশরী বংশের তালিকার ইতিহাস-স্বীকৃত রূপ নিম্নোক্ত প্রকার :

জন্মেজয়	আঃ	৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ
প্রথম জয়তী	„	৯৭৫ „
ভীমরথ কেশরী	„	১০০০ „

ধর্মরথ	আঃ ১০১৫	খ্রীষ্টাব্দ
নহুশ	„ ১০২০	„
দ্বিতীয় জয়তী	„ ১০৪০	„
উদ্যোত	„ ১০৬৫	„

প্রথম জয়তী কেশরী ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর এবং পুরীতে ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ করান। মুক্তেশ্বর মন্দির অটুট থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে জয়তী কেশরী নির্মিত জগন্নাথদেবের মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই। বর্তমানে পুরীতে জগন্নাথ দেবের যে মন্দির দেখতে পাই তা অনেক পরে আদ্যন্ত নির্মাণ করেছিলেন পরবর্তী রাজ-বংশের অনন্ত বর্মন চোর গঙ্গা। কেশরী বংশের শেষ দুজন রাজা দ্বিতীয় জয়তী কেশরী এবং উদ্যোত কেশরী ভুবনেশ্বরের মূল মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করান। এ ছাড়া দ্বিতীয় জয়তী কেশরীর স্ত্রী এবং উদ্যোত কেশরীর জননী কোলাবতী দেবী ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্মাণ করান। যদিও এই রাজ বংশ শৈব ছিলেন তবু জগন্নাথ দেবের বিষ্ণুমূর্তির নির্মাণ এঁদের হাতেই হয়েছিল। শুধু তাই নয়, উদ্যোত কেশরীর সময়েই খণ্ডগিরিতে নবমুনী গুহায় জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তিগুলি খোদিত হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উদ্যোত কেশরীর মৃত্যুতে কলিঙ্গের সিংহাসনের আবার হাত বদল হল—সোমবংশী অথবা কেশরী বংশীয়দের পরিবর্তে উৎকল-অধিপতি হলেন গঙ্গা এবং সূর্য-বংশের রাজন্যবর্গ কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমরা বরং ভুবনেশ্বরে এ যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের মন্দির—সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, রাজারানী মন্দিরগুলি দেখে আসব। কারণ সেগুলি গঙ্গা বংশের উত্থানের আগেই নির্মিত।

সিদ্ধেশ্বর-রামেশ্বর-কেদারেশ্বর মন্দির তিনটি সম পর্যায়ের এবং একই যুগের। তাদের নির্মাণকাল কেশরীর বংশের শেষ পর্যায়ে। এর ভিতর রামেশ্বর এবং সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মনে হয়, ঐ দুটি স্থানে পূর্বেই দুটি মন্দির ছিল। সেই আদিম দেব-

বিগ্রহের উপর একই স্থানে এ দুটি মন্দির এযুগে নূতন করে গড়ে উঠেছে। রামেশ্বর মন্দিরের সমস্তটা ভিতের (প্লিন্থ-এর) প্রস্তরখণ্ড প্রমাণ দেয় যে সেটি পূর্বেকার মন্দিরের অংশ মাত্র। তাই হওয়া স্বাভাবিক—কারণ ঐ মন্দিরের অনতিদূরে এক সারিতে রাজা দশরথের তিন পুত্রের নামে অতি প্রাচীন তিনটি মন্দির ষষ্ঠ শতাব্দীতেই নির্মিত হয়েছিল। ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর এবং শত্রুঘ্নেশ্বর থাকবেন আর রামেশ্বর মন্দির একই সঙ্গে নির্মিত হবে না, এ কথা চিন্তাই করা যায় না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ঐ তিনটি মন্দিরের সরল রেখায় অবস্থিত ছিল সেই মন্দিরটি, একই দূরত্বে—স্টেশান থেকে মন্দিরে যাবার সড়কটি ঠিক সেই মন্দিরের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে—না হলে মাটি খুঁড়ে সেই প্রাচীন মন্দিরের বনিয়াদ বার করা চলত।

সিদ্ধেশ্বর ঃ অনুরূপভাবে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটিও পুরাতন মন্দিরের উপর একাদশ শতাব্দীতে নূতন করে তৈরী করা। বর্তমান মন্দিরের গায়ে প্রাচীন মন্দিরের কিছু কিছু পাথর এখনও দেখতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের যা বৈশিষ্ট্য এই সিদ্ধেশ্বর-দেউলেই তার পূর্ণ বিকাশ প্রথম লক্ষিত হল। দেউলের ভূমি-নক্শা পঞ্চরথ ; বাড় অংশটি ত্রি-অঙ্গ নয় পুরোপুরি পঞ্চাঙ্গ। উপর ও তল জঙ্ঘার সীমা নির্দেশকারী বন্ধন এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল (চিত্র—২০) জঙ্ঘাদ্বয়ে কাখর-মুণ্ডি ও পীড়-মুণ্ডি অলঙ্করণ দেখা দিয়েছে। বন্ধন অংশ শাস্ত্রসম্মত 'সাত-কাম'। কোণাপাগে দেখছি গণ্ডি অংশে পাঁচটি ভূমি পাঁচটি ভূমি-আমলকে বিভক্ত। মন্দিরশীর্ষের আমলকের তলায় রয়েছে চারটি উপবিষ্ট বামন—যে অলঙ্করণটি পরবর্তী-যুগের প্রায় সব মন্দিরেই অনুকৃত। পার্শ্বদেবতাদের মধ্যে দক্ষিণ রাহাপাগের কুলুঙ্গিতে স-মূষিক গণপতি এবং পশ্চিম কুলুঙ্গিতে কার্ত্তিকেয় উপস্থিত।

জগমোহনটি কিন্তু পঞ্চ-অঙ্গের নয়—সেটি এখনও ত্রি-অঙ্গ অর্থাৎ পাভাগ-জঙ্ঘা-বারান্দায় বিভক্ত। অনতিদূরের মুক্তেশ্বর মন্দিরের

জগমোহনের মতই পীড় দেউল সেটি ; কিন্তু এবার দেখছি, তার উপর আমদানি করা হয়েছে কলস—যদিও পীড়-দেউলের মস্তকাংশের শাস্ত্রসম্মত অন্যান্য অঙ্গ—ঘণ্টা বা শ্রী ইত্যাদি এখনও আসেনি।

কেদারেশ্বর : মুক্তেশ্বর এবং গৌরী দেউলের মাঝখানে এই মন্দিরটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য মন্দিরের মত এটি পূর্ব-মুখী নয়, দক্ষিণমুখী। দ্বিতীয়তঃ এর ভূমি-আমলকগুলি গোলাকার নয় চতুষ্কোণ। পাভাগে পাঁচকাম—পাদ-কুম্ভ-পাটা-কাণি-বসন্ত। উপর-জঙ্ঘায় অধিকাংশই মিথুন মূর্তি, নিচু-জঙ্ঘায় বিরাল। পার্শ্বদেবতাদের মধ্যে কার্ত্তিক এবং গণেশ উপস্থিত। এবার দেখছি, জগমোহনের মস্তকাংশে শাস্ত্রসম্মত সব কয়টি অঙ্গই উপস্থিত। জগমোহনের প্রবেশ-পথে দক্ষিণ দিকে একটি শিলালেখের বক্তব্য—রাজা প্রমাড়ি কেদারেশ্বরের মন্দির সম্মুখে অনির্বাণশিখায় জ্বলার উপযুক্ত প্রদীপটি নির্মাণ করান। বোধকরি অনির্বাণ শিখায় জ্বলবার উপযুক্ত ঘৃতের বাৎসরিক চালানের আয়োজনও তিনি চিরকালের নিমিত্ত করেছিলেন কোন ভূমিখণ্ড দান করে। এই রাজা প্রমাড়ি হচ্ছেন পুরীর মন্দির নির্মাতা অনন্তবর্মা চোরগঙ্গার অনুজভ্রাতা। বলাবাহুল্য এ লিপিটি পরবর্তী কালের।

রাজারানী : সিদ্ধেশ্বর মন্দির থেকে পূবমুখে যে কাঁচা রাস্তাটি চলে গেছে সে পথে পড়বে চারটি মন্দির,—রাজারানী, ভাস্করেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর এবং মেঘেশ্বর। রাজারানী মন্দিরটি সব চেয়ে কাছে—বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই নিঃসঙ্গ মন্দিরটির ভাস্কর্য-নিদর্শন দর্শককে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করবে। মন্দিরটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ এর নামটি। ভুবনেশ্বরের প্রত্যেকটি শৈব-দেউলের নামের শেষাংশ 'ঈশ্বর'। শাক্ত বা বিষ্ণু-মন্দির হলে নাম দিয়েই সর্বত্র তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে—যেমন গৌরী, বৈতাল, মোহিনী বা অনন্ত বাসুদেব। এ-ক্ষেত্রে নাম থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। মুশ্‌কিল এই যে, পরিচয়টা আদপেই পাওয়া যাচ্ছে না।

বোঝা যাচ্ছে না এটা কার মন্দির ; কারণ দেব দেউলে মূর্তি অপহৃত। রাজারানী নামটি এসেছে এই মন্দিরে ব্যবহৃত এক বিশেষ জাতের লালচে বালিপাথর থেকে, যার নাম 'রাজারানিয়া'। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ মন্দিরে দেবমূর্তি আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁদের যুক্তি এই যে, মূলমন্দির বা বিমানে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যাচ্ছে অথচ জগমোহনটি দেখলে মনে হয় অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে কোনক্রমে সেটি শেষ করা। তাই ওঁদের ধারণা, কোন এক রাষ্ট্রবিপ্লবে মন্দিরটি কোনমতে শেষ করা হয় বটে কিন্তু মূর্তি প্রতিষ্ঠা আর হয়ে ওঠেনি। আমরা কিন্তু সে যুক্তি মানতে পারছি না। মন্দিরটির নির্মাণকাল কেশরী রাজবংশের শেষ পর্যায়ে—তখন তেমন কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা ইতিহাসে পাই না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা—একাম্র চন্দ্রিকা পুরাণে ভুবনেশ্বরের দেব দেউলের বিবরণ দিতে বসে শাস্ত্রকার চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বলছেন—সিদ্ধেশ্বর ও মুক্তেশ্বর মন্দিরের পূর্বদিকে ৭০ ধেনুন্তর দূরে শক্রেশ্বর অথবা ইন্দ্রেশ্বর মন্দির অবস্থিত। অর্থাৎ ৭০টি গাভী মুখোমুখি দাঁড়ালে যে দূরত্ব হবে প্রায় ঐ দূরত্বেই আছে রাজারানী মন্দির। যদি এই মন্দিরে কোনকালেই দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা না হত, তা হলে একাম্র চন্দ্রিকা অথবা কপিল-সংহিতা পুরাণে তার উল্লেখ থাকত না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল মূল দেউলের শিখর বা গণ্ডি অংশ। ভুবনেশ্বরে অন্যান্য রেখ-দেউল যেমন ভূমিও ভূমি-আমলকে ভাগ করা এ-ক্ষেত্রে শুধু তাই নয়, চতুর্দিক থেকে ক্ষুদ্রায়তন মন্দিরচূড়া যেন মূল রেখ দেউলকে বেষ্টন করে আছে। এদিক থেকে এই রেখ দেউলের সঙ্গে খাজুরাহের শিখর—বিশেষ করে খাজুরাহের কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দিরের রেখ দেউলের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

তৃতীয়তঃ শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জগমোহন ও গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ প্রাচীর চারটি সরল-রেখার সমাহার নয়। ভিতর দিকেও ক্রমাগত খাঁজ কাটা। দেউলের ভিতর-দেওয়ালে ওভাবে

খাঁজ কাটা ভূমি নক্‌শা ভুবনেশ্বরের অন্য কোনও মন্দিরে দেখতে পাই না— (চিত্র—২৯)।

ভূমি-নক্‌শায় দেখছি কোনাপাগ ও অনুরথপাগের মাঝখানে আবার একটি খাঁজ আছে—অনুরাহাপাগ আমদানি করে, একে সপ্তরথ-দেউল বলা উচিত ;—কিন্তু ঐ অতিরিক্ত খাঁজটি যে হেতু বাইরে বার হয়ে আসেনি প্রচ্ছন্ন আছে, তাই তাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে আমরা এটিকেও পঞ্চরথ দেউলই বলব। এতবেশী খাঁজ

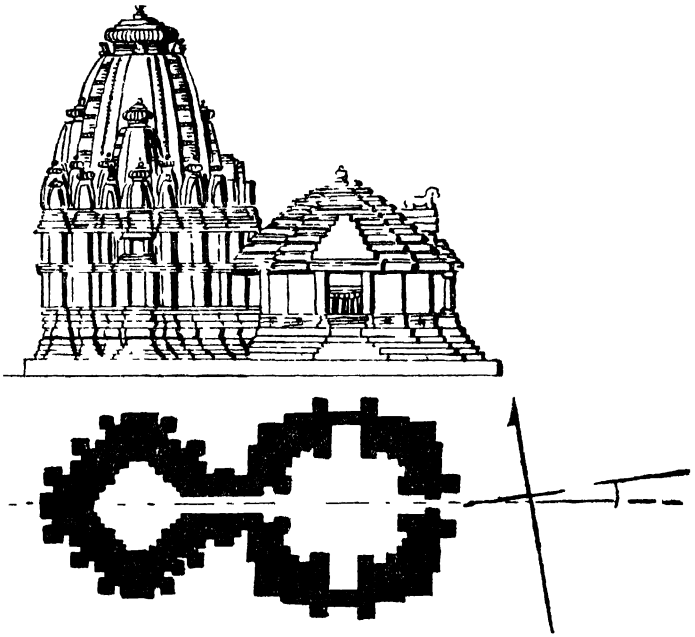

চিত্র—২৯ ॥ রাজারানীর ভূমি নক্‌শা ও পার্শ্ব-দৃশ্য

কাটার জন্য মূল দেউলটি প্রায় গোলাকার হয়ে উঠেছে। তিন দিকের তিন রাহাপাগে অর্ধস্তম্ভবেষ্টিত কুলুঙ্গিতে এককালে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিন পার্শ্ব-দেবতা ; পার্বতী, গণেশ ও কার্ত্তিকেয়। তাঁরা অপসৃত—অপসৃত নয় অপহৃত! প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু খুর

পিষ্ঠের উপর মন্দিরের বাড় অংশে এবার দেখছি, পূর্ণ পঞ্চ অঙ্গরূপ। পাভাগে পাঁচকাম—পাদ-কুম্ভ-পাটা-কাণি ও বসন্ত। তল জঙ্ঘাতে আছেন অষ্টদিকপাল এবং অলসকন্যারা। তল জঙ্ঘায় এক একটি খোপে একটি করে দণ্ডায়মান মূর্তি। অষ্টদিকপালের বর্ণনা পরে দিচ্ছি, অলসকন্যাদেব কথাই আগে বলি। এই নায়িকাদের অসংখ্য ভঙ্গিতে দেখতে পাবেন কলিঙ্গের দেব ·দেউলে। কখনও প্রসাধনরতা—দর্পণে মুখ দেখছেন, সীমন্তে সিন্দুর দিচ্ছেন, চরণ-মঞ্জিবকে বন্ধনমুক্ত করছেন ;—কখনও বা সন্তানকে আদর করছেন, স্তন্যদান কবছেন, আবার কখনও বা পোষা পাখীকে আদর করছেন। শাল-রসাল-অশোক বৃক্ষের শাখায় হাত রেখে অলস-প্রহর যাপন করছেন কোন শালভঞ্জিকা বমনী বুঝিবা কোন মিলন-মধুর রাত্রির স্মৃতিচারণে। এই নায়িকা মূর্তিগুলি অধিকাংশই সপ্ততালমূর্তি —কখনও আভঙ্গ কখনও ত্রিভঙ্গ আবার কখনও বা অতিভঙ্গ মূর্ছনায় দণ্ডায়মান। ভারতীয় নারীমূর্তির সাধারণ ধর্ম অনুসারে এদের নিতম্ব গুরু, পয়োধর পীনোদ্ধত, নয়নযুগল দীর্ঘায়ত এবং ওষ্ঠপ্রান্তে লাজ-বিনম্র মধুর আস্য। লক্ষণীয় এদের অলঙ্কার-গুলি—সীমন্ত থেকে নূপুর প্রতিটি মূর্তির অলঙ্কারে প্রভেদ আছে ; যেন ভাস্কব নয় স্বর্ণকারেব দল খোদাই করেছেন মূর্তিগুলি। পর পর আটটি মূর্তি লক্ষ্য করে দেখলুম, আট জোড়া আর্মলেটের আট রকম প্যাটার্ণ। অলঙ্কারেব বিষয়ে ওঁদের কোন ফ্যাসন ছিল না—প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্টাইল। শুধু কি অলঙ্কার ? কবরীবন্ধন-রীতিতে প্রত্যেকে বিশিষ্ট। কিন্তু শুধু অলঙ্কার আর কবরীবন্ধনরীতি দেখতেই যদি সময় নষ্ট করি তবে এই অলসকন্যাদের অপ্সরী-বিনিন্দিত যৌবনশোভা দেখব কখন ? আর তারও পরে তাদের যে ভাবব্যঞ্জনা—লাবণ্যযোজনা, তা উপলব্ধি করব কেমন করে ? কঠিন পাথরে যে তরলিত মুক্তাভা ফুটে উঠছে—যে পেলবতা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করব কখন ? কলকাতার যাদুঘরে

সংরক্ষিত কয়েকটি অলসকন্যার রেখাচিত্র (চিত্র—৩০) এখানে সংযুক্ত করে দিলাম।

এবার অষ্ট দিকপালের কথা বলি। এগুলি আছে প্রতিটি কোণাপাগের দুই প্রান্তে। চারটি কোণাপাগে সর্বসমেত চার-দুকুনে

চিত্র—৩০ ॥ নায়িকা বা অলসকন্যা

আটটি অবস্থান। দক্ষিণ দিক থেকে দেউলকে প্রদক্ষিণ করলে যথাক্রমে পাব :

১। পূর্বদিক রক্ষক দেবরাজ ইন্দ্র—নিচে ঐরাবত ; ইন্দ্রের এক হাতে বজ্র অপব হাতে অঙ্কুশ।

২। দক্ষিণ-পূর্ব দিকপাল অগ্নি—পদতলে বাহন মেষ,—হাত দুটি ভেঙ্গে গেছে। শ্মশ্রুসমন্বিত অগ্নিদেবের মধ্যদেশ কিঞ্চিত স্ফীত—পিছনে অগ্নিশিখা।

৩। দক্ষিণদিক রক্ষক—দণ্ড ও পাশধারী মহিষবাহন যম।

৪। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকপাল—নৈর্ঋতের এক হাতে তরবারি, অপর হস্তে কোনও পাপাত্মার ছিন্নমস্তক। পদতলে প্রলম্বিত এক অসুরমূর্তি।

৫। পশ্চিম দিকপতি বরুণের মূর্তিটিই সবচেয়ে সুন্দর (প্লেট—৪)

বামহস্তে পাশ এবং দক্ষিণহস্তে বরদান করছেন। পদতলে বাহন—মকর।

৬। উত্তর-পশ্চিম দিকপাল বায়ুর হস্তে একটি পতাকা।

৭। উত্তর দিকের রক্ষক স্থূলকায় কুবেরের অবস্থান সাতটি ধন ঘড়ার উপর।

৮। উত্তর-পূর্ব দিকের ঈশান।

অষ্ট দিকপতি এবং একক অলসকন্যারা আছেন তলজঙ্ঘায়। আটজন দিকপতি এবং ষোলোজন অলসকন্যা। এর উপরের অংশ বন্ধন কিন্তু 'তিন-কাম' নয়—'দুই-কাম'; পরপর দুটি পাটা, তাতে নক্‌শা-কাটা। উপরজঙ্ঘাতে দেখছি দিকপালদের উপরে মিথুন মূর্তি; অলসকন্যাদের উপরে পুনরায় অলসকন্যা। খাঁজের ভিতর অংশে এবং অর্ধস্তম্ভের গায়ে গজ-বিরাল অথবা নর-বিরাল। বারান্দা অংশে সাতকাম—কানি-পদ্ম-পাটা-পাটা-পাটা-পাটা-বসন্ত।

গণ্ডি-অংশের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। লক্ষণীয়, ঝাম্পান-সিংহ অনুপস্থিত। আমলকের নিচে চার দিকে চারটি উপবিষ্ট বামনমূর্তি।

সম্মুখস্থ জগমোহন ত্রি-অঙ্গ, পঞ্চরথ, পীড় দেউল বা ভদ্র দেউল। উপরে মস্তকাংশের শাস্ত্রসম্মত ঘণ্টাশ্রী ইত্যাদি অনুপস্থিত। বাড় অংশের অলঙ্করণ অতি সামান্য। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে রাহাপাগে পঞ্চস্তম্ভ শোভিত গবাক্ষ। জগমোহনের পূর্বদিকে একটি গজসিংহ রয়েছে—জানি না সেটা আদিম রূপে ছিল, না পুরাতত্ত্ব বিভাগের মেরামতির কেরামতি। জগমোহনের প্রবেশদ্বারের কারুকার্যটি লক্ষণীয়। দ্বারের দুই পাশে খাড়া অংশে (জ্যাম্ব অংশে) সর্বনিম্নে দুটি 'বিরাল'—তদুপরি দুই শৈব দ্বারপাল এবং তার উপরে দুটি লতার নক্‌শা। দ্বারের উপরের জ্যাম্ব-অংশে কেন্দ্রস্থলে গজলক্ষ্মীর মূর্তি। দ্বারের উপরের কড়িতে (লিণ্টেলে) নবগ্রহের মূর্তি। ভুবনেশ্বরে অবস্থিত মন্দিরগুলির মধ্যে মুক্তেশ্বর ছাড়া এই মন্দিরটিতেই শুধু জগমোহনের অভ্যন্তরভাগে মূর্তি ও নক্‌শা দেখতে পাবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শেষ হিন্দুযুগ [১১০০খ্রীঃ—১৩০০খ্রীঃ]

মুক্তেশ্বর থেকে রাজারানী পরিক্রমা শেষ করে আমরা উপনীত হলাম শেষ হিন্দুযুগে। উড়িষ্যার সিংহাসনে কেশরী বংশের শেষ অপুত্রক রাজার দেহান্তে গঙ্গাবংশের প্রথম নৃপতি চোরগঙ্গা এসে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। ইতিমধ্যে কলিঙ্গের পূর্বপ্রান্তে বঙ্গদেশে পালরাজাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে, বাঙলা দেশের সিংহাসনে এসেছেন দিল্লীর করদ নবাবেরা। দক্ষিণে চালুক্য-স্থপতির আহিওল, বাদামী পাট্টাদাকলের অপূর্ব শিল্পসম্ভার এতদিনে চার পাঁচশ' বছরের পুরাতন স্থাপত্যকীর্তি—পল্হবদের মহাবলীপুরম (৬০০-৯০০ খ্রীঃ), চোলদের তাঞ্জোর এবং কুম্ভকোনামের (৯০০-১১৫০) মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। উত্তর-খণ্ডে মধ্যভারতের খাজুরাহোর মন্দিরগুলি (৯৫০-১০৫০), রাজপুতানা, গুজরাট বা মথুরার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। কলিঙ্গে এই শেষ হিন্দুযুগের সমসাময়িক স্থাপত্য-বিকাশের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখছি—শেষ চালুক্য-যুগের হয়শোল-স্থাপত্য—হালেবিডে এবং বিজয় নগরে। কলিঙ্গ কিন্তু তার বিশেষরূপটি ঠিকমত ধরে রেখেছে।

পূর্ব পরিচ্ছেদে ইতিহাসকে আমরা ছেড়ে এসেছি ভৌমকরদের অবসান যুগে। কলিঙ্গে এসে রাজ্যস্থাপনা করেছিল সোমবংশী রাজন্যবর্গ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত কেশরী রাজবংশ। কেশরীরা তিন চার শ' বছর রাজত্ব করেন এবং তারপর কেশরীবংশের শেষ নৃপতির দেহাবসানে চোরগঙ্গার মাধ্যমে কলিঙ্গের সিংহাসনে এসে বসেন গঙ্গাবংশ।

এ-যুগের ইতিহাস সংগ্রহে আমাদের বস্তুতঃ দু'টি উপাদান আছে

—পুরী মন্দিরে রক্ষিত তালপাতার পুঁথিতে লেখা মাদলা পঞ্জী এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু শিলালিপি। মদলাপঞ্জীর বিবরণে সাল-শতাব্দীর কিছু কিছু ভ্রান্তি থাকলেও সেটাই আমাদের মূল উপাদান; ফলে সেটাই আগে যাচাই করে দেখি। তারপর বিভিন্ন দলিল, তাম্রশাসন ও শিলালিপির নির্দেশে সেটিকে না হয় সংশোধনের চেষ্টা করা যাবে। গঙ্গাবংশের সম্বন্ধে মাদলাপঞ্জীর বিবরণ নিম্নোক্ত-রূপ:[১]

১১৩২-১১৫২ খ্রীঃ—কেশরবংশের শেষ রাজা সুবর্ণকেশরীর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর চোরগঙ্গা দক্ষিণ থেকে এসে গঙ্গা বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ছুড়াং-সাই সরোবর খনন করেন।

১১৫২-১১৬৬ খ্রীঃ—বংশের দ্বিতীয় রাজা গঙ্গেশ্বর কোনও পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পিপলি ও খুর্দা রোডের মাঝখানে কৌশলগঙ্গা নামে এক সরোবর খনন করেন।

[ঐতিহাসিকদের মতে চোরগঙ্গা ও গঙ্গেশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর সিংহাসন আরোহনের কাল ১১১৮। তিনিই জগন্নাথের মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন।]

১১৬৬-১১৭৫ খ্রীঃ—পর পর দুজন রাজা রাজত্ব করেন।

১১৭৫-১২০২ খ্রীঃ—বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা অনঙ্গভীমদেও সমস্ত রাজ্য জরীপ করান। পুরীর মন্দির সংস্কার করেন।

১২০২-১২৩৭ খ্রীঃ—রাজ রাজেশ্বর দেব।

১২৩৭-১২৮২ খ্রীঃ—লাঙ্গুলীয় নরসিংহ দেব—যিনি কোনার্ক মন্দির নির্মাণ করান।

1. Asiatic Researcher Vol. XV (Edt. 1825) by Stirling & B. C. Banerji.

১২৮২-১৪৭৯ খ্রীঃ — দ্বাদশজন নৃপতির নাম পাওয়া যায়।

১৪৭৯-১৫০৪ খ্রীঃ—পুরুষোত্তমদেব।

১৫০৪-১৫৩২ খ্রীঃ—প্রতাপরুদ্রদেব—যাঁর আমলে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে আগমন করেন।

আগেই বলেছি, মাদলাপঞ্জীর এই তালিকা ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। বিভিন্ন পণ্ডিতের আলোচনা থেকে মনে হয়েছে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বজনস্বীকৃত :

১। পুরীর মন্দির-স্থানে পূর্ব-অবস্থিত কোন ভগ্নদেউলের উপর বর্তমান মন্দিরের নির্মাণ কার্য শুরু করেছিলেন গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনঙ্গবর্মন চোরগঙ্গাদেব (১০৭৮-১১৪৭)। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের তেলেগুভাষী রাজ্যের একজন ভাগ্যান্বেষী মহাযোদ্ধা ;—তিনি নির্ভীক সৈনিক, সুশাসক। দেবদ্বিজে ছিল তাঁর অচলা ভক্তি। তিনি বিষ্ণু উপাসক হয়ে পড়েন।

২। তাঁর অসমাপ্ত মন্দিরগঠন কার্য আরও অগ্রসর করে দেন গঙ্গাবংশীয় নরপতি অনঙ্গভীমদেব (দ্বিতীয়) [১১৯০-১১৯৬]

৩। অবশেষে চোর-গঙ্গার প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব (১২১১-১২৩৮) এ মন্দিব শেষ করেন।

ওড়িয়াভাষায় প্রাচীনতম শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে লাঙ্গুলীয় নরসিংহদেবের পরবর্তী রাজা ভানুদেবের (১২৬৩-১২৬৯) একটি শাসনে ; সেটি সীমাচলমের নৃসিংহদেবের মন্দিরে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু গঙ্গাবংশের আমলে যে-দুটি শিলালিপি ইতিহাস-বেত্তাদের প্রচুর পরিমাণে রসদ জুগিয়েছে সে-দুটি ভুবনেশ্বরে অবস্থিত চতুর্থ নরসিংদেবের[১] এবং পুরীতে অবস্থিত তৃতীয় অনঙ্গভীম দেবের[২]।

আমরা ইতিহাসের ছাত্র নই, তাই এইসব শিলালিপি খুঁটিয়ে

1. Epigrapia India, Vol. XXXII, pp. 229-238.

2. Do. Vol. XXX, pp. 197ff.

দেখার প্রয়োজন আমাদের নেই। অপরপক্ষে মাদলাপঞ্জীতে লিখিত একটি কথোপকথন আমরা আরও মনোনিবেশ সহকারে দেখব। মাদলাপঞ্জীর মতে এ কথোপকথন হয়েছিল রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীম দেব (১২১১-১২৩৮) এবং তাঁর সভাসদদের মধ্যে। এই বিবরণ সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার বলছেন "Although such com -parison have no meaning, one cannot help thinking of the great spcech of Pericles of Athens during the early stages of the Peloponnesian War which has been recorded by the Greek Historian Thucydides.[১]"

আচার্য সুনীতিকুমার সমেত অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে, যদিও মাদলাপঞ্জীতে এ ভাষণ তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের প্রতি আরোপ করা হয়েছে তবু বস্তুতঃ হয়ত এ ভাষণ গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং চোর গঙ্গাদেবেরই। এই ভাষণে সেই বীর দিগ্বিজয়ী কলিঙ্গেশ্বরের চরিত্রটিই শুধু নয়, এর মাধ্যমে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ওড়িয়া ভাষার কী রূপ ছিল তাও আমরা জানতে পারব। আমরা ঐ দীর্ঘ ভাষণের অংশবিশেষ বাঙলা-হরফে মূলরূপে[২] এবং তার বঙ্গানুবাদ[৩] কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"রাজ-ভোগ-ইতিহাস

"ভো ভবিষ্য মহারাজ-মানে,

দেবতা-ব্রাহ্মণ-ন-কু, বল-ভণ্ডার-কু, রাজনীতিছায়া-কু মধ্যকরি মু যেমত প্রকারে ভিয়ান করি দেউ অছি, এথিকি তুমে-মানে ন

1. Arthavallabha Mahanti Memorial Lectures, 1st Series p.p. 35

২) ডাঃ অর্থবল্লভ মোহান্তি কর্তৃক 'প্রাচী সমিতি' (পৃঃ ২৮-২৯)-তে প্রকাশিত।

৩) আচার্য সুনীতিকুমারের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে গ্রন্থকার কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত।

পুনি বোল—সে দেই গল, আম্হর কি হইলা, আম্হে কিম্পা দবু ;—এমত ন বলিব।

"এ তি ওড়িশা-রাজ্য, যে কেশরি-রাজা-মানংকু আদি করি গঙ্গ-বংশে আম্ব চপাট সরিকি রাজ্য আয়ে হৈ থিলা, পূর্ব দিগে অর্ক-ক্ষেত্র…"

অর্থাৎ :

হে ভবিষ্যৎ রাজন্যবর্গ,

দেবতা-ব্রাহ্মণ সমর-বিভাগ রাজকোষ প্রভৃতির ভিতর যেভাবে আমি রাজ্যের সম্পদ ও আয় বণ্টন করে দিয়ে গেলাম সে সম্বন্ধে তোমরা যেন এভাবে কথা বল না—তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তাতে আমাদের কি ? আমরাও কেন (ঐভাবে) দিতে থাকব ? এ ভাবে তোমরা বল না।

এই তিন উড়িষ্যারাজ্য যা কেশরী রাজাদের কাছ থেকে গঙ্গা বংশের আমরা ছিনিয়ে নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি, যার পূর্ব সীমানায় অর্ক ক্ষেত্র—ইত্যাদি

মহারাজ অতঃপর তাঁর রাজ্যসীমার বর্ণনা করেছেন, রাজ্যের আয়ের কথা বলেছেন এবং কি-ভাবে রাজসম্পদ দেবতা-ব্রাহ্মণ, সেনা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র-বিভাগ প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন করা হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "সেই প্রকারে পুষ্টি নষ্টি দেখি, কর ঘেনি, পরজাংকু পরিপালন করি, পৃথিবী ভোগ করি, সুখে স্বর্গকু জিবা। ভো মহারাজ-মানে, সবুথারু ধর্ম্মহিঁ সে কারণ—" অর্থাৎ "এই প্রকারে আয়-ব্যয়ের হিসাবের দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রজাসাধারণকে প্রতিপালন করে এবং নিজেরা পৃথিবীকে ভোগ করে তোমরা সুখে স্বর্গে যাবে। (কিন্তু) হে (ভবিষ্যৎ যুগের) মহারাজ, (মনে রেখ) ধর্মই একমাত্র মূলকারণ।"

তাই সেই আদি ধর্মের প্রতীক দেবদেউলের দিকে নজর দিতে হবে। মহারাজ তাই অবশেষে বলছেন, "যযাতি-রাজা জৌ পাটল

তোলাই পরমেশ্বরকু বিজে করাই আছন্তি সে পাটল গোটিক অতি বৈষম হইলা। এহা ভাঙ্গি শয় উচ্চে প্রাসাদ গোটিকে তোলাইবা পরমেশ্বরংকু। আয়তন-ভিতর দেবতা-মানংকর দেউল গোটামানা আনকরি তোলাইবা।" [রাজা যযাতি যে মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন যার গর্ভে পরমেশ্বর (অর্থাৎ জগন্নাথ) আছেন, সেই দেউল অত্যন্ত ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ঐ খানে একশ হাত উঁচু মন্দির নির্মাণ করাব।]

মাদলাপঞ্জী বলছেন, এ কথা শুনে সভাসদেবা বলেছিলেন—মহারাজ, এ আপনার উপযুক্ত প্রস্তাব। এ কথা ইতিপূর্বে কেউ চিন্তা করতে পারেননি। কিন্তু 'ধর্ম্মস্য ত্বরিতগতি—ধর্ম্ম বিচারিলে বড় বেগ করি।' তাই আমাদেব প্রস্তাব শত হস্ত উচ্চ দেউল নির্মাণের সঙ্কল্প ত্যাগ করে আমরা যদি উচ্চতাটাকে দশ হাত কম করি—দশ থেকে নয় হাত—তাহলে শীঘ্রই এ মন্দির নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হবে।' এ প্রস্তাবে মহারাজ প্রথমে আপত্তি কবেছিলেন কিন্তু প্রজাবর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে (তাঁরা যুক্তি দেখান—মন্দির যদি শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত না হয তাহলে সমস্তই পণ্ডশ্রম হবে) রাজা বললেন, "হৌ, নয় হাত উচ্চ উচ্চে প্রাসাদ হৌ। (তথাস্তু, তবে নয় হাত উচ্চ প্রাসাদই হোক)[১] কিন্তু কী জাতীয় মন্দিব হবে সে কথা মহারাজ নিজে ঘোষণা

১) ডাক্তার অর্থবল্লভ মোহান্তির মূল এবং আচার্য সুনীতিকুমাবের ইংরাজী অনুবাদ পডলে মনে হয় সভাসদেরা বলেছিলেন নয় হাত উঁচু মন্দিব বানাতে এবং মহারাজও সেইমত আজ্ঞা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা হতে পারে না। একশ হাত উঁচু মন্দিরের প্রাথমিক পরিকল্পনা বদল করে সম্ভবতঃ (নয় হাত কম) নব্বই হাত উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের আদেশই মহারাজ দিয়ে থাকবেন। মনে হয়, মহারাজ এখানে প্রতিটি 'ভূমি' কে দশ হাতের পরিবর্তে নয় হাত করতে বলেন, অর্থাৎ বাস্তুশাস্ত্র-সম্মত module টি বদল করেন। ফলে মূল মন্দিরের উচ্চতা স্বাভাবিকভাবেই ১০×১০=১০০ এর পরিবর্তে ১০×৯=৯০ হাত হয়েছিল। ফলে মহারাজের নির্দেশ "Let the temple be 9 cubits

করেননি; তিনি তাঁর শিল্প বিশারদদের সেটা নির্ধারণ করতে বলেন। মহারাজ তাই বলেন "এমন্তকু শিল্পশাস্ত্রমান দেখ, কেউ প্রাসাদ হেলে বিষ্ণু-যোগ্য" (শিল্পশাস্ত্রগুলি দেখ—বিষ্ণুর উপযুক্ত মন্দির কি রকম হবে তা নির্ধারণ কর)। তখন শিল্পশাস্ত্র বিশারদ ভট্টমিশ্ররা বললেন—দেউল ছত্রিশ প্রকারের হতে পারে, তার ভিতর কুড়িটি নক্শা উৎকৃষ্ট এবং এই বিংশতি প্রকার দেউলের ভিতর সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে 'শ্রীবৎস খণ্ডশালা'—সেই হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর উপযুক্ত দেবদেউল। মহারাজ সে কথা শুনে তৎক্ষণাৎ মন্দির নির্মাণ কার্যে দশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করলেন। দেব মূর্তির অলঙ্কার বাবদ আরও আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার অনুমোদন করলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীরই হোক অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীরই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি মাদলাপঞ্জীর এ ভাষা বর্তমান ওড়িয়া-ভাষার থেকে খুব কিছু পৃথক নয়। ওড়িয়া ভাষা যারা জানেন না তাঁরও মোটামুটি বুঝতে পারছেন মূল মাদলাপঞ্জীর ভাষা। অন্তত চর্যাপদের বাংলা বুঝতে যেটুকু অসুবিধা আজ সাধারণ বাঙালীর হবে এ-ভাষা বুঝতে তার চেয়ে বেশী বেগ পেতে হবে না বর্তমান উড়িষ্যাবাসীর!

কলিঙ্গ স্থপতির শেষ হিন্দু যুগের প্রথম নিদর্শন যেটি আমরা এবারে দেখতে যাব সেটি ভুবনেশ্বরের সবশ্রেষ্ঠ দেব-দেউল, লিঙ্গরাজ।

লিঙ্গরাজ মন্দির: ভুবনেশ্বরে মন্দির স্থাপত্যের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ দীর্ঘ চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে চলছিল তার শেষ পরিণতি যেন এই লিঙ্গরাজের বর্তমান মন্দির। শুধু উড়িষ্যারই নয় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই মন্দিরটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির—শ্রেষ্ঠত্ব তার পরিকল্পনায়, আয়তনে, উচ্চতায় এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্যে। প্রায় ৫২০′ × ৪৬৫′ মাপের এক প্রকাণ্ড আয়তক্ষেত্রকে উঁচু পাঁচিল

---

high"-এর অর্থ হয়েছিল Let (the module of) the temple be 9 cubits high। সেজন্যই রাজাদেশ 'নয় হাত উচ্চ প্রাসাদ হৌ' নয়, বরং 'নয় হাত উচ্চ উচ্চে প্রাসাদ হৌ।' এ অবশ্য আমার অনুমান।

দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে—যার ভিতর শতাধিক ছোটবড় দেবদেউল। এই প্রাচীরের তিন দিকে তিন প্রবেশ দ্বার—তার ভিতর পূর্বদ্বারই প্রধান প্রবেশ দ্বার। উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত আছে একটি ভেট-মণ্ডপ, যার উপর রথযাত্রার দিন বিকল্প আর একটি মূর্তির সম্বর্ধনা করা হয়। পূর্ব দিকের যে মূল সিংহদ্বার তার সম্মুখে দু'টি সিংহ মূর্তি। কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে প্রথমে নিচে নামতে হবে—তারপর পুনরায় ধাপ বেয়ে উঁচুতে উঠে আসতে হয়। কলিঙ্গ স্থাপত্যের পূর্ণ-রূপ এখানে আমরা দেখতে পাই। তাই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একই অক্ষ রেখায় মন্দিরের পর পর চারটি অংশ দেখা যাচ্ছে—বড় দেউল, জগমোহন, নাটমন্দিব ও ভোগ মণ্ডপ। শেষোক্ত তিনটি পরবর্তী সংযোজন। আগেই বলেছি, কেশবী বংশের শেষ দুই জন রাজাব আমলে লিঙ্গবাজেব বতমান মন্দিরটি নির্মিত ; এবং সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বব শশাঙ্কদেবই সর্বপ্রথম এই মন্দিরের স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গের উপর প্রথম মন্দিব নির্মাণ কবেছিলেন।

মূল বেখ-দেউলটিব উচ্চতা ১৮০'। পরিকল্পনা—পঞ্চরথ দেউলেব : পঞ্চ অঙ্গ। বাড় অংশেরই মাপ ৪৩'-৬"। তার পরিচয় নিম্নোক্ত প্রকার :

বারান্দা	... দশকাম .	১১'-০"
উপর জঙ্ঘা	... (কাখর মুণ্ডি ও কুলুঙ্গি)...	৯'-৩"
বন্ধন (পাটা-কাণি-বসন্ত)	তিনকাম ..	৩'-০"
তল জঙ্ঘা	... (কুলুঙ্গি) ...	৯'-১০"
পা-ভাগ (পাদ-কুমুদ-কুম্ভ-কাণি-বসন্ত)	পাঁচকাম	১০'-৫"
		৪৩'-৬"

তল জঙ্ঘাতে রাজারানীর মত কাখর মুণ্ডি ; কুলুঙ্গিতে অষ্ট দিক-পালেব মূর্তি। এ-ছাড়া অসংখ্য অলসকন্যা, মিথুন মূর্তি ও দেব মূর্তিতে বাড় অংশ পরিকীর্ণ। নানান্-জাতের গজ-বিরাল, নর-বিরাল, গন্ধর্ব, কিন্নর, ঋষি-দেবমূর্তিতে মন্দিরের গায়ে বিচিত্র শোভা। উপর

জঙ্ঘাতে দেবমূর্তিগুলিকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হবে না। রাজা-রানী বা বৈতালের মত এ মন্দির নির্জন নয়—পাণ্ডাই আপনাকে চিনিয়ে দেবে, যদি সন্দেহ থাকে। উপর-জঙ্ঘা অংশে কাখর মুণ্ডি; কুলুঙ্গিতে আছেন—সূর্য, গণেশ, কার্ত্তিক, পার্বতী, অর্ধনারীশ্বর, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি। অলসকন্যাদের ভঙ্গিগুলিও রাজরাণী মন্দিরে বর্ণিত মূর্তির অনুরূপ। কয়েকটির রূপমাধুর্য অপরূপ। দুটি ক্ষেত্রে খাঁজের মধ্যে দুটি অপূর্ব মূর্তি স্বতই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়—স্থানীয় পাণ্ডাকে বলে রাখলে সে আপনাকে দেখিয়ে দেবে।

মিথুন মূর্তিগুলির অশ্লীলতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সে প্রসঙ্গ আমরাও এড়িয়ে যেতে পারি না। কোনার্ক মন্দিরে তার সামগ্রিক আলোচনা করতে হবে বলে ভুবনেশ্বরে ও-প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি রেখে যাচ্ছি।

তিন দিকে তিনটি পার্শ্ব দেবতা অনবদ্য। পশ্চিম রাহাপাগের কুলুঙ্গিতে বৃহদায়তন কার্ত্তিকের মূর্তি। দক্ষিণ পদতলে ময়ূরের মুণ্ডটি ভেঙ্গে গেছে। দু পাশে দুই-সহ দেবতা। উপরে উড্ডীয়মান দুই গন্ধর্ব এবং সর্বোপরি কীর্তিমুখ। কার্ত্তিকের পোশাক, অলঙ্কার এবং মুখভঙ্গি অনবদ্য। উত্তর দিকের পার্শ্বদেবী চতুর্ভুজা নিশা-পার্বতীর দণ্ডায়মান মূর্তি—পদতলে পদ্ম এবং তার নীচে উর্ধ্বমুখ একটি সিংহ। এ মূর্তির কাপড়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করার জিনিস। লক্ষণীয় দেবীর শুধুমাত্র বাম চরণে নূপুর আছে—দক্ষিণ চরণে নাই, অথচ পার্বতীর সঙ্গিনী এবং অন্য সমস্ত স্ত্রীমূর্তির হয় দুই পায়েই নূপুর আছে, অথবা কোন পায়েই নাই। এই এক-পায়ে নূপুর থাকার কী ব্যঞ্জনা তা আমি বুঝতে পারিনি। দক্ষিণদিকের রাহা-পাগে দণ্ডায়মান গণেশ—চতুর্ভুজ! সেটিও অপূর্ব।

অন্যান্য মূর্তির মধ্যে দুটি দৃশ্য বেশ মন মাতায়। জগমোহনের দক্ষিণ দ্বারের কাছে আছে শিবের বিবাহ দৃশ্য। 'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন'। শিল্পীর সূক্ষ্ম রস জ্ঞান লক্ষ্য করার মত—

শিবের মাথায় তিনি টোপর পবিয়েছেন, ওদিকে ভোলানাথ যে দিগম্বরই রয়ে গেছেন সে খেয়াল তাঁর নেই। পার্বতীকে অগ্রির কাছে অগ্রসর হতে দেখছি। ব্রহ্মাও উপস্থিত। অন্যান্য দেবতা-দেরও সনাক্ত করা যায় তাঁদের আয়ুধ এবং বাহন দেখে। দুঃখের কথা পুরাতত্ত্ব বিভাগ অথবা মন্দিব কর্তৃপক্ষ মেরামতেব নামে আধুনিক

চিত্র—৩১ ॥ গোপাল, নন্দ যশোদা, লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বব।

রঙ মাখিয়ে মূর্তিগুলিকে সঙ সাজিযেছেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্যানেলটি দেখতে পাবেন বিমানের দক্ষিণ প্রান্তদেশে। মা যশোদা দধি মন্থন করছেন—যশোদার অঞ্চল হাওয়ায উডছে, নন্দ বসে আছেন গালে হাত দিয়ে সম্মুখস্থ দু-চালা কুঁড়েঘরে। আর

দিগম্বর বালকৃষ্ণ কলসের মধ্যে হাত চুবিয়ে ননী চুরি করে খাচ্ছেন। এই প্যানেলের একটি রেখাচিত্র এখানে দেওয়া গেল। (চিত্র—৩১)

গণ্ডি-অংশে দেখছি রাহাপাগ ভূমি-আমলকে ভাগ করা নয়—ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে—দ্বিতীয় ভূমির সমতলে তিন পার্শ্বদেবতার উপর তিনটি সিংহ মূর্তি। লক্ষ্য করে দেখুন, এই সিংহের সামনের দুপায়ের মধ্যে বাঁ পা মাটিতে এবং ডান পা থাবা-তোলা অবস্থায়। এই জাতীয় অলঙ্করণের নাম ঝাপ্পা-সিংহ। লিঙ্গরাজে এবং পরবর্তী যুগের রেখ-দেউলে এই সমতলে মন্দিরের তিন রাহাপাগে তিনটি ঝাপ্পা-সিংহ দেখতে পাবেন। শুধু মাত্র পূর্বদিকের রাহাপাগে অর্থাৎ জগমোহনের দিকে দেখবেন আরও উঁচুতে—লিঙ্গরাজের ক্ষেত্রে সপ্তম ভূমি-আমলকের সমতলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি সিংহ মূর্তি। তার পদতলে আছে একটি হস্তী,—দুই থাবা শূন্যে তুলে সে যেন ঝাঁপ দিচ্ছে;—এই অলঙ্করণটির নাম উড়-গজ সিংহ।

গণ্ডি-অংশের রাহাপাগের কথা বলেছি; কোণাপাগ বিভিন্ন ভূমিতে ভাগ করা। লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রত্যেকটি কোণাপাগে সর্বসমেত দশটি ভূমি ও দশটি ভূমি-আমলক আছে। অনুরথ পাগের গঠন বৈচিত্র্য আবার অন্য ধরণের। সেখানে দেখছি চারটি ক্ষুদ্রায়তন রেখ-দেউল মাথায় মাথায় বসানো। প্রতিটি ক্ষুদ্রায়তন রেখ-দেউল স্বয়ংসম্পূর্ণ; এমন কি তাদের রাহাপাগে পার্শ্বদেবতাও আছেন।

বিসম-সমতলে এবার আর বামন নয়—চার কোণাপাগের উপর চারটি সিংহ এবং চার রাহাপাগে চার দেবমূর্তি।

জগমোহনটি পঞ্চরথ পীড় দেউল। এবার দেখছি, চারটি স্তম্ভ আমদানি করা হয়েছে। উড়িষ্যাস্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্তম্ভের অনুপস্থিতি; কিন্তু মন্দিরের আকার বৃদ্ধি করতে করতে লিঙ্গরাজে উপনীত হয়ে এবার বাস্তুবিদ দেখছি স্তম্ভের আমদানি

করতে বাধ্য হয়েছেন। নাটমন্দিরেও চারটি স্তম্ভ আছে, সেটিও পীড় দেউল ; কিন্তু ঘণ্টা-কলস ইত্যাদি সেখানে অনুপস্থিত। তার পরের দেউল ভোগমণ্ডপে কিন্তু আবার ঘণ্টা কলস ইত্যাদি বসানো হয়েছে। জগমোহনেও দেখছি ঝাপ্পা-সিংহ আছে চার প্রান্তে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা সভয়ে নিবেদন করব। সভয়ে বলছি এ জন্য যে, ইতিপূর্বে যে-সব পণ্ডিতেরা কলিঙ্গ-ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন এ বিষয়ে তাঁদের কোন মতামত অন্তত আমার নজরে পড়েনি।

শিল্পী সচরাচর দুনিয়ায় যা দেখেন কল্পনায় তাঁরই উপর রঙ চড়ান এবং শিল্পে তাই ফুটে ওঠে। সাপ, হাতী আর বৃষ তাই ভারতীয় চিত্রে এবং ভাস্কর্যে বারে বারে উপস্থিত হয়েছে। আসীরিয় এবং মিশরী শিল্পীর দল তাই বারে বারে সিংহ মূর্তি রূপায়িত করেছেন —রোমান শিল্পে তাই অশ্বের প্রাবল্য। কলিঙ্গ শিল্পী যখন সাপ আর হাতী নিয়ে মাতামাতি করেন তখন তার কারণটা অনুধাবন করতে পারি ; কিন্তু কলিঙ্গ ভাস্কর্যে সিংহের এত প্রাবল্য কেন ? কলিঙ্গের বাইবে এমনকি গিরনার স্থাপত্যেও কিন্তু এত সিংহ নেই ! ভারতীয় প্রাচীন চিত্রে সিংহ নেই বললেই হয়। অজন্তা, বাঘে সিংহের চিত্র অতি অল্প। তাহলে এখানে এত সিংহ এল কোথা থেকে ? আমার ব্যক্তিগত ধারণা ময়ূর যেমন মৌর্য বংশের প্রতীক, তেমনি কেশরী বংশ কলিঙ্গে সিংহের আমদানি করেন। লক্ষ্য করে দেখছি, প্রাক-কেশরী যুগে—ভরতেশ্বরে, শত্রুঘ্নেশ্বরে, পরশুরামেশ্বরে, বৈতালে সিংহ মূর্তি নাই ; কিন্তু কেশরী বংশের আগমনের পরেই এল ঝাপ্পা সিংহ এবং উড়-গজ সিংহ। এই প্রসঙ্গে আরও মনে হয় ভৌমকরদের প্রতীক কি হাতী ? না হলে হস্তীকে কেন বারে বারে দেখছি সিংহের দ্বারা পরাস্ত হতে ? নাকি হস্তী বৌদ্ধধর্মের প্রতীক এবং সিংহ কেশরী বংশের চিহ্ন ? তাই কি হাতীর উপর সিংহের এই পরিকল্পনা উড়-গজ সিংহের মূর্তিতে ?

অনন্ত বাসুদেব : অনন্ত বাসুদেব মন্দিরটি ভুবনেশ্বরে অবস্থিত একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু মন্দির—উপাস্য দেবতা হচ্ছেন তিনজন, পুরী মন্দিরের সেই চিরন্তন ত্রয়ী। বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই মন্দিরটিতেও দেখছি চারটি অংশ—বড়দেউল,

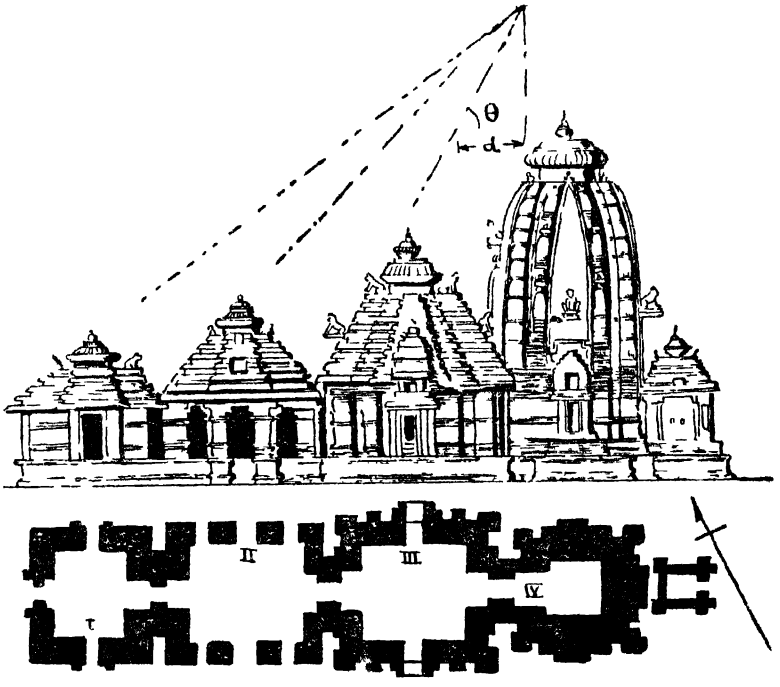

চিত্র—৩২ ॥ অনন্ত বাসুদেব

I — ভোগমণ্ডপ III — জগমোহন
II — নাটমন্দির IV — বিমান (বড় দেউল)

জগমোহন, নাটমন্দির এবং ভোগমণ্ডপ। অনেকে বলেছেন এটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের অন্ধ অনুকরণ ; কিন্তু আমার তা মোটেই মনে হয়নি। লিঙ্গরাজ নিঃসন্দেহে ভুবনেশ্বর মন্দির-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শেষ কথা। কিন্তু অনন্ত বাসুদেব তার অন্ধ অনুকরণ নয়। মন্দিরের

বিভিন্ন অংশের ভাগ ও অলঙ্করণে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নেই। লিঙ্গরাজ মন্দিরের রেখ-চিত্র আমরা (চিত্র—১৮) তে সংযোজিত করেছিলাম। লিঙ্গবাজ দেউলের বর্ণনার সঙ্গে অনন্ত বাসুদেবের দেউল চিত্রটি (চিত্র—৩২) মিলিয়ে দেখলে মনে হবে পরিকল্পনা বুঝি একই ধরনের।

পার্থক্যটা সেখানে নয়। পার্থক্য—চারটি মন্দিরের গণ্ডি-অংশের পরিকল্পনায়। লিঙ্গরাজে ভোগমণ্ডপেব অপেক্ষা নাটমন্দির উচ্চতায় কম; কিন্তু এখানে ক্রমান্বয়ে উচ্চতা বেড়েই গেছে। পীড়-দেউল আলোচনাকালে বলেছিলাম যে তার গণ্ডি আসলে একটি পিবামিডের কর্তৃতাংশ। এখন পিবামিডের আকার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। পিবামিডের পাদমূলের (base) আপেক্ষিকে উচ্চতাকে কমিয়ে বাড়িয়ে আকারটা চ্যাপ্টা বা সূচালো করা যায়। তার ফলে পীড় দেউলের প্রান্তভাগের রেখাটি জমির সঙ্গে কম থেকে বেশী কোণ বচনা করবে। অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরে লক্ষ্য করে দেখুন, পবপর তিনটি পীড় দেউলে ঐ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে উচ্চতাব এমন সুন্দর অনুপাত করা হয়েছে যে চারটে মন্দির মিলিয়ে ভারী মনোরম একটা ছন্দ রচিত হয়েছে। ঐ সুসম-ছন্দেব মূল কোথায় তা জানি না—কিন্তু এমন নয়নাভিরাম ছন্দ ভুবনেশ্বরেব অন্য কোনও মন্দিবে, এমন কি লিঙ্গরাজেও দেখেনি। তবু বাস্তুবিদ হিসাবে ঐ সুসম-ছন্দের মূলসূত্রটা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত যেন তৃপ্তি পাইনি। পীড়-দেউল তিনটির পার্শ্বরেখা উর্ধ্বদেশে বর্ধিত করে সে ছন্দের মূলটির সন্ধান আমি পেয়েছি—দেখেছি প্রতিটি রেখাই একই বিন্দুতে এসে মিশেছে; এবং আকাশে অবস্থিত সেই বিন্দুটির এমন অবস্থান যে, সেখান থেকে ভূমির উপর একটি লম্ব টানলে তা রেখ-দেউলের গণ্ডি-সমাপ্তি সূচিত করে। অঙ্ক শাস্ত্র অনুযায়ী বললে পারি ঐ সুসম-ছন্দের মূলসূত্রটি হচ্ছে $d \tan (-) = k$, যেখানে d হচ্ছে গর্ভগৃহ থেকে পীড় দেউল-প্রান্তের

দূরত্ব, (-) হচ্ছে পিরামিডের ঢাল—অর্থাৎ ভূমি-রেখার সঙ্গে সেটি যে কোণ রচনা করছে এবং k হচ্ছে একটি ধ্রুবক।

প্রসঙ্গত বলি, রাজারানী মন্দিরে জগমোহন ছাড়া অন্য পীড়-দেউল নেই। সেখানেও পীড় দেউলের প্রান্তরেখা বর্ধিত করলে দেখছি রেখ-দেউল যে বিসমে শেষ হয়েছে সেইখানে এসে মিশছে (চিত্র—১৯)। লিঙ্গরাজে এমন কোন ছন্দ পাই না। তাই অনন্ত বাসুদেবকে লিঙ্গরাজের অন্ধ অনুকরণ বলতে আমার আপত্তি। কলিঙ্গ-স্থপতির দল নিশ্চয়ই লিঙ্গরাজে থেমে থাকেননি। পরবর্তী যুগেও নূতন পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন—না হলে আরও পরবর্তী কালে কোনার্ক মন্দির লিঙ্গরাজকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না।

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শন শেষ করেছি—দেখতে যাচ্ছি কোনার্কের সূর্যমন্দির। কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এই দুই উৎকৃষ্টতম উদাহরণের মাঝখানে কালানুক্রমিকভাবে এসে পড়বে—পুরীর জগন্নাথের মন্দির। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শুধুমাত্র স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মূল্যায়নে পূর্বোক্ত দুটি দেব-দেউলের সঙ্গে পুরীর মন্দিরের কোন তুলনাই চলে না। একমাত্র সাদৃশ্য তার আয়তনে। পুরীর মন্দিরও প্রকাণ্ড কিন্তু কী স্থাপত্য চিন্তায়, কী ভাস্কর্য-সম্পদে লিঙ্গরাজ অথবা কোনার্ক মন্দিরের সঙ্গে পুরীর মন্দিরকে এক সারিতে বসানো চলে না। ভাবতে অবাক লাগে, ভুবনেশ্বর মন্দিরের পরে যাদের হাতে পুরী-মন্দির তৈরী হল সেই স্থবক্ষয়ী শিল্পীর দল আবার কেমন করে তারও পরে কোনার্কের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু একটা কথা: স্থাপত্য ও ভাস্কর্যই জীবনের সব কিছু নয়। পুরীর মন্দিরের মহিমা তার আয়তনে নয়, স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে নয়—তার মহিমা অন্যত্র। জগন্নাথ মন্দির উড়িষ্যা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

গুণ-কর্মের বিভাগ করে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম জাতিভেদের আয়োজন করেছিল অতীতযুগে সেই ব্রাহ্মণ্যধর্মই একদিন ডুবতে বসেছিল

জাত্যাভিমানের সঙ্কীর্ণতায়। অসীম শক্তিধর যুগাবতারেরা বারে বারে এর কুফলের দিকে হিন্দুজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—আমাদের নাড়া দিতে চেয়েছেন; কিন্তু বর্ণহিন্দু কিছুতেই তার গোঁড়ামিকে ত্যাগ করেনি। কবীর-দাদু-শ্রীচৈতন্য-গুরুনানক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ গান্ধীজী পর্যন্ত যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যে গোঁড়ামিকে তাড়াতে পারেননি জগন্নাথ নিজ মহিমায় তা সম্ভবপর করেছেন। শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই—মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না—জল-অচল জাতের হাত থেকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অনায়াসে মহাপ্রসাদ নিয়ে ভক্ষণ করেন। আসমুদ্র হিমাচলের সহস্রাব্দি-সঞ্চিত অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শ্রীক্ষেত্রের এই যে প্রতিবাদ এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন কিছু তো ভারতবর্ষে আর দেখি না।

পুরীর জগন্নাথের মন্দির: পুরীর বর্তমান মন্দিরের বয়স বেশী নয়, সেটি একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। গঙ্গা বংশের চোরবর্মাকৃত মন্দির; কিন্তু শাস্ত্র একথাও বলেছেন যে চোরগঙ্গা এ মন্দির প্রথম নির্মাণ করেননি:

প্রসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতিঃ কো নাম কর্তুংক্ষম।
স্তস্যেত্যাদ্য নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেয় গঙ্গেশ্বরঃ॥[১]

বলেছেন, পুরুষোত্তমের এই দেব-দেউলের সংস্কারকার্য যা পূর্ববর্তী রাজন্যবর্গ উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন গঙ্গেশ্বর সেই সংস্কারকার্যই করেছেন মাত্র। শাস্ত্রের অনুশাসন ছাড়াও সে কথা আমরা মানতে বাধ্য। নীলাচলের মহিমা মহাভারতে আছে, বহু প্রাচীন শাস্ত্রে আছে, যা চোরগঙ্গার সিংহাসন আরোহণের অন্ততঃ হাজার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান পুরীতে নীলাচল নেই—অর্থাৎ পাহাড় নেই; কিন্তু পুরীর মন্দিরটি সংলগ্ন ভূভাগের অপেক্ষা অনেক উঁচুতে। যেন ছোট একটি পাহাড়ের উপরে উঠে আসতে হয়। ফার্গুসন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন হয়তো পুরীই সেই দন্তপুর, যেখানে

১) Journal of A. S. B. Vol. LXVII, Part I (1898).

কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম-শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের শ্ব-দন্তের উপর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর মতের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নেই। শ্রীক্ষেত্রেও জাতিভেদ নেই। ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র স্থান যেখানে অন্ন উচ্ছিষ্ট হয় না! হীনযানী বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা করতেন না—তাঁরা গৌতম বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ কখনও করেনি—জগন্নাথ দেবের মূর্তিও কি তাই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত? বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ত্রি-রত্নে ধৃত—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।' পুরী মন্দিরেও পাশাপাশি তিন রত্ন! বলরাম—সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণ। হীনযানী বৌদ্ধরা সংযমী সন্ন্যাসী ছিলেন—স্ত্রী দেবতা বা শক্তির পরিকল্পনা পরবর্তী মহাযানী যুগের। তাই কি পুরী মন্দিরের পরিকল্পনায় রাধা পরিত্যক্ত? শুধু ভাই বোনের সমাহার? এ ছাড়া 'ধৃ' ধাতু থেকে এসেছে, অর্থাৎ ধারণ করেন বলেই বোধহয় সংস্কৃত 'ধর্ম' এবং পালি 'ধম্মে'র স্ত্রীরূপই কল্পনা করেছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা। অথচ 'বুদ্ধ' এবং 'সঙ্ঘ' পুংলিঙ্গ শব্দ। আশ্চর্যের কথা, জগন্নাথদেবের মন্দিরে মধ্যস্থিত 'ধম্মে'র প্রতীক সুভদ্রাদেবীই স্ত্রীলোক—দুই পাশে পুরুষ। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের সঙ্গেও হয়তো বৌদ্ধ ধর্মের কিছু সম্পর্ক আছে। ফা-হিয়ান তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মধ্য এশিয়ার খোটানে এক রথযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন, "শহর থেকে তিন অথবা চার লি দূরে নগরবাসীরা একটি চার-চাকার রথ নিয়ে এল; উচ্চতায় সেটি ৩০ হাত।...মূল বিগ্রহকে কেন্দ্রস্থলে বসান হল এবং তাঁর দুই পাশে বসান হল দুই বোধিসত্ত্বকে।" সিংহলে বুদ্ধদেবের শ্ব-দন্ত—যা নাকি এই দন্তপুর থেকেই সমুদ্রপারের দেশে চলে গেছে—নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল আজও রথযাত্রা উৎসব করেন।

জগন্নাথদেবের মূর্তি কেন অসমাপ্ত রয়ে গেছে সে কাহিনী সকলেই জানেন। রানী গুণ্ডিচা দেবীর নির্বন্ধাতিশয্যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন

আর ধৈর্য না ধরতে পেরে মূর্তি-নির্মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করে মন্দিরের দ্বার খুলে দেখেছিলেন। ফলে—'দারুভূত জগন্নাথ!' এ কাহিনী যে প্রাচীন ওড়িয়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সেই শ্রীমাগুনিয়া দাসের কিছুটা উদ্ধৃতি দিই, সেখানেও দেখা যায়—সাকার বুদ্ধদেব যেমন স্তূপপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তেমনিভাবেই সাকার জগন্নাথ পিণ্ডবৎ হয়ে যাবার ইঙ্গিত আছে:

"মুই বউদ্ধ রূপহই কলিযুগরে থিবু রহি।
সুবর্ণ হাত গোড়করি গড়াহি দেহ দণ্ডধারি॥
দেখিলে সিংহাসন পরে বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে।
পদ অঙ্গুলি নাহি হাত শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ॥"

সে যাই হোক, বর্তমান পুরী মন্দিরের পরিকল্পনায় দেখছি কলিঙ্গ স্থাপত্যের প্রত্যেকটি শাস্ত্রসম্মত লক্ষণই মেনে চলা হয়েছে। পূবমুখী (এখানেও সেই ৯° দক্ষিণে হেলানো) মন্দিরে পশ্চিম থেকে পূর্বে সাজানো যথাক্রমে দেউল, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগ মণ্ডপ। জগমোহনে চারটি, নাট মন্দিরে ষোলোটি এবং ভোগ মণ্ডপে চারটি স্তম্ভের আমদানী করতে হয়েছে। এই তিনটিই শাস্ত্রসম্মত পীড়-দেউল বা ভদ্র-দেউল। সমস্ত মন্দির চত্বরকে বেষ্টন করে প্রকাণ্ড প্রাচীর ৬৬৫′ × ৬৪০′। প্রাচীরের উচ্চতাও যথেষ্ট, কুড়ি-পঁচিশ ফুট। এই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের ভিতর আবার একটি প্রাচীর। বিভিন্ন মন্দির ও সংলগ্ন বস্তুর পরিচয় (চিত্র—৩৩)-এ দেখান হয়েছে। ধারা-বাহিকভাবে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি:

১) বড় দেউল—উচ্চতা প্রায় ২১৬′। রেখ-দেউল। চতুর্দিকে বহু মূর্তি আছে এমনকি গণ্ডি অংশেও। মূর্তিগুলি ভাস্কর্যের নমুনা হিসাবে নিম্নস্তরের। তাঁদের মহিমা শুধু ভক্তির মূল্যায়নে। তাই বিস্তারিত আলোচনায় বিরত থাকলাম।

২) জগমোহন—পঞ্চরথ পীড়-দেউল।

৩) নাট মন্দির—একরথ পীড়-দেউল। প্রকাণ্ড হল ঘর ৬৮′ ×

৬৮'। দাক্ষিণাত্যের স্তম্ভ-শোভিত নাট মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৪) ভোগ মণ্ডপ—পঞ্চরথ পীড়-দেউল। হলদে রঙের বালি পাথরে নির্মিত, উপরের লালচে রঙ গোলা-রঙ ব্যবহারের জন্য।

৫) মুক্তি মণ্ডপ—জগমোহনের দক্ষিণে ৩৮' × ৩৮' মাপের চতু-

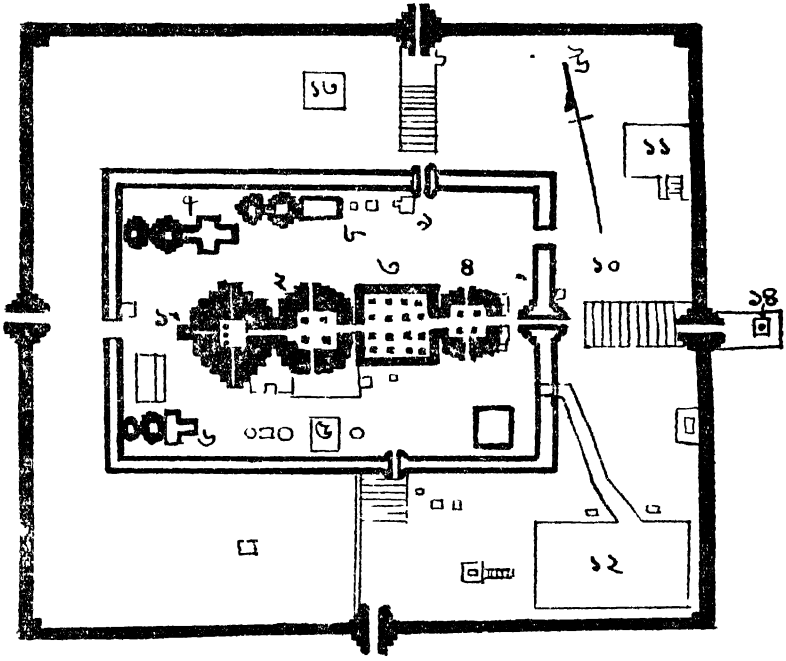

চিত্র—৩৩॥ পুরী-মন্দিরের ভূমি নকশা

১	বিমান	৮	ধর্মবাজ বা সূর্যনারায়ণ
২	জগমোহন	৯	পাতালেশ্বর
৩	নাটমন্দির	১০	আনন্দবাজার
৪	ভোগ মণ্ডপ	১১	স্নানবেদি
৫	মুক্তিমণ্ডপ	১৬	রন্ধনশালা
৬	বিমলা দেবীর মন্দির	১৩	বৈকুণ্ঠ (যাত্রীশালা)
৭	লক্ষ্মীদেবীর মন্দির	১৪	অরুণস্তম্ভ

কোণ হল-ঘর ; ষোলোটি স্তম্ভ। এটি প্রতাপরুদ্রদেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মাণ করান। এখানে পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পাঠ করেন।

৬) বিমলাদেবীর মন্দির—তান্ত্রিক দেবী। মহাষ্টমীতে এখানে ছাগ বলি হয়। এই মন্দিরই একমাত্র স্থান যেখানে শ্রীক্ষেত্রেও বৎসরে একদিন বলিদানের অনুমতি আছে।

৭) লক্ষ্মীদেবীর মন্দির—মহারাজ চোরগঙ্গাকৃত এই মন্দিরটি মূল মন্দিরের সমসাময়িক। এ মন্দিরের নিজস্ব চারটি অঙ্গই আছে, অর্থাৎ দেউল-জগমোহন-নাট-মন্দির-ভোগমণ্ডপ।

৮) ধর্মরাজ অথবা সূর্যনারায়ণ—ভিতরে অষ্টধাতুর সূর্য ও চন্দ্র মূর্তি আছে ; মাঝখানে সূর্যনারায়ণ। পুরাতত্ত্ব-বিভাগ থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে কোনার্কের মূল বিগ্রহটি সম্ভবত পুরী মন্দিরের বিবিঞ্চি মন্দিরে লুক্কায়িত আছে ;—বলা হয়েছে, "মাদলা পঞ্জী মতে (কোনার্কের মূল বিগ্রহ) মূর্তিটি জগন্নাথ মন্দির চত্বরে নীত হয়েছিল। সেই মন্দির চত্বরে অবস্থিত বিরিঞ্চি সূর্যদেবের একটি মূর্তি আছে, যা নাকি পাণ্ডাদের মতে কোনার্ক থেকে আনীত। মন্দিরের মূর্তির পিছনে কষ্টি পাথরের একটি ভাস্কর্য নিদর্শন আছে, উচ্চতায় ১·৮৩ মিটার এবং প্রস্থে ৯১·৫ সে. মি.।···সামনের দুটি হাতই ভেঙ্গে গেছে, মাথার উপরে ত্রিভঙ্গ খিলানে অগ্নিশিখা খোদাই করা, তার উপর কীর্তিমুখ ও ধর্মছত্র।···যদিও শিল্পীর দক্ষতা কোনার্কের পার্শ্বদেবতাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য স্মরণ করিয়ে দেয় তবু মূর্তিটির সামনের বাধা অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে সনাক্ত করা সম্ভবপর নয়।"[১]

---

১) Konark, Archaeological Survey of India —by Smt. Debala Mitra, p. 76.

পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে টর্চের আলোয় যতদূর সম্ভব মূর্তিটি পরীক্ষা করলাম। শুধুমাত্র বাম অঙ্গই দেখা যাচ্ছে। রত্নোপবীত, মুকুট, কর্ণাভবণ এবং চামর-ধারিনী-দের দেখা যায়। পদতলে অরুণ অথবা সপ্তাশ্ব আছে কিনা বোঝা যায় না; পায়েব বুট জুতো এবং হাতের প্রস্ফুটিত পদ্ম—যেগুলি দেখে সূর্যমূর্তি সনাক্ত করা যাবে তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে আমার মনে হয়েছে এটি সূর্য মূর্তি কিন্তু এও মনে হয়েছে যে এটি কোনার্কের মূল বিগ্রহ নয়। কোনার্কের মূল-দেউলের তিন পাশে যে তিনজন পার্শ্বদেবতা আছেন তাঁদের গঠন পারিপাট্যে অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় আছে। তাছাড়া কোনার্কের মূল দেউলে যে সিংহাসনটি আবিষ্কৃত হয়েছে এ মূর্তিব তুলনায় সেটা আকারে বড়।

৯) পাতালেশ্বব—শিবমন্দিব, ধর্মরাজ মন্দিরের পূর্বদিকে, ভূগর্ভে।

১০) আনন্দ বাজার—যেখানে ভোগ বিতরণ হয।

১১) স্নান বেদি।

১২) রন্ধনশালা।

১৩) বৈকুণ্ঠ—দ্বিতল বাড়ি; বস্তুত ধনীদের যাত্রীশালা।

১৪) অরুণ স্তম্ভ—এই স্তম্ভটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়রা কোনার্ক মন্দির থেকে পুবীতে আনিয়ে পুরী মন্দিরের সিংহদ্বাবের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দিরের অক্ষ রেখা থেকে সামান্য দক্ষিণে সরে বসেছে সেটা।

পুরীর সন্নিকটস্থ অন্যান্য দেব-দেউল,—সাক্ষীগোপাল, সোনার গৌরাঙ্গ, গুণ্ডিচা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণও এ প্রবন্ধের পক্ষে অপরিহার্য নয়। সেগুলির মূল্যও ভক্তির রাজ্যে। পুরীর বিভিন্ন মন্দির ও বিগ্রহের সম্বন্ধে যে সব কাহিনী, উপকথা ইত্যাদি প্রচলিত আছে তাও পাণ্ডাদের কাছে সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজরিত যে-সব স্থান ও চিহ্ন পুরীতে আছে তার সন্ধানও সহজে পাবেন। সেগুলি সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প বস্তুত পুরীর হাওয়ায় ভাসছে। সুতরাং পুরীর বিবরণ এই পর্যন্তই। তবু একটি কথা বলতে চাই; প্রতাপরুদ্র দেবের মায়ের সম্বন্ধে একটি কাহিনী আমি শুনেছি যা গল্পের মত মধুর। সে কাহিনীটি কথা সাহিত্যের রসে অভিষিক্ত করে পরিবেশনের লোভ সামলাতে পারছি না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি কাহিনীটি উৎকলের একটি বিখ্যাত লোকগাথা। শ্রীপুরুষোত্তম দাসের একটি ওড়িয়া কাব্য-গ্রন্থে এ কাহিনীটি পাবেন, পাবেন রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্যগ্রন্থে (শ্রীসুকুমার সেন ও সুনন্দা সেনের টীকাসহ)। আমি যে কাহিনী লোকমুখে শুনেছি তা ঠিক ঐ গল্পটি নয়—কিছু পাঠান্তর আছে। গল্পটাই শুনুন আগে:

প্রতাপরুদ্রদেবের পিতা পুরুষোত্তমদেব তখন কলিঙ্গের সিংহাসনে আসীন। পুরুষোত্তম ছিলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ সুপুরুষ ব্যক্তি। তাঁর সুশাসনে রাজ্যে কারও কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু যেমন হয়ে থাকে—রাজ্যের একমাত্র দুঃখ মহারাজার কোন সন্তান নেই, বংশধর নেই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দোষ কোন বন্ধ্যা রাজমহিষীর নয়, রাজা আদপে বিবাহই করেননি। রাজকার্যে পুরুষোত্তম এত ব্যস্ত যে বিবাহ করার সময় পান না। কিন্তু তা বললে তো চলে না। রাজন্যবর্গের পীড়াপীড়িতে অবশেষে মহারাজ বিবাহে সম্মতি দিলেন। তবু সম্মতি পেলেই তো আর বিবাহ হতে পারে না—সন্ধান আনতে হবে উপযুক্ত পাত্রীর। কলিঙ্গরাজ বিবাহে সম্মতি জানিয়েছেন এ সংবাদ প্রচারিত হতে নানান্ দেশ থেকে রাজসভায় দূতের আমদানী হতে থাকে। এমন সুপাত্রকে কে না চায় জামাই করতে? কিন্তু মহারাজের প্রধান মন্ত্রীর কিছুতেই আর মন ওঠে না। মহামন্ত্রী বৃদ্ধ—মহারাজের পিতার আমল থেকেই তিনি কলিঙ্গরাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্খী। মহারাজকে পুত্রসম স্নেহে মানুষ করেছেন তাঁর পিতৃ

বিয়োগের পর। কন্যাদায়গ্রস্ত পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের দূত যখন এসে মহারাজকে পীড়াপীড়ি করে, তিনি বলেন মহামন্ত্রী যা স্থির করবেন তাই হবে।

তাই হল। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ মহামন্ত্রীই সন্ধান আনলেন উপযুক্ত পাত্রীর। দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চিভরমের মহারাজ নরসিংহদেবের একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আছেন—পদ্মাবতী। পদ্মের মতই তাঁর সৌন্দর্য, সৌরভ। ভাটের মুখে সেই পদ্মাবতীর বর্ণনা শুনে এতদিনে মহারাজ সম্মতি দিলেন। মহামন্ত্রীর আদেশে দূত ছুটল কাঞ্চিরাজ্যে।

কলিঙ্গ রাজ্যে লাগল উৎসবের হাওয়া। তৈরী হল পুষ্পতোরণ, পতাকা উড়ল প্রাসাদ শীর্ষে। আসন্ন বিবাহের সংবাদে দলে দলে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে প্রজাবৃন্দ আসতে থাকে পুরী শহরে।

কিন্তু হঠাৎ এল দুঃসংবাদ। দূত ফিরে এসেছে। কাঞ্চিরাজ এ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কলিঙ্গরাজের হস্তে কন্যা সম্প্রদানে তিনি অসম্মত।

ক্রোধে জ্বলে উঠলেন পুরুষোত্তমদেব, বললেন—হেতু?

দূত মাথা নিচু করে বললে—মার্জনা করবেন মহারাজ, সে-কথা আমি বলতে পারব না।

ক্রোধে আত্মজ্ঞান হারিয়ে চীৎকার করে ওঠেন মহারাজ—বলতে তোমাকে হবেই, আমি অভয় দিচ্ছি—বল, কেন অস্বীকার করেছেন।

দূত অস্ফুটে বললে—সে কথা আপনাকে জনান্তিকে নিবেদন করব মহারাজ। প্রকাশ্য দরবারে সে-কথা বলা চলে না।

মহামন্ত্রী বললেন—বেশ তাই হোক। আপনি সভাসমাপ্তি ঘোষণা করুন মহারাজ।

পিতৃতুল্য মহামন্ত্রীর অনুরোধ মানেই আদেশ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে মহারাজ শিরশ্চালন করে বললেন—তা হয় না। এ বিবাহ কোন সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র নয়—এ রাষ্ট্রনৈতিক মিলন। সে মিলনে

বাধা কোথায় তা জানার অধিকার অমাত্যদের আছে। দূত, তুমি নির্ভয়ে সব কথা খুলে বল।

অগত্যা অপ্রিয় কাজটি দূতকে করতে হল। বিস্তারিতভাবে সে বর্ণনা দিল। কাঞ্চিরাজ নরসিংহদেবের সে উচ্চহাস্য দূতের কানে যে তখনও বাজছে। নরসিংহদেব প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন—এ তুমি কী অসম্ভব কথা বলছ হে দূত। আমার কন্যা ক্ষত্রিয় তনয়া। ঝাড়ুদারের সঙ্গে তার বিবাহ দেব? শুনেছি তোমার রাজা প্রকাশ্যে রাজপথ ঝাড়ু দেন!

মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিল দূত।

পুরুষোত্তমদেব কিন্তু মাথা খাড়া রেখেই বললেন—উত্তম! কাঞ্চিরাজকে এর প্রতিফল পেতে হবে। হ্যাঁ, আমি প্রকাশ্যে রাজপথে সমার্জ্জনী চালনা করি—৺জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করি সে সৌভাগ্য যেন আমার বংশে চিরকাল থাকে। সেনাপতি আপনি সৈন্য সমাবেশ করুন—কাঞ্চিরাজ্য আক্রমণ করব আমরা। অমাত্যবর্গ, আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না—প্রকাশ্য সভায় আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কাঞ্চিরাজের সেই দর্পিতা কন্যাকে আমি অপহরণ করে আনব এবং এ রাজ্যের এক সত্যিকারের ঝাড়ুদারেব সঙ্গে তার বিবাহ দেব। যদি না পারি আমি জীবনে বিবাহ করব না!

মহামন্ত্রী হাহাকার করে ওঠেন—এ আপনি কী করলেন মহারাজ!

কিন্তু রাজপ্রতিজ্ঞার তো নড়চড় হতে পারে না। অনতিবিলম্বেই কলিঙ্গরাজের ঝটিকাবাহিনী বিধ্বস্ত করে দিল কাঞ্চিরাজ্য। নিরুপায় কাঞ্চিরাজ নরসিংহ বহু উপঢৌকন দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। কন্যা সম্প্রদানেও আর আপত্তি রইল না। সন্ধি হল। পাল্কীতে করে পদ্মাবতীকে নিয়ে আসা হল কলিঙ্গরাজের সমর শিবিরে কিন্তু এবার আপত্তি করলেন স্বয়ং মহারাজ পুরুষোত্তমদেব। বললেন, অমাত্যবর্গের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—এ কন্যাকে আমি বিবাহ করতে পারি না। মহামন্ত্রী, এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ।

একটি সত্যিকারের ঝাড়ুদারের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ আপনাকে দিতে হবে।

সাশ্রুলোচনে মহামন্ত্রী বলে ওঠেন—এ কী বলছেন মহারাজ—এ কন্যা যে সত্যই পদ্মিনীকন্যা—আমি এ কাজ কেমন করে করব? আমি যে দেখেছি পদ্মাবতীমাকে।

পল্যঙ্কিকার আবরণ উন্মোচন করে মহামন্ত্রী বললেন—এ মায়ের এতবড় সর্বনাশ আমি কেমন করে করব মহারাজ?

কিংখাবের পর্দা সরিয়ে পল্যঙ্কিকা থেকে নেমে এলেন রাজকন্যা। নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন মহারাজকে, বললেন—আমি আপনার শরণাগতা!

শিউরে উঠলেন মহারাজ! এ যে সত্যই দেবকন্যা! অপাপবিদ্ধ এ সরলা বালিকার কী অপরাধ? তবু রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে এই অনাঘ্রাতা তরুণীটিই আজ বলি হতে বসেছে! সমরবিজয়ের সমস্ত আনন্দ নিঃশেষে হারিয়ে গেল মহারাজের অন্তর থেকে—একটা হাহাকারের আর্তক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়তে চাইল সে পাষাণ হৃদয়। বিনাবাক্যে স্থানত্যাগ করলেন তিনি।

কলিঙ্গরাজ্যে ফিরে এল বিজয়ীবাহিনী। হস্তীপৃষ্ঠে মহারাজ পুরুষোত্তম চলেছেন সর্বাগ্রে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সুবর্ণখচিত পল্যঙ্কিকা—তাতে বন্দিনী রাজকন্যা। কলিঙ্গ দেশে ফিরে এসে মহামন্ত্রী সভয়ে প্রশ্ন করেন, মহারাজ?

দু-হাতে মুখ ঢেকে পুরুষোত্তমদেব বললেন—ভুলে যাবেন না—আমি রাজা হলেও মানুষ। বারে বারে একই আদেশ দিতে আমাকে বাধ্য করবেন না। সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি, তার অন্যথা হবে না; কিন্তু ইতিমধ্যে আমার অন্তরে একটা প্রবল ঝটিকার সঞ্চার হয়েছে—তাই কালবিলম্ব করতে সাহস পাই না। আগামীকাল সন্ধ্যাতেই রাজকন্যার সঙ্গে এ রাজ্যের কোনও ঝাড়ুদারের বিবাহের ব্যবস্থা করুন!

বিনা বাক্যব্যয়ে মহামন্ত্রী নতমস্তকে চলে গেলেন, নিজ আবাসে। বৃদ্ধ মন্ত্রীর গৃহেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল রাজকন্যাকে!

রাত্রি প্রভাতে কিন্তু একটি অদ্ভুত সংবাদ শোনা গেল। মহামন্ত্রী এবং রাজকন্যা নিরুদ্দেশ! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহারাজ পুরুষোত্তম। বৃদ্ধ মহামন্ত্রীর এভাবে মতিছিন্ন হল? কিন্তু না, তিনি ক্ষত্রিয় রাজা—এর প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে। রাজাদেশে গুপ্তচরের দল সমস্ত কলিঙ্গ রাজ্যে তল্লাসী শুরু করে। কিন্তু আশ্চর্য, বৃদ্ধ মহামন্ত্রী এবং রাজকন্যা পদ্মাবতী যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন!

মহামন্ত্রীর সন্ধান অবশ্য শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন পুরুষোত্তমদেব, বিচিত্র পরিবেশে। তিন মাস পরে। রথযাত্রার পুণ্য দিনে। লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর ভীড় হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে। রথের উপর বিগ্রহ স্থাপন করার আয়োজন হচ্ছে। প্রধান পুরোহিত মন্দিরদ্বার উন্মোচন করে দিলেন। কলিঙ্গের মহামহিম অধিপতি পুরুষোত্তম-দেব স্বর্ণ সম্মার্জনী হস্তে এগিয়ে এলেন সামনে। দেবতা যে পথ দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবেন সে পথ মহারাজ স্বয়ং সাফা করে দেন। এই ওঁদের বংশের প্রচলিত রীতি—বংশানুক্রমিকভাবে এই পবিত্র কাজ করার সম্মানলাভ করে আসছেন গঙ্গাবংশের রাজন্যবর্গ। মহারাজ স্বর্ণ-সম্মার্জনী চালিত করে রাজপথ পরিষ্কার করে সবে মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন অমনি জনতার একাংশ ভেদ করে এগিয়ে এলেন একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, বললেন—মহারাজ! এতদিনে আমার আরব্ধ কাজ শেষ হল।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত লোচনে মহারাজ দেখলেন ধূলিমলিন চীর-বসনাবৃত পলিতকেশ বৃদ্ধ আর কেউ নয় তাঁরই নিরুদ্দিষ্ট মহামন্ত্রী। চমকে উঠলেন মহারাজ—বৃদ্ধ কি বিকৃতমস্তিষ্ক? তবু প্রশ্ন করেন—কী আপনার আরব্ধ কাজ?

—বহুদিন পূর্বে রাজাদেশ পেয়েছিলাম, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ঝাড়ুদারের

সঙ্গে কাঞ্চিরাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ দিতে হবে। তাই দীর্ঘদিন অজ্ঞাতবাস করেছি। লক্ষাধিক দর্শক আজ সাক্ষী—মহারাজ পুরুষোত্তমদেবও একজন ঝাড়ুদার। তাই তাঁরই হস্তে সমর্পণ করলাম এই আমার গচ্ছিত ধন!

পার্শ্ববর্তী অবগুণ্ঠণাবৃতা রাজকন্যার ওড়না খুলে দিয়ে সর্বসম্মুখে মহারাজের করে সমর্পণ করলেন তার করপদ্ম!

লক্ষাধিক কণ্ঠের আনন্দ উচ্ছ্বাসে শোনা গেল মহামন্ত্রীর সে কার্যের সমর্থন! জয় মহারাজ পুরুষোত্তমদেব, জয় মহারাণী পদ্মাবতী! জয় জগন্নাথ!

এই পুরুষোত্তমদেব এবং পদ্মাবতীর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব অমর হয়ে আছেন বৈষ্ণব সাহিত্যে। নীলাচলে মহাপ্রভুর অসংখ্য কাহিনীতে!

কাহিনীর প্লাবনে আমরা কোনার্ক তীর্থপথ থেকে অনেকটা সরে এসেছি। এবার সেই কোনার্ক-মন্দির আমাদের দ্রষ্টব্য।

কোনার্কের সূর্যমন্দিরঃ কোনার্কের সূর্যমন্দির নিঃসন্দেহে কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। কী পরিকল্পনা, কী বিরাটত্ব, কী সূক্ষ্ম কারিগরী! এ স্থাপত্য বিস্ময়ের সম্মুখে আপনিই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কলিঙ্গের মন্দির-বিবর্তনের পূর্ণাহুতি হয়েছিল ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজে—তারপর পুরী মন্দিরে অবক্ষয়ী শিল্পীদের হাতের কাজ দেখে ক্ষুব্ধই হতে হয়; কিন্তু তারও পরে কেমন করে সেই শিল্পীদলের উত্তরসূরীরা এই মন্দিরের পরিকল্পনা করলেন ভেবে কোন কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

কোনার্কের পরিকল্পনাকার কলিঙ্গ-ঐতিহ্য মোটামুটি মেনে চলেছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনের মত করে সাজিয়েছেন তাঁর কীর্তিকে। লিঙ্গরাজ-অনন্তবাসুদেব-জগন্নাথে যে বাঁধা ফর্মূলা দেখেছি কোনার্ক পরিকল্পনাকার তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। নাট-মন্দিরকে তিনি বাদ দিয়েছেন এবং দেউল ও

জগমোহনকে সম্মিলিতভাবে একটি য়ুনিট বলে ধরেছেন। সেই সম্মিলিত স্থাপত্য-কর্ম একটি রথের রূপ নিয়েছে। মূল বিগ্রহ হচ্ছেন সূর্যদেব—উদয়াচল থেকে নিত্য তাঁর যাত্রা অস্তাচলের দিকে। ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, ব্যতিক্রম নেই —চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত মহা-তেজস্বী মার্তণ্ডদেব সৃষ্টির আদি থেকে শেষ মহাপ্রলয় পর্যন্ত ঐ চলার ছন্দে বাঁধা। উপনিষদকার যাঁর সম্মুখে যুক্তকরে বলেছিলেন, 'কর কর অপাবৃত হে পূষণ, আলোক আবরণ' সেই রথারূঢ় ভাস্কর হচ্ছেন এ মন্দিরের উপাস্য দেবতা। তাই কোনার্ক মন্দিরের পরিকল্পনাকার মন্দির গড়তে গিয়ে রথ গড়েছেন। রথের দুটি অংশ—মূল অংশ যেখানে বসেন রথী, এখানে সেখানে সেটি বড়-দেউল; কিন্তু রথীর সম্মুখে অপর একটি আসন চাই, যেখানে বসবেন সারথী, এখানে সেটি জগমোহন। এই মিলিত দেউল-জগমোহন যে সূর্যের স্বর্গীয় রথ তাতে সাতটি অশ্ব। সপ্তাহের সাত বার; তাই রথের সম্মুখভাগে দেখছি সাতটি অশ্ব। সে রথে এক এক দিকে দ্বাদশটি চক্র; সব-সমেত চব্বিশটি চক্র। এক একটি চক্র এক এক পক্ষকাল, প্রতি জোড়া চক্রে যেন এক মাস। এই প্রকাণ্ড রথটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩২০ ফুট, প্রস্থে বিস্তৃততম অংশে ১০০ ফুট এবং জগমোহনের উচ্চতা যা পাচ্ছি তা ১২৮ ফুট—মূল মন্দিরটি ছিল অন্তত ২২০ ফুট। সূর্য-দেবের উপযুক্ত রথ বটে!

এই বিজন প্রান্তরে এত বড় একটা প্রকাণ্ড মন্দির এমন সুন্দর ভাবে কে করেছিলেন, কেন করেছিলেন ঠিক জানি না। এ তীর্থ-স্থানের মাহাত্ম্যই বা কি? ইতিহাস কিছু বলে, কিছু বলে শাস্ত্র, কিছু আছে কিম্বদন্তীতে—একমাত্র মহাকালই হয়তো জানেন এর প্রকৃত ইতিহাস! এই স্থাপত্য-বিস্ময়ের সামনে দাঁড়িয়ে কোন কিছুকেই আর অবিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। সব খুঁটিয়ে জানতে ইচ্ছে করে। জবাব আমি জানি না, যেটুকু জেনেছি লিপিবদ্ধ করি —তারপর আপনাদের মন যা বলে তাই মেনে নেবেন।

প্রথমেই কিম্বদন্তীর কথা। সে লোকগাথার পিছনে অবশ্য আছে কপিল-সংহিতা, মাদলা পঞ্জী এবং প্রাচী-মাহাত্ম্যের দেবনাগরী হরফের অনুমোদন। পুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। সে জন্য তাঁর এবং শাম্বপত্নী জাম্ববতীর অত্যন্ত অহঙ্কার ছিল। নারদমুনি কোন কালেই সুন্দর নন দেখতে। একদিন শাম্ব সর্বসমক্ষে নারদ-মুনির দাড়ি অথবা ভুঁড়ি নিয়ে কি একটা রসালো ইঙ্গিত করেছিলেন। নারদ-মুনিকে নিশ্চয়ই আপনাদের চিনতে বাকি নেই। নারায়ণভক্ত নারদ চটে গেলে আর রক্ষে নেই —তাঁর মাথায় খেলে নানান্ ফন্দি। মনে মনে চটে গেলেও মুখে হাসিটি বজায় রেখে তিনি বললেন—কুমার শাম্ব, তোমার ধারণা তুমি অত্যন্ত সুপুরুষ—স্ত্রীলোক মাত্রেই তোমার রূপে মুগ্ধ হবে, কিন্তু আমি তোমাকে এমন স্ত্রীরাজ্যে নিয়ে যেতে পারি যেখানে কেউ তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না।

কৌতূহল হল শাম্বের। বললেন, বেশ দেখাই যাক পরখ করে।

নারদ সুকৌশলে শাম্বকে নিয়ে এলেন এক সরোবরে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ষোড়শ গোপিনী স্নান করছেন। শাম্বের রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন গোপিনীরা, শাম্বও ভুলে গেলেন নারদের উপস্থিতি। নারদ এই সুযোগই খুঁজছিলেন—তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এলেন অকুস্থলে। পিতৃদেবকে দেখে সংযত হলেন শাম্ব; তিনি তখনও জানতেন না স্নানার্থিনীরা তার বিমাতা।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সে কথা বোধকরি বিশ্বাস করেননি। পুত্রের অশালীন ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি অভিসম্পাত দিলেন—শাম্বের অনিন্দ্যকান্তি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। কঠিন কুষ্ঠরোগে সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। অনন্যোপায় শাম্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব শুরু করলেন। ক্রোধ প্রশমিত হলে কৃষ্ণও বুঝতে পারলেন শাম্ব সজ্ঞানে পাপ করেনি, তাই তুষ্ট হয়ে বললেন—তুমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে মিত্র

বনে গিয়ে সূর্যের উপাসনা কর। একমাত্র তিনিই পারবেন তোমাকে রোগমুক্ত করতে।

অনুজ্ঞা অনুসারে শাম্ব এলেন চন্দ্রভাগা নদী তীরে। দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল সূর্যোপাসনা করে তিনি রোগমুক্ত হলেন। দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে শাম্ব সূর্যদেবের একটি মন্দির তৈরী করে দেবেন স্থির করলেন। ঘটনাচক্রে চন্দ্রভাগা নদীতেই স্নানকালে তিনি সূর্যদেবের একটি অপূর্ব মূর্তি আবিষ্কার করেন, যে মূর্তি তৈরী করেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। শাম্ব সেই মূর্তিটিরই প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রভাগা নদীতীরে কোনার্ক-তীর্থে। স্থানীয় ব্রাহ্মণ পূজারীগণ সূর্যপূজার মন্ত্র জানত না বলে কুমার শাম্ব উত্তরখণ্ড থেকে মাঘ-বংশীয়[১] কিছু পুরোহিত নিয়ে এসে দেবপূজার ব্যবস্থাও করলেন।

কিংবদন্তী তথা প্রাচীন পুরাণমতে এই হচ্ছে কোনার্ক মন্দিরের ইতিকথা। এবার আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি এ কাহিনীর আদৌ কোন ভিত্তি আছে কি না।

কোনার্ক মন্দিরের অনতিদূরে একটি মরা নদীর মোহনা আছে যার নাম চন্দ্রভাগা। মাঘী শুক্লা-সপ্তমীতে এখনও পুণ্যার্থীর দল ওই নদীর মজে যাওয়া কুণ্ডে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করে মন্দিরে পূজা দিতে আসে। একটি দিনের জন্য সহস্র সহস্র পুণ্যার্থী যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে যায় মন্দির প্রাঙ্গণ; সেদিন আর ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ নেই, ট্র্যানজিস্টারে লারে-লাপ্পা গান শোনা যায় না—একটি দিনের জন্য সমস্ত মন্দির-চত্বরে ধ্বনিত হতে থাকে মন্ত্রঃ 'জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।' কপিল-সংহিতায় এ অর্কক্ষেত্রে আরও অনেক দর্শনীয় তীর্থের উল্লেখ আছে—মৈত্রেয় কানন, শ্রীমঙ্গল বাপী, শ্রীশাল্মলীভাণ্ড, সূর্য-গঙ্গা, সমুদ্র, রামেশ্বর মন্দির এবং সমুদ্রতীরে

১। উত্তরখণ্ডের এই বিজাতীয় পূজারীদের প্রভাবেই সূর্যের পায়ে জুতা দেখি আমরা।

কল্পতরু বৃক্ষ। এগুলির চিহ্নমাত্র বর্তমানে নেই। আছে শুধু সমুদ্র আর সূর্যমন্দিরের ভগ্নাংশ।

মনে হয়, শাম্বের যে মূল-কাহিনীটি পুরাণে পাওয়া যাচ্ছে সেটি কলিঙ্গের সূর্যমন্দির সম্বন্ধে নয়। পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা নদীতীরে আছে শাম্বপুর—আধুনিক মূলতান। সেখানকার বিখ্যাত সূর্যমন্দির, যার বিবরণ পাই হিউ-এন-ৎসাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে—শাস্ত্র সেই সূর্যমন্দিরের উপাখ্যানই বিবৃত করেছেন। কোনার্কের সূর্যমন্দির যাঁরা নির্মাণ করান তাঁরাই সম্ভবত স্থানীয় প্রাচী-নদীর শাখা নদীটির নাম রাখেন চন্দ্রভাগা এবং শাস্ত্রোক্ত কাহিনীর সঙ্গে নাম মিলিয়ে মৈত্রেয়-কানন, কল্পতরু বৃক্ষ ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। নবদ্বীপের নব বৃন্দাবনের মত কোনার্ক হয়ে উঠল নব অর্ক-ক্ষেত্র।

মাদলা পঞ্জী মতে এই অর্ক-ক্ষেত্রে শাম্ব প্রতিষ্ঠিত সূর্যমূর্তির উপর কেশরী বংশের নৃপতি পুরন্দর কেশরী একটি মন্দির নির্মাণ করান এবং আটটি গ্রাম দান করে দেব-বিগ্রহের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। প্রাচী ও চন্দ্রভাগা নদীতীরে তখন এ অঞ্চলে অনেকগুলি সমৃদ্ধ গ্রাম ও জনপদ ছিল। কেশরী বংশের পতনের পর কলিঙ্গে নূতন গঙ্গা রাজবংশের রাজন্যবর্গও এই অর্ক-ক্ষেত্রে বাৎসরিক উৎসবে আগমন করতেন মা ী-শুক্লা সপ্তমীতে—কোনার্কদেবকে পূজা দিতে। মাদলা পঞ্জী বলছেন, রাজা অনঙ্গভীমদেব দেবপূজার বার্ষিকীর অঙ্ক বাড়িয়ে দেন—মঙ্গাদেবী, অষ্ট শম্ভু, অষ্ট চণ্ডী, অরুণ প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার জন্যও বাৎসরিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। অনঙ্গদেবের পরবর্তী গঙ্গারাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয় পুরন্দর কেশরীর পূর্বতন মন্দিরের সম্মুখে নূতন একটি মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁর পাত্র (অমাত্য) শিবসামন্ত রায়কে কোনার্কে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘ-দিনের পরিশ্রমে, বহু স্বর্ণমুদ্রার ব্যয়ে এবং বহু শিল্পীর নিরলস পরিশ্রমে নূতন মন্দির নির্মিত হল—মন্দির তো নয় যেন সূর্যের সপ্তাশ্ব-চালিত স্বর্গীয় রথ। নরসিংহদেব আদিম সূর্য-মন্দির থেকে

প্রাচীন সূর্যমূর্তিটি এনে এই নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন—শিব সামন্ত রায় পাত্রকে দিলেন নূতন খেতাব—'মহাপাত্র'।

মাদলা পঞ্জীর বিবরণকে যাঁরা আদৌ আমল দিতে রাজি নন তাঁদেরও স্বীকার করতে হবে এ তথ্যের সমর্থন আছে ইতিহাসে, আছে স্থাপত্য-নিদর্শনে। নরসিংহদেব (১২৩৮-৬৪) এবং তাঁর বংশধরেরা নানান্ তাম্রশাসনে নরসিংহদেবকেই এ মন্দিরের নির্মাতা বলে বর্ণনা করেছেন। 'ত্রিকোণ-ক্ষেত্রে' উষ্ণরশ্মির (সূর্য) উদ্দেশে একটি 'মহৎ-কুটীরের নির্মাতা' বলে নরসিংহদেব উল্লিখিত হয়েছেন বারে বারে। কোনার্ক মন্দিরের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুশভদ্রা নদীতীরে ত্রিকোণা নামে একটি প্রাচীন জনপদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। কোনার্ক-মন্দিরের চৌহদ্দিতে, বর্তমান মন্দিরের অনতিদূরে—দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীনতম একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। নরসিংহদেবের পুত্রের নাম ছিল 'ভানুদেব'—গঙ্গাবংশে সূর্যের অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে থেকে এই প্রথম একটি নাম বেছে নেওয়া হয়েছিল। ভানুদেবের একটি শিলালিপি আছে সীমাচলমে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত রথোপম এই মন্দিরটির খ্যাতি যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তার প্রমাণ পাই আবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরীতে। প্রায় তিনশ বছর পরে মোঘল-সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) সভাসদ আবুল-ফজল এ মন্দিরের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

"জগন্নাথের অনতিদূরে সূর্যের একটি মন্দির আছে। ঐ রাজ্যের দ্বাদশবর্ষের আয় এই মন্দির নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছিল।[১] যাঁদের সহজে সন্তুষ্ট করা চলে না সেই ধরণের কঠিন বিচারকও এই মন্দিরটি দর্শনে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। প্রাচীরের উচ্চতা ১৫০

১) এই সময়ে কলিঙ্গের বার্ষিক আয় ছিল তিন কোটি টাকা অর্থাৎ আইন-ই-আকবরী মতে কোনার্কের নির্মাণ ব্যয় ৩৬ কোটি টাকা।

হাত, বেদ ১৯ হাত। তিনটি প্রবেশ দ্বার। পূর্বদ্বারে সুনিপুন হাতে গড়া দুটি হস্তীমূর্তি, শুঁড়ে করে তারা প্রত্যেকে জড়িয়ে ধরেছে একজন মানুষকে। পশ্চিমদ্বারে দুটি অশ্ব মূর্তি—সুসজ্জিত এবং সহিস সমন্বিত। উত্তরদ্বারে দুটি ব্যাঘ্র মূর্তি—তারা দুজন পদানত দুটি হস্তীব উপর উল্লম্ফনরত। মন্দির-সন্মুখে কালো পাথরের আটকোণা একটি স্তম্ভ, ১০০ হাত উঁচু। নয়টি ধাপ অতিক্রম করার পর দেখা যাবে একটি প্রশস্ত সভামণ্ডপ, যার খিলানে সূর্যাদি গ্রহের মূর্তি খোদিত। সভামণ্ডপের চতুর্দিকে নানা শ্রেণীর ভক্তের মূর্তি। সকলেই শ্রদ্ধাবিনম্র—তাদের কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তারা হাসছে, কাঁদছে, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অথবা গভীর নিষ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে আছে নানান্ জাতের নর্তকী সঙ্গীতমগ্নার দল অথবা বিচিত্র সব জন্তু জানোয়ার—শিল্পীব কল্পনা ছাড়া যাদের অস্তিত্ব অবাস্তব। শোনা যায় প্রায় ৭৩০ বৎসর পূর্বে রাজা নবসিংহ দেও এই অপূর্ব মন্দিবটি সম্পূর্ণ করেন এবং উত্তরপুরুষদের উদ্দেশ্যে রেখে যান।"

আবুল ফজলের বর্ণনাটি নিষ্ঠাভরে তৈরী করা। দুটি বিষয়ে ভ্রান্তি নজরে পড়ছে। প্রথমতঃ মন্দিরের তিনদিকে মূর্তিগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাব দিক-নির্ণয়ে ভুল হয়েছে। হস্তীমূর্তি ছিল উত্তরদ্বাবে, অশ্বমূর্তি দক্ষিণদ্বারে এবং হস্তীদলনকারী শার্দুলমূর্তিদ্বয় পূর্বদ্বারে। দ্বিতীয়তঃ নরসিংহদেবের সময়কাল ৭৩০ বৎসর পূর্বে নয়, আবুল ফজলের রচনাকালের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে। কেউ কেউ বলেছেন, দুটি কারণে এই ভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। সুদূর আগ্রা থেকে কোনার্ক মন্দিরের নির্মাণকালের সঠিক নির্দেশ পাওয়া আবুল ফজলের পক্ষে সহজ ছিল না, তাছাড়া সময়টা হয়তো তিনি পুরী মন্দিরের পুরোহিতদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁরা মাদলা পঞ্জী-মতে কেশরী বংশের পুরন্দর কেশরীর সময়কালটাই জানিয়েছিলেন।

তবু যেহেতু আইন-ই-আকবরীর রচয়িতা তাঁর সমস্ত বিবরণে অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাই এক কথায় ঐ '৭৩০ বৎসর' সংখ্যাটিকে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। আসুন একটু বিচার করে দেখা যাক।

কোনার্ক-তীর্থের বার্ষিক উৎসব ও মেলা হয় মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিকে। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই মেলা প্রচলিত। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ঐ তিথিতেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পৌরাণিক যুগে। দশ দিকের মধ্যে দক্ষিণ-পূব কোণকে বলা হয় অগ্নিকোণ, যার অধিদেবতা অগ্নি তথা সূয। রাশী চক্রের অগ্নিকোণ হচ্ছে কুম্ভ রাশীর মাঝামাঝি অবস্থান অর্থাৎ কুম্ভের ১৫°। রাশীচক্র প্রদক্ষিণকালে সূযদেব যখন কুম্ভের ১৫° তে অবস্থান করেন তখনই তিনি কোনার্ক। ঐ পুণ্য তিথিতেই কোনার্কের মহাযোগ এবং সম্ভবত সূর্যের ঐ অবস্থান সময়েই মেলার মাহেন্দ্রক্ষণ নির্ধারিত। আমরা কিন্তু বর্তমানে দেখছি সূযদেব যখন কুম্ভরাশীর ১৫° অবস্থান অধিষ্ঠিত তখন মাঘী শুক্লা সপ্তমী নয়। ফাল্গুনমাসে প্রচুর বিয়ের নিমন্ত্রণ পাই, তখন পুরোহিতদের মন্ত্র পড়তে শুনি,—'কুম্ভ রাশীস্থে ভাস্করে ··'। অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রমতে সূর্য বর্তমানে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি কুম্ভরাশীর ১৫°-তে, অগ্নিকোণে থাকছেন। তাহলে ঐ মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিটা এল কোন সুরঙ্গ পথে?

এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখতে গেলে জ্যোতির্বিদ্যার একটি তথ্য আমাদের জেনে নিতে হবে। আমরা জানি, পৃথিবীর অক্ষরেখা সূর্য প্রদক্ষিণপথের তল থেকে ২৩°২৭′ অর্থাৎ প্রায় ২৩½° হেলে আছে। এ থেকেই কল্পিত হয়েছে কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি রেখা—এ জন্যই সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। পৌষ সংক্রান্তিকে বলি মকর-সংক্রান্তি, ঐ-দিন অতিক্রমণে ভাস্করদেব মকররাশীতে প্রবেশ করেন। শাস্ত্র মতে তারপর মাঘে মকররাশী, ফাল্গুনে কুম্ভরাশী, চৈত্রে মীন, বৈশাখে মেষ ইত্যাদি এক এক সৌর মাসে সূর্য এক

এক রাশীতে অবস্থান করেন। এটা সহজ তথ্য—এই ধ্রুব সত্যটি আমরা সকলেই জানি।

এই মাত্র একটা ভুল কথা বললাম। এটা ধ্রুব সত্য নয়। শুধু তাই নয়, 'ধ্রুব সত্য' বলতে আমরা যা বুঝি সেটাও ভুল। 'ধ্রুব সত্য' কাকে বলি? আমরা জানি, পৃথিবীর আহ্নিকগতি যে অক্ষ রেখাকে কেন্দ্র করে সেই কেন্দ্রস্থ অক্ষ রেখাটিকে মহাকাশে বর্ধিত করলে সেটা ধ্রুব নক্ষত্রের গায়ে গিয়ে লাগবে। ফলে অন্যান্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আপাতদৃষ্টিতে যেভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, ধ্রুব নক্ষত্র তা করে না। ঐ গতিহীনতাই 'ধ্রুবর ধ্রুবত্ব'! কিন্তু সেটাও শাশ্বত সত্য নয়। কেন তাই বলি:

একটা ঘূর্ণায়মান লাট্টুর যখন দম ফুরিয়ে আসে তখন সেটা মাতালের মত টল্‌তে থাকে। তার 'আলটা' মাটিতে একটা গোলা-

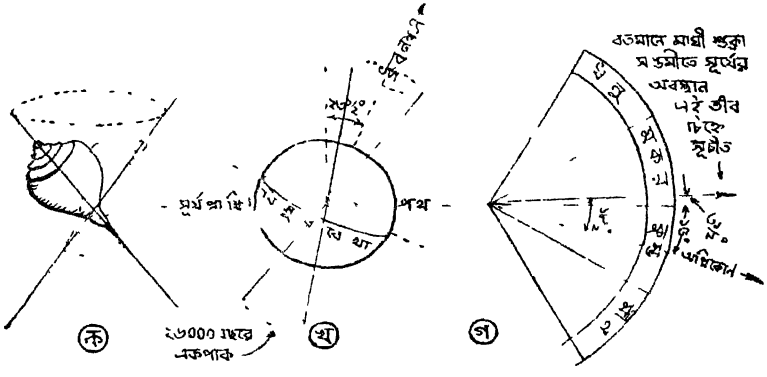

চিত্র—৩৪

কার চক্র রচনা করতে থাকে। অর্থাৎ তার অক্ষ রেখা একটা শঙ্কু (cone) রচনা করতে থাকে (চিত্র—৩৪, ক)। পৃথিবীর অক্ষ রেখাও নিরবধিকাল ঠিক অমনি ভাবে অতি ধীর গতিতে একটি শঙ্কু রচনা করে চলেছে (চিত্র—৩৪, খ)। এ ভাবে পৃথিবীর অক্ষরেখা সম্পূর্ণ এক পাক দেয় দীর্ঘ ২৫,০০০ বছরে।

এর ফলটি মারাত্মক। এতে ধ্রুব নক্ষত্রও তার ধ্রুবত্ব হারিয়ে

ফেলে। বলতে পারি, আজ থেকে দশ-বারো হাজার বছর আগে বর্তমানে যে নক্ষত্রটিকে ধ্রুব নক্ষত্র বলছি সেটিও প্রত্যহ চক্রাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করত অর্থাৎ ধ্রুব নক্ষত্রের উদয় অস্ত হতো। সে যাই হোক, পৃথিবীর অক্ষরেখার এই চক্রাবর্তনের জন্য সূর্য প্রত্যেক বৎসর নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে রাশীচক্রের ঠিক একই স্থানে থাকছে না। অতি ধীরে ধীরে সূর্যদেব রাশীচক্রে পিছিয়ে পড়ছেন। এই পিছিয়ে পড়ার বার্ষিক গতি প্রায় এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগ বা এক মিনিট (১′)। এই তথ্যটির বৈজ্ঞানিক নাম অয়নচলন বা precession of the equinox.।

এবার আমরা কোনার্ক-মেলার প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারি। মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথি ৭ই থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আসে। মলমাস ও লীপ-ইয়ারের সংশোধন করে বলতে পারি, তারিখটা মোটামুটি ১০ই ফেব্রুয়ারী। বর্তমানে হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে দেখছি ১০ই ফেব্রুয়ারী সূর্যের অবস্থান মকর রাশীর ২৬$\frac{১}{২}$° তে। অর্থাৎ কুম্ভের মাঝামাঝি অবস্থিত অগ্নিকোণ থেকে (মকরের ৩$\frac{১}{২}$° এবং কুম্ভের ১৫° একুনে) ১৮$\frac{১}{২}$° সরে গেছে। (চিত্র--৩৪-গ)-তে বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে। যেহেতু সূর্য প্রতি বৎসর $\frac{১}{৬০}$° ডিগ্রি করে পিছিয়ে যাচ্ছেন, তাই ১৮$\frac{১}{২}$° পিছিয়ে যেতে সূর্যের সময় লেগেছে ১৮$\frac{১}{২}$ × ৬০ = ১১১০ বৎসর। অর্থাৎ হিসাবে দাঁড়ালো যে,—যদি ধরে নিই দীর্ঘদিন পূর্বে কোন এক পুণ্য মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সূর্যদেবের অগ্নিকোণে সংক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণে এই মেলার সূচনা হয়েছিল, তাহলে সেদিনটি আজ থেকে ১১১০ বৎসর পূর্বে। সোজা কথায় ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এবার বলি, আইন-ই-আকবরীর রচনাকাল ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। আবুল ফজলের হিসাব যদি নির্ভুল হয় তবে তাঁর রচনাকালের ৭৩০ বৎসর পূর্বে ছিল ৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ!

আমার প্রশ্ন, আবুল ফজলের ঐ '৭৩০ বৎসর' সংখ্যাটি কি সূর্য মূর্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা ও মেলার প্রবর্তন সূচনা করছে?

অধিকাংশ গবেষকই বলছেন—'৭৩০' সংখ্যাটি আবুল-ফজল ভুল করে লিখেছেন। আমি যে প্রশ্নটি তুললাম এর বিচার পুরাতত্ত্ব-বিভাগের কোনও গবেষণা-গ্রন্থে কোথাও কেউ করেছেন কিনা জানি না। এ বিষয়ে কেউ যদি অনুগ্রহ করে আলোকপাত করেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে সেটুকু যোগ করতে পারি।

মূল আইন-ই-আকবরী পড়ার মত ভাষাজ্ঞান আমার নেই। স্যার যদুনাথ সরকারের ইংরাজী অনুবাদে দেখছি লেখা আছে—"It is said that somewhat over 730 years ago, Raja Narasing Deo completed this stupendous fabric and left this mighty memorial to posterity".[১] স্যার যদুনাথের অনুবাদে ভুল থাকতে পারে এ-কথা কল্পনা করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা! কিন্তু অনুবাদটা কি এ-ভাবে হতে পারত—"It is said that Raja Narasing Deo completed this stupendous fabric started somewhat over 730 years ago and left this mighty memorial to posterity"?

স্টার্লিং সাহেবের মতে রাজা লাঙ্গোরা নরসিংহ দেব তাঁর মন্ত্রী সিবাই সৌত্রের তত্ত্বাবধানে এ মন্দির নির্মাণ করান ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে।[২] উইলিয়াম হাণ্টার বলছেন, মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১২৩৭ থেকে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।[৩]

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা সভয়ে নিবেদন করি। সভয়ে বলছি এই কারণে যে, বিষয়টা অনধিকারী বর্তমান গ্রন্থকারের উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার। এ-বিষয়টাও পূর্বাচার্যরা কেউ বিচার করেছেন বলে জানি না। অন্তত আমার নজরে পড়েনি। প্রকৃত অধিকারীর

১) H. S. Jarrett and Jadunath Sarkar, Ain-i-Akbari II, (Cal. 1949) pp. 140 & 141.

২) Asiatic Researches Vol. XV, p. 327.

৩) Hunter's Orissa Vol. II, p. 288.

উদ্দেশ্যে এটিও নিবেদন করে গেলাম। বিষয়টা ভুবনেশ্বরে অবস্থিত মন্দিরগুলির দিক্-নির্ণয় বা 'ওরিয়েন্টেশান্'।

মোটামুটি ভাবে বলা চলে মন্দিরগুলি পূর্বমুখী। তিনটিমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম : পরশুরামেশ্বর আর মুক্তেশ্বর পশ্চিমমুখী এবং কেদারেশ্বর দক্ষিণমুখী। কেদারেশ্বর না হয় ব্যতিক্রম—বাদ বাকি প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মূল অক্ষরেখা তাহলে পূর্ব-পশ্চিম। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখছি, সেগুলি ঠিক পূর্ব-পশ্চিম রেখা বরাবর নয়। ভ্রমণের সময় স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছে জরীপের যন্ত্রপাতি ছিল না, তবু আমার নিত্যসঙ্গী কম্পাস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি অনেকগুলি ক্ষেত্রেই মন্দিরের অক্ষরেখা অতি সামান্যভাবে, মাত্র ৮ থেকে ৯ ডিগ্রি দক্ষিণে সরে গেছে। যথা—সিদ্ধেশ্বর, রাজারানী, জগন্নাথ মন্দির। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে উন্মুক্ত প্রান্তরে পূর্বমুখী মন্দির তৈরী করতে গিয়ে কেন বাস্তুবিদেরা মন্দিরের মুখ সামান্য বাঁকিয়েছেন। নাগর-স্থাপত্যের আদি গুরু বিশ্বকর্মা তাঁর বাস্তু শাস্ত্রে ভূ-পরীক্ষা, কাল-নির্ণয়ের পরেই দিক-নির্ণয়ের প্রসঙ্গে এসেছেন,—অর্থাৎ মন্দিরের মুখ কোন দিকে হবে। ভুবন-প্রদীপেও কালনির্ণয় ও দিক-নির্ণয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তার কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারায় দুর্বোধ্য। শাস্ত্রকারের মতে বনিয়াদের নিচে আছেন বাস্তুনাগ—তিনি ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছেন। গৃহারম্ভের কাল ও দিক-নির্ণয় সেই চক্রাবর্তনের ছন্দে বাঁধতে হবে। কিন্তু বাস্তুবিদেরা তো গৃহারম্ভের কালটা আগিয়ে পিছিয়ে পাশাপাশি মন্দিরগুলিকে সমান্তরাল করতে পারতেন? পর পর তিনটি প্রায় সমসাময়িক মন্দিরের ক্ষেত্রে মন্দিরের মুখ পূব থেকে ৮½° দক্ষিণে সরে গেছে কেন? ভুল এটা কিছুতেই নয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৮০ অব্দে স্টোন হেঞ্জের বাস্তুবিদ যে দিক্-নির্ণয়ে ভুল করেননি, পিরামিডের নির্মাতা যে ভুল করেন নি এঁরা এত পরে সেটা করেছেন এটা অবিশ্বাস্য। তাহলে?

আবার আমরা অয়নচলনের হিসাবটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ২১শে ডিসেম্বর সূর্যোদয় হচ্ছে পূর্ব দিগন্তের ২৩½° দক্ষিণে। ২১শে মার্চ হচ্ছে ঠিক পূর্ব দিকে। সুতরাং ঐকিক নিয়মে পূর্ব দিক থেকে ৮½° দক্ষিণ-ঘেঁষে সূর্যোদয় হবে ১৬ই ফেব্রুয়ারী। অর্থাৎ মন্দিরের সব কয়টি দরজা খোলা থাকলে ঐ তিনটি মন্দিরের দেব-বিগ্রহে উদয়ভানুর স্পর্শ লাগবে যে তারিখে সেটা ১৬ই ফেব্রুয়ারী। বর্তমানে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে ঐ তারিখে সূর্যের অবস্থান কুম্ভ রাশীর ১°তে। যদি এ ক্ষেত্রেও ধরে নিই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সূর্যদেব যখন কুম্ভরাশীর মধ্যস্থলে, ঐ অগ্নিকোণে, তাহলে আমরা বলতে পারি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়টা আজ থেকে ১৪ × ৬০ = ৮৪০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে। সিদ্ধেশ্বর ও রাজারানী মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলেই মনে হয়।

জানি না এ হিসাব কাকতালীয়ভাবে মিলে গেল কিনা। আমার বক্তব্য মন্দিরগুলি এই যে বিভিন্ন দিকে মুখ করে আছে এটার কারণ সম্বন্ধে গবেষণার অবকাশ আছে। প্রকৃত অধিকারীই সে কাজ করতে পারেন।

সে যাই হোক কোনার্ক মন্দির সম্বন্ধে পরবর্তী উল্লেখটি পাচ্ছি ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেটিও মাদলা পঞ্জীতে। তাতে উল্লিখিত হয়েছে খুর্দার রাজা, তিনিও নরসিংহদেব (খুর্দার ভোই বংশের তৃতীয় রাজা) কোনার্ক মন্দির দর্শন করতে যান ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে। সে সময় উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন বাখর খাঁ, যিনি দিল্লীশ্বর শাহ সেলিমের[১] প্রতিনিধি হিসাবে উড়িষ্যার শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। মাদলা পঞ্জী বলছেন, খুর্দার রাজা কোনার্ক মন্দিরে কোনও বিগ্রহ দেখতে পাননি

১) নিঃসন্দেহে এখানে মাদলা পঞ্জী একটি ভুল করেছেন। শাহ সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়েছিল পূর্ববৎসর অর্থাৎ ১৬২৭-এ। খুর্দার রাজা যখন কোনার্ক দর্শনে আসেন তখন দিল্লীশ্বর হচ্ছেন সম্রাট শাহ্‌জাহান।

—কারণ পূর্ববর্তী যবন আক্রমণের আগেই অর্কতীর্থের বিখ্যাত মৈত্রেয়াদিত্য-বিরিঞ্চিদেবের (সূর্যদেবের) মূর্তিটি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে (পুরীতে) অবস্থিত নীলাদ্রিমহোৎসব-মন্দিরে (জগন্নাথদেবের মন্দিরে) স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মহারাজ তাঁর অমাত্য নাথ-মহাপাত্রের সাহায্যে শূন্য মন্দিরটির মাপ নেন ও লিপিবদ্ধ করেন। মহারাজের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলির অষ্টবিংশতি অঙ্গুলি-বিশিষ্ট একটি দণ্ডের সাহায্যে বিভিন্ন অংশের মাপ নেওয়া হয়। মহারাজের অষ্ট-বিংশ অঙ্গুলিতে কত ফুট কত ইঞ্চি হয়েছিল তা আমরা জানি না; কিন্তু ঐকিক নিয়মের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হিসাব থেকে আমরা অনায়াসেই ভেঙ্গে পড়া দেউলের উচ্চতা বার করতে পারি। সে হিসাব যথা সময়ে করা যাবে।

খুর্দার রাজার ঐ মাপ ও বিবরণ থেকে দেখছি যে, দেউলের শীর্ষে আমলকের উপরে কলসটি নাই, পদ্মধ্বজাটিও অপহৃত; তবু তখনও কলস ও আয়ুধের যে দণ্ড (চুম্বক-লোহা-ধারণ) সেটি স্বস্থানে আছে। কলস ও আয়ুধটি ছিল তামার। যবনরা সেগুলি অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—হয়তো সেটা সোনার ভেবে, অথবা তামার লোভেই, কিম্বা শুধুমাত্র ধর্মবৈরিতার কারণে।

এই যবন আক্রমণের সময়কালটা আকবরের শাসনকালেই, ষোড়শ-শতাব্দীর শেষপাদে। সে সময়ে বাঙলার আফগান নবাব দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ খুঁজছিল। সম্রাট আকবর উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সঙ্গে একটি সন্ধি করে আফগান আক্রমণের বিষয়ে তাঁকে আশ্বস্তও করেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুগলসম্রাট যখন পশ্চিমসীমান্তের রণক্ষেত্রে ব্যস্ত তখন বাঙলার আফগান নবাব সুলেমান করানী অতর্কিতে উড়িষ্যা আক্রমণ করে। নবাবের সেনাপতি ধর্মান্ধ কালাপাহাড়কে এই অভিযানের নেতৃত্ব করতে পাঠায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারে বারে যে দুর্ভাগ্যকে ঘনিয়ে উঠতে দেখেছি উড়িষ্যার ক্ষেত্রে এবারও তাই হল। এই

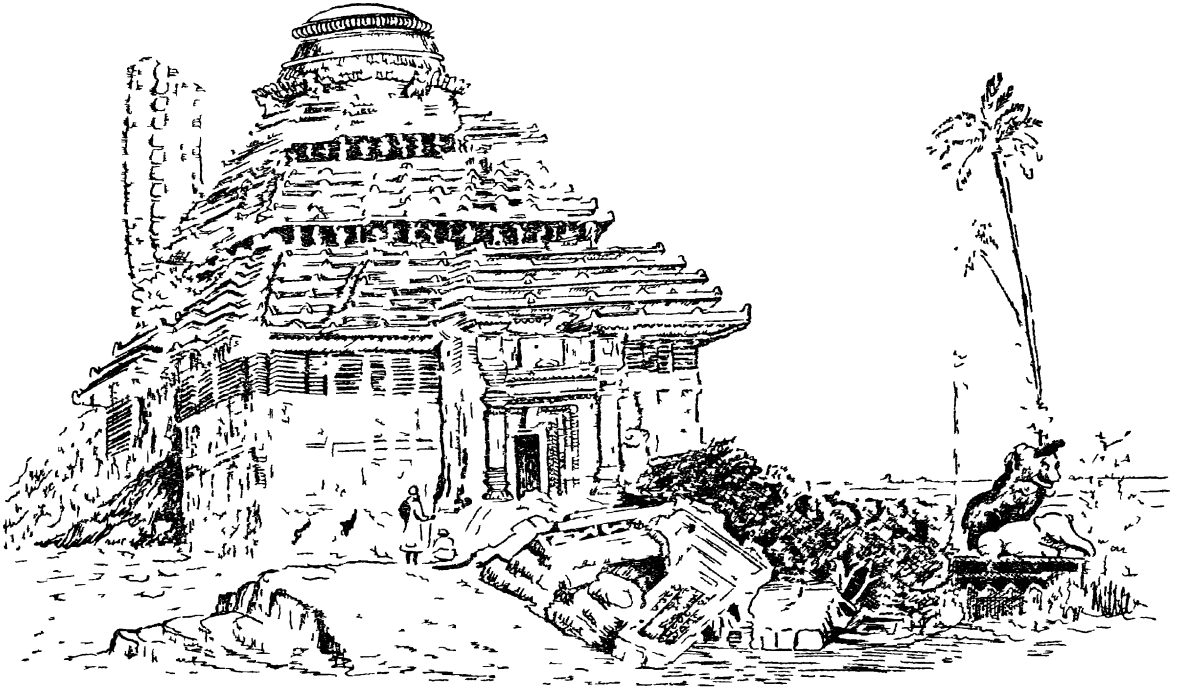

চিত্র—৩৫ ॥ কোনার্ক—১৮৩৭

[ফার্গুসনের স্কেচ থেকে লেখক কর্তৃক অনুকৃত]

দুঃসময়ে মুকুন্দ দেবের অমাত্যরাও সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মুকুন্দ দেবের পক্ষে কালাপাহাড়কে প্রতিহত করা সম্ভবপর হল না। মুকুন্দ দেব নিরুপায় হয়ে কোনার্কের বিগ্রহ পুরীর মন্দিরে স্থানান্তরিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সে যুদ্ধে বুকের রক্ত দিয়ে মুকুন্দ দেব তাঁর অমাত্যদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যান। আর কালাপাহাড়ের অপকীর্তি মহাকালের বুকে চিরস্থায়ী হয়ে রইল উড়িষ্যার নানান্ দেব-দেউলে। এই মুকুন্দ দেবই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা।

সে যাই হোক, কোনার্ক মন্দিরের পরবর্তী উল্লেখ যেটি পাচ্ছি সেটি এ. স্টারলিং-এর। খুর্দা রাজার কোনার্ক দর্শনের দুইশত বৎসর পরে, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। স্টারলিং তাঁর বিবরণে বলছেন জগমোহনটি অটুট থাকলেও মূল দেউলটি ছিল ভগ্নাবস্থায়। তবু সেই রেখ-দেউল "তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। উচ্চতায় প্রায় ১২৫ ফুট। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পালতোলা একটি জাহাজ।" জেমস্ ফার্গুসন মন্দিরটি দেখেন তার বারো বৎসর পরে ১৮৩৭-এ। তাঁর মতে রেখ-দেউলের যে উচ্চতা তিনি দেখেছিলেন তা ১৪০ থেকে ১৫০ ফুট—অর্থাৎ বর্তমান জগমোহনের চেয়েও বড়। ফার্গুসনের অনুমানই যে ঠিক অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্টারলিং যে ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেননি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে ফার্গুসনের ১৮৩৭ সালে হাতে-আঁকা একটি ছবিতে। পুরাতত্ত্ববিদ ফার্গুসনের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান ছিল—তিনি ঐ চিত্রে মন্দিরটিকে পতঙ্গদৃষ্টিকোণ (worm's eye-view) থেকে এঁকেছেন। ফলে বেশ বোঝা যায় রেখ-দেউলের উচ্চতা জগমোহনের চেয়ে বেশী। ফার্গুসন-সাহেবের ঐ চিত্রটির একটি অনুলিপি সাধ্যমত এঁকে দেখানোর চেষ্টা করেছি (চিত্র—৩৫)-এ।

মূল রেখ-দেউলটি কেন ভেঙ্গে পড়েছিল এ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা কথা বলেন। কারও কারও মতে ঐ রেখ-দেউলটি আদৌ

সমাপ্ত হয়নি। পার্সি ব্রাউন বলেছেন[১]—"এ গ্রন্থে কোনার্ক মন্দিরের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে হয়তো সেভাবে মন্দিরটি আদৌ শেষ করা সম্ভবপর হয়নি। এ সন্দেহ করার পিছনে প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। কারণ রেখ-দেউলের উপরকার প্রকাণ্ড পাথরগুলি বসানোর আগেই নিশ্চয় বনিয়াদ ধ্বসে যেত।"

আমরা ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারছি না। "বনিয়াদ ধ্বসে যেত" এটা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ (fairly clear proof) মোটেই নয়—এটা লেখকের নিছক অনুমান—এবং সে অনুমানের সমর্থনে তিনি ঐ জমির ভারবাহীক্ষমতা (bearing power of soil) পরীক্ষা করে যে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তারও কোনও প্রমাণ নেই। মন্দির যদি অসমাপ্ত থাকত তাহলে আবুল ফজল নিশ্চয় সে কথা উল্লেখ করতে ভুলতেন না। তাছাড়া মন্দির সমাপ্ত না হলে দেব-পূজা শুরু হত না এবং সেক্ষেত্রে হিন্দু-পুরাণে এটিকে মহাতীর্থ হিসাবে বর্ণনা করা হত না। মাদলা পঞ্জীও নিশ্চয় সে কথার উল্লেখ করতেন।

এ ছাড়াও প্রমাণ আছে। ফার্গুসনের চিত্রে[২] দেখছি অন্যূন দ্বাদশটি ভূমি আমলক টিকে আছে (১৮৩৭-এ)। কোন রেখ-দেউল দ্বাদশ ভূমি পর্যন্ত নির্মিত হলে সেটা কখনই পাঁচশ বছর টিকে থাকতে পারে না যদি না তার উপর আমলক শিলাটি বসানো হয়। খুর্দা রাজার কলসদণ্ডের সুস্পষ্ট উল্লেখও যথেষ্ট প্রমাণ। তিনি বড় দেউলের উচ্চতা মেপে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, বনিয়াদ বসে যাওয়ায় দেউলটি ভেঙ্গে গেছে। সেটা অসম্ভব মনে হয়েছে আমাদের কাছে। বনিয়াদ বসে যাবার কোন লক্ষণ সংলগ্ন জমিতে দেখা যায় না, তাছাড়া

১) Indian Architecture, Buddist & Hindu Period, p 129 —Percy Brown

২) Asiatic Researches, XV (Serampore 1825) p. 326.

সেক্ষেত্রে সন্নিকটস্থ জগমোহনটি কিছুতেই টিকে থাকত না। ভূকম্পনের যুক্তিও অনুরূপ কারণে মেনে নেওয়া চলে না। বজ্রাঘাতে এ মন্দিরের অতবড় ক্ষতি হতে পারে না। মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়ার বিষয়ে শ্রীযুক্তা দেবলা মিত্র[১] যে যুক্তি দেখিয়েছেন আমরা তাকেই সর্বান্তঃকরণে মেনে নিই। তাব সংক্ষিপ্তসার নিম্নোক্তরূপ :

যবন আক্রমণের আশঙ্কায় দেব-বিগ্রহটি পুরীতে অপসারিত হবার পরে উড়িষ্যায় হিন্দু রাজাদের কাল শেষ হয়েছিল। বিগ্রহহীন মন্দিরের কোন মূল্যই নেই হিন্দুদের কাছে। ওদিকে যবনরা কলস অপহরণ করে নিয়ে যাবার পর উপর থেকে বর্ষার জলধারা মন্দিরে প্রবেশ কবতে থাকে। কালে সেখানে বট-অশ্বত্থ গাছ জন্মগ্রহণ করে। বিগ্রহহীন মন্দিবের অবহেলিত দেউলের সে গাছ ক্রমে বাড়তেই থাকে। ফলে কোন এক সময় কর্বেল করা দেউলের গণ্ডি অংশ ভেঙ্গে পড়ে। দেউলের উপর জগমোহনের দিকে ঝুঁকে থাকা প্রকাণ্ড উড়-গজসিংহটি পড়ে জগমোহনের উপর। ঐ ভদ্র-দেউলেব কিছুটা ক্ষতি করে গড়িয়ে পড়ে উত্তর দিকে। সেই প্রকাণ্ড উড়-গজসিংহটিকে তিন টুকরো অবস্থায় পাওয়া গেছে। সেটি এখনও পড়ে আছে জগমোহনের উত্তর প্রান্তে। প্রশ্ন হতে পারে—যবন আক্রমণের পবে নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কেন হল না? মন্দির তো তখনও অটুট ছিল। কাশী বিশ্বনাথে, সোমনাথে তো তা হয়েছিল। সম্ভবত ষোড়শ-শতাব্দী থেকেই এ অঞ্চলের অবনতি হতে থাকে। বাণিজ্যের পথ বদলে যায়। জনপদগুলি জনশূন্য হতে থাকে। তার ফলে এ মন্দিরে আর নূতন বিগ্রহ বসান হয়নি। দেবতাহীন দেউল পড়েছিল উপেক্ষিত হয়ে।

ফার্গুসন মন্দিরের ঐ চিত্রটি আঁকেন ১৮৩৭ সালে। পর বৎসর কিট্টো ঐ মন্দির দর্শন করে লিখেছিলেন[২] "(রেখ-দেউলটির)

১) Konarak p 10, by Smt. D. Mitra.

২) Journal of Asiatic Soc. of Bengal, VII, part II (1838) p. 681.

একটা কোণা এখনও দাঁড়িয়ে আছে—উচ্চতায় ৮০ থেকে ১০০ ফুট, এবং দেখলে মনে হয় যেন বাঁকা একটি স্তম্ভ।"

পরবর্তী দর্শক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৬৮ সালে তিনি রেখ-দেউলটি সম্বন্ধে বলছেন,[১]—"প্রস্তরাকীর্ণ প্রকাণ্ড এক ভগ্নস্তূপ, শুধু এখানে ওখানে বট-অশ্বত্থের চারা।" রাজেন্দ্রলাল রেখ-দেউলের কোন চিহ্ন দেখতে পাননি, তার কারণ ১৮৪৮ সালে উড়িষ্যায় যে প্রচণ্ড সাইক্লোন এসেছিল সম্ভবত তাতেই রেখ-দেউলের শেষ অংশটি ভেঙ্গে পড়ে।

একটা কথা। স্টারলিং অথবা ফার্গুসন তাঁদের বর্ণনায় কোনার্ক মন্দিরের রথের পরিকল্পনা বুঝতে পারেননি। এ মন্দিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-নিদর্শন—চক্রগুলি এবং রথাশ্ব তারা দেখতে পাননি, কারণ মন্দিরের প্রায় ১৭ ফুট তখনও বালির মধ্যে অবলুপ্ত ছিল। (চিত্র—৩৫) এর সঙ্গে (প্লেট—৩) তুলনা করলেই এ সত্যটা বোঝা যাবে। (প্লেট—৩) এ অঙ্কিত চিত্রটি গ্রন্থকারের কল্পনায় দেখা সদ্যসমাপ্ত কোনার্ক জগমোহনের প্রবেশ পথ।

রেখ-দেউলটি ভেঙ্গে গেছে মহাকালের অঙ্গুলি হেলনে; কিন্তু জগমোহনটির দুঃখের কাহিনী আরও করুণ। স্থানীয় লোকেরা এবং খুর্দার রাজা ক্রমাগত ঐ মন্দির থেকে পাথর নিয়ে যেতে শুরু করেন। হয়তো অচিরেই সব সাফা হয়ে যেত—তা যে হয়নি তা শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে। জগমোহনের চূড়াটি বহুদূর থেকে দেখা যেত—উপকূলভাগে বণিকদলের জাহাজের কাপ্তেনদের কাছে ঐ মন্দিরটি ছিল একটি সুস্পষ্ট দিক্‌চিহ্ন। মন্দিরটি তাই অপরিহার্য মনে হয়েছিল 'মেরিন-বোর্ডের' কর্তাব্যক্তিদের কাছে। তাঁরা ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন যাতে ঐ মন্দির থেকে পাথর নিয়ে যাওয়া বন্ধ করা হয়; এবং সম্ভব হলে মন্দিরটি যেন মেরামত করে সেটি টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা

১) Antiquities of Orissa, II (1880) p. 150.

হয়।[১] গভর্ণর জেনারেল মেরামতের জন্য কোনও ব্যয় বরাদ্দ করতে রাজি হলেন না বটে তবে স্থানীয় লোকরা যাতে পাথর নিয়ে না যায় যে ব্যবস্থা করলেন।

কোনার্ক মন্দির সংরক্ষণের জন্য বহু জ্ঞানীগুণী এবং বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন। সে প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা ছিল বাঙলার এশিয়াটিক সোসাইটির। কিন্তু সোসাইটির আবেদনও নিষ্ফল হল। বিজন প্রান্তরে ঐ মন্দিরটি সংরক্ষণের কোনও প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি তদানিন্তন বিদেশী সরকার। ইতিমধ্যে জগমোহনের পূর্ব-দ্বারে অবস্থিত নবগ্রহের প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডটি ভেঙ্গে পড়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সেটি কলকাতার যাদুঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন—কিন্তু মন্দির চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আসতে গিয়েই সোসাইটির বরাদ্দ ব্যয় নিঃশেষিত হয়ে গেল। সেটা ১৮৬৭ সালের কথা। ইতিমধ্যে ছোটলাট স্যার এ্যাসলি ইডেন সরেজমিনে মন্দিরটি দেখতে এলেন। এবার সরকার থেকে সামান্য ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হল। ফলে ১৮৮১ সালে অর্থাৎ স্টারলিঙের প্রথম দর্শনের ছাপ্পান্ন বছর পরে আমাদের সহৃদয় বিদেশী শাসক মন্দিরটির মেরামতিতে আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে এলেন। প্রথম দু-তিন বছরে কাজ হল যৎসামান্য। কিছুটা জঙ্গল কাটা হল এবং মন্দিরদ্বারের তিন-দুগুনে ছয়টি প্রকাণ্ড মূর্তিকে (হস্তী, অশ্ব এবং হস্তী দলনকারী শার্দুল)—মন্দিরের অনতিদূরে এক একটি পাদপীঠ তৈরী করে বসানো হল। ভ্রমক্রমে হস্তী এবং অশ্বকে বসানো হল মন্দিরের দিকে মুখ করে—আসলে তারা ছিল মন্দিরের দিকে পিছন

---

১) প্রসঙ্গতঃ একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, কোনার্ক মন্দিরের উপর নাকি একটি চুম্বক শিলা ছিল, তাতে পর্তুগীজ নাবিকরা দিকভ্রান্ত হয়ে যেত। এইজন্য পর্তুগীজ বোম্বেটের দল জাহাজ থেকে গোলা মেরে মন্দিরটি ভেঙ্গে দেয়। এ কিম্বদন্তীর কোনও ঐতিহাসিক নজির আমি পাইনি।

করে; এবং শার্দুলের জোড়াটিকে বসান হল জগমোহনের পূর্ব-দিকে উঁচু একটি বালির ডিপির উপর। এই বালির ডিপির তলা থেকেই পরে আবিষ্কৃত হয়েছে ভোগমণ্ডপটি—ফলে এই শার্দুলদ্বয়কে পুনরায় স্থানচ্যুত করে বসান হয়েছে ভোগমণ্ডপের সামনে। মজার কথা, সেখানেও পুরাতত্ত্ব অথবা পূর্ত-বিভাগের কর্তারা লক্ষ্য করে দেখেননি যে, পাদপীঠের প্রস্তর-খণ্ডটি উল্টো করে বসান হয়েছে। এ ভুল রয়েই গেছে, আজও দেখতে পাবেন দক্ষিণ দিকের শার্দুলের পাদপীঠে খোদাই করা হাতীর সারি আকাশের দিকে পা তুলে হাঁটছে।

কোনার্কের প্রকৃত সংস্করণ শুরু হল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। আমাদের সৌভাগ্য যে বঙ্গভঙ্গকারী কার্জন-সাহেবের পুরাতত্ত্বের প্রতি সত্যিই দরদ ছিল। পুরাতত্ত্ব-বিভাগের কর্ণধাররূপে জন হাণ্টারও তখন সবে এসেছেন। ফলে এবার সত্যিকারের কাজ হল। বালির স্তূপ সরানো হল—আবিষ্কৃত হল কোনার্কের রথের স্বরূপ। বহু শতাব্দীর পর রথের চাকা, রথাশ্ব আবার সূর্যের মুখ দেখল বালির সমাধি বিদীর্ণ করে। এর পরই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জগমোহনটিকে চিরকালের জন্য ভরাট করে দেওয়া হয়। পনের ফুট চওড়া পাঁচিল তোলা হল জগমোহনের ভিতর চারদিকের দেওয়াল ঘেঁষে। উপর থেকে বালি ঢেলে সেটিকে একেবারে নিরেট করে দেওয়া হল। একমাত্র দুঃখের কথা, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়ার আগে ভিতরে কি ছিল তার স্কেচ এবং বিস্তারিত বিবরণ বোধহয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে রাখা হয়নি।

কোনার্ক-মন্দিরের ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত করে এবার আমরা বরং মন্দিরটি দেখতে থাকি। কোনার্ক-দর্শকের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা সময়াভাব। যদিও সেখানে মধ্যবিত্তদের জন্য একটি পান্থ-নিবাস এবং উচ্চবিত্তদের জন্য একটি টুরিস্ট লজ সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে—কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই সে সুযোগ নিতে চান না। তাঁরা

পুরী থেকে ঝটিকা-গতি বাসে করে এসে একই দিনে কোনার্ক ভুবনেশ্বর দেখে কলকাতায় ফিরে আসেন। কোনার্ক মন্দিরে সংখ্যাতত্ত্ব রাখা হয় না—কিন্তু আমার তো মনে হয় শতকরা আশীজন বাঙালী

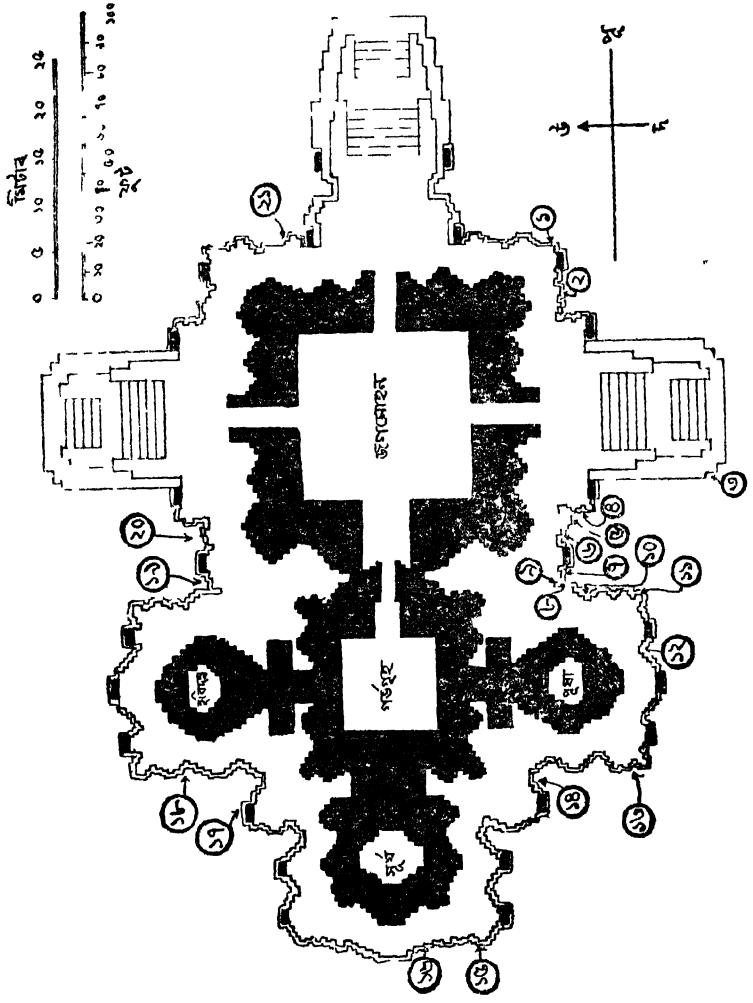

চিত্র—৩৬। কোনার্ক মন্দিরের ভূমি নক্শা

যাত্রী কোনার্ক দেখার জন্য ব্যয় করেন ঘণ্টা তিন-চার। অন্তত আট ঘণ্টার কম সময়ে কোনার্ক মন্দির মোটামুটি দেখা, তার থেকে

রসাস্বাদন করা সম্ভবপর নয়। তবু যেহেতু অধিকাংশ যাত্রী অতি অল্পসময়ে দর্শনীয় শিল্পনিদর্শনগুলি দেখে নিতে চাইবেন তাই তাঁদের সুবিধার জন্য চিত্র—৩৬-এ বিভিন্ন দ্রষ্টব্য দ্রব্যের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিলাম। এই চিত্রটি সংযুক্ত জগমোহন ও বড়দেউলের। চিত্রে সমস্ত মন্দির-চত্বরের প্রধান দ্রষ্টব্যের অবস্থান সূচিত হয়েছে। আমরা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টব্য বিষয়ের অবস্থানসূচক চিহ্নটি উল্লেখ করে যাচ্ছি যা থেকে অনায়াসে পরিদর্শনকালে অল্পসময়ে শিল্প-নিদর্শনটি খুঁজে নেওয়া যায়।

চিত্র—৩৬-এ গাঢ় কালো রঙে আঁকা অংশটাই মন্দিরের ভূমি নক্শা, তার চারপাশে খোলা রকের মত। এই খোলা চাতালের বাহির দিক দিয়ে জমির সমতলে প্রথমে আমরা যুগ্ম-দেউলকে প্রদক্ষিণ করব পূর্বপ্রান্তের সোপানের কাছ থেকে। এই খোলা চাতালের শেষপ্রান্তে যে খাড়া অংশ, ইংরাজীতে যাকে বলে বাড়ির প্লিন্থ—বাঙলায় কোন কোন জেলায় বলে 'পোতা'—সেই অংশের নাম পিষ্ঠ। আমরা প্রথমে বাইরের দিক থেকে এই 'পিষ্ঠ'টি ঘুরে ঘুরে দেখব। এইখানেই আছে বৃহদায়তন রথচক্রগুলি। জগমোহনের পূর্বদিকে যে সিঁড়ি আছে তার প্রত্যেক দিকে দুটি করে সর্বসমেত চারটি চক্র আছে। দক্ষিণদিকে ছিল চারটি রথাশ্ব। তার ভিতর মাত্র দু'টির মাথা আছে—দ্বিতীয়টির অনেকটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। চক্রগুলির বহিরঙ্গ মোটামুটি একই, যদিও কারুকার্যে তফাত আছে। রথচক্রগুলির ব্যাস—৯ফুট ; এতে আটটি বড় অর (স্পোক) এবং আটটি ছোট অর আছে। বড় অরগুলি সরু থেকে মোটা এবং আবার মোটা থেকে সরু হয়ে নেমিতে (রিম অংশে) গিয়ে মিশেছে। ফলে বড় অরগুলির মধ্যমাংশে গোলাকার একটি নক্শা কাটা সম্ভবপর হয়েছে। প্রতিটি চক্রে এই রকম আটটি গোলকার লম্বা এবং অক্ষাগ্রে (এ্যাক্সেল প্রান্তে) আর একটি নক্শা নিয়ে সর্বসমেত নয়টি নক্শার স্থান। তাতে স্ত্রী, পুরুষ, মিথুনচিত্র,

দেবদেবীর মূর্তি আছে। নেমি অংশে পল-তোলা ফুল-লতা-পাতা এবং সরু অরে গোলাকৃতি বলের মত মুক্তার সারি। (প্লেট—১২ দ্রষ্টব্য)

ঐ চিত্রে এই পিষ্ঠ অংশের খানিকটাও এঁকে দেখানো হয়েছে। সবার নিচে উপানে আছে হাতীর সারি, শিকারের দৃশ্য, শোভাযাত্রার দৃশ্য ইত্যাদি। হাতীই বেশী—গুণে দেখা গেছে একমাত্র উপান-অংশেই বিভিন্ন অবস্থায় অন্যূন এগারো শত হাতীর মূর্তি খোদাই করা আছে। হাতী শিকারের দৃশ্য, দলবদ্ধ বন্যহস্তীর জীবনযাত্রা, হাতীর যুদ্ধ ইত্যাদি। উপানের উপরে পা-ভাগের পাঁচ কাম। খুর-কুম্ভ-পাটা-কাণি ও বসন্ত। এর ভিতর পাটায় জীবজন্তুর চিত্র এবং বসন্ত নক্শা কাটা।

তলজঙ্ঘাতে কিছু দূরে কাখর-মুণ্ডি সম্বলিত স্তম্ভ। তার কুলুঙ্গিতে নানান্ দৃশ্য। দুটি কাখর-মুণ্ডি স্তম্ভের মাঝে মাঝে কখনও দুটি কখনও বা তিন-চারটি খাড়া পাথর। এই খাড়া পাথরগুলিতেও নানান্ জাতের ভাস্কর্যের নিদর্শন। সেগুলি অধিকাংশই মিথুন-মূর্তি, অলস-কন্যা, বিরাল, অথবা নাগ মূর্তি।

তলজঙ্ঘার উপরে বন্ধনের তিনকাম—পাটা-কাণি-বসন্ত। পাটা ও বসন্তে নক্শা কাটা, ফুল-লতা-পাতা অথবা জীবজন্তু। কিছু দূরে দূরে এই তিনটি উপভাগকে যুক্ত করে একটি খাড়া পাথরে নক্শার কাজ।

উপর-জঙ্ঘাতে দেখছি- নিচের তলজঙ্ঘার কাখর-মুণ্ডি স্তম্ভের উপর-উপর আবার একটি করে পদ্মশীর্ষ অর্ধস্তম্ভ। এই অধস্তম্ভগুলি পঞ্চরথ পর্যায়ের। তলজঙ্ঘার মূর্তিগুলির ঠিক উপর-উপর এখানেও এক সারি মূর্তি।

উপর-জঙ্ঘার উপরে হচ্ছে বারান্দার স্থান। সেটি অক্ষত নেই, শুধুমাত্র নিচের উপভাগ—একটি পাটা, অনেকাংশে অটুট আছে। ঝোলা-বারান্দার (ক্যান্টিলিভার) মত অনেকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। তার খাড়া গায়ে অপূর্ব নক্শার কাজ, অনেকটা উপানের

মত। উভয়ের আকারও প্রায় সমান। এবার আমরা ঘুরে ঘুরে মূর্তি গুলি দেখব। অধিকাংশ মূর্তি অথবা নক্শায় অবশ্য বোঝাবার কিছু নেই—তাদেব সৌন্দর্য স্বয়ংপ্রকাশ। অলসকন্যা, বিরাল, নাগিনী অথবা মিথুন-মূর্তিতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অজন্তাতে যেমন ধারাবাহিক কাহিনী-চিত্র দেখতে পাওয়া যায় এখানে সে রকম নেই। ফলে আমরা শুধু বিশেষ মূর্তি—যা নাকি দর্শকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে তাব দিকেই এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি চিত্র—৩৬-এ বর্ণিত সংখ্যা অনুসাবে অবস্থান নির্দেশ করে।

১) উপান-অংশে এইখানে লক্ষ্য কবে দেখুন খেদার সাহায্যে বন্য হাতী ধবার দৃশ্য।

২) শৈব-শাক্ত এবং বিষ্ণু উপাসকদের এই শিল্প-নিদর্শনে সম-পর্যায়ে দেখান হয়েছে। দেখছি, একটি মন্দিরে পাশাপাশি পূজা পাচ্ছেন মহিষমর্দিনী, জগন্নাথ এবং শিবলিঙ্গ। তার বামে দেখছি, বাজা এসেছেন পূজা দিতে, সঙ্গে রাজানুচবও আছে—পূজার্থী রাজা মন্দির-পুরোহিতের হাতে একটি ববমাল্য প্রদান কবছেন। তার তলায় দেখছি, মন্দিরের বাহিবে অপেক্ষা করছে দুটি রাজহস্তী—মাহুতও আছে সঙ্গে। সূর্য মন্দিবে এই ভাস্কর্য নিদর্শনটিতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা ইঙ্গি· রয়েছে—আরও লক্ষণীয় যে ঐ সঙ্গে সূর্য মূর্তি কিন্তু নেই।

৩) উপান অংশে এতক্ষণ শুধু হাতীর শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে আসছিলেন। এখানে শিল্পী কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন দড়ি টানাটানির একটি কৌতুককর দৃশ্য খোদাই করে।

৪) পঞ্চম চক্রের কাছে উপর জঙ্ঘা অংশে একটি মূর্তি দেখবার মত। মনে হয় যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মহারাজা অথবা সেনাপতি দর্পণে নিজ সাজশয্যা দেখে নিচ্ছেন। ·যোদ্ধার কোমরবন্ধে তরবারি, সর্বাঙ্গে যুদ্ধের উপযুক্ত সাজ।

৫) উপর জঙ্ঘা অংশে একটি সম্ভ্রান্ত দম্পতীর ভাস্কর্য নিদর্শন। গাছের নিচে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলার ঘোমটা দেওয়ার ভঙ্গিটা দেখবার মত। কিন্তু এ শিল্প-নিদর্শনটির সবচেয়ে বড় আবেদন দম্পতীর মুখের পূর্ণ পরিতৃপ্তির হাসিতে। সদ্যবিবাহিত দম্পতী যখন স্টুডিওতে ফটো তুলতে যান, তখন ক্যামেরাম্যান তাঁদের একটি অনুরোধ করে থাকে—একটু হাসি-হাসি মুখ করুন। কিন্তু এক সেকেণ্ডের অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশের জন্যও সে হাসিটি অনেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এখানে এই সুখী দম্পতী কিন্তু দীর্ঘ সাতশ বছর ধরে সেটি জিইয়ে রেখেছেন। নোনা হাওয়ায় তাঁদের বালি পাথরের অঙ্গ ক্ষয়ে গেছে—তবু হাসিটি আছে অম্লান।

৬) ঐ উপর জঙ্ঘা অংশেই আছে একটি মনোরম দৃশ্য। কোন একজন ভারতীয় রাজা বসে আছেন হস্তিপৃষ্ঠে, সঙ্গে তাঁর অনুচরবৃন্দ, চামরধারী এবং ছত্রধারী। রাজার সম্মুখে একদল বিদেশী—তারা হতে পারে বিদেশী বণিক, মহারাজের কাছে বাণিজ্যের অনুমতি চাইতে এসেছে। অথবা হয়তো তারা আফ্রিকার কোনও রাজার দূত। আফ্রিকা বলছি কেন? দেখছি, বিদেশীরা ভারতীয় রাজার জন্য যে সমস্ত উপঢৌকন এনেছে তার মধ্যে আছে একটি জিরাফ। "মার্কো পোলোর সময়ে (১২৫৪—১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ) আরব পারস্য ···হইতে কুইলন কয়াল (তাম্রপর্নী নদীর মোহনায়, এখনকার কয়াল-পাটনার ঈষৎ উত্তরে) বন্দরে বণিকেরা আসিত। ইহাদের সহিত আরবদেশ হইতে ঘোড়াও আমদানি হইত। ইহাদের পক্ষে উড়িষ্যা পর্যন্ত আসা একেবারে অসম্ভব নয়।"[১] বিদেশীদের পরিধানে ফ্রক জাতীয় ফ্রিল-দেওয়া ছোট কুর্তা। দৃশ্যটি একটি প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায়—যেন উপহারে প্রীত মহারাজ বিশাল বট-গাছের মত আগন্তুকদের ছত্র-ছায়ায় আশ্রয়দানে স্বীকৃত হলেন।

৭) ঐ একই সমতলে অর্থাৎ উপর জঙ্ঘাতে এবার দেখছি

১) কণারকের বিবরণ, ১৯২৬, শ্রীনির্মলকুমার বসু।

একটি ভাস্কর্য যাতে একটি করুণ দৃশ্যের গোপন মূর্ছনা। রাষ্ট্রবিপ্লবে পরাজিত একজন যোদ্ধা সপরিবারে জনপদ ত্যাগ করে আত্মগোপনে চলেছেন। সৈনিকের আয়ুধগুলি দেখে মনে হয় না সে নীচশ্রেণীর, কিন্তু তার বেশবাস অলঙ্কার যেন ধূলিমলিন, জীর্ণ। সৈনিকের ভঙ্গি রণক্লান্ত পথিকের। অদূরে তার হতভাগিনী পত্নী। তার কাঁকালে শিশু, মাথায় একটি বাক্স—বোধকরি ওতেই আছে তার যা কিছু সম্পদ। শ্রান্ত পথিক নিভৃতে বিশ্রাম নিতে বসেছে এক বৃক্ষচ্ছায়ে।

৮) ষষ্ঠ চক্রের ঠিক পাশে উপর জঙ্ঘাতে দেখছি একটি শিকারের দৃশ্য।[প্লেট-১২-তে রথচক্রটিকে যদি ম্যাপ বলে ধরেন, তাহলে তার উত্তর-পশ্চিম দিক নির্দেশক স্পোকের সামনে এ মূর্তিটি দেখতে পাবেন]। কোন একজন রাজা কোন একটি বন্যজন্তুকে (বরাহ অথবা ভল্লুক) পা ধরে বাঁ হাতে ঝুলিয়ে ডান হাতে তরবারির সাহায্যে তাকে হত্যা করছেন।

৯) ঐ মূর্তির ঠিক উপরে বারান্দার সর্বনিম্ন উপভাগ অর্থাৎ পাটায় দেখতে পাবেন হাতী-ধরার একটি দৃশ্য। বন্যহস্তীকে বর্শাঘাতে পর্যুদস্ত করা হচ্ছে।

১০) উপর জঙ্ঘার একটি স্ল্যাবে দেখছি একজন পরিব্রাজককে। অনেকে বলেন এটি সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্ ৎসাঙ্-এর মূর্তি। মূর্তিটি বৃদ্ধের, তাঁর একহাতে ছাতা অপর হাতে বুঝি কিছু পুঁথি। সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক। লক্ষণীয় বৃদ্ধের কান দুটি কোনার্ক মন্দিরের অন্য কোন মূর্তির মত নয়—বুদ্ধদেবের মত দীর্ঘায়ত। আমারও মনে হয় এটি সম্ভবতঃ ঐ চৈনিক পরিব্রাজকের মূর্তি।

১১) সপ্তমচক্রের কাছে উপানে পুনরায় দেখছি খোদিত হয়েছে একটি জিরাফের মূর্তি।

১২) উপান অংশে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রার দৃশ্য। হাতীর পিঠে

চলেছেন রাজা, পালকীতে রানী, বাঁকে করে ভারে ভারে রসদ নিয়ে চলেছে বাহকদের দল।

১৩) উপান অংশে একটি বন্যজন্তু শিকারের দৃশ্য। অশ্বারোহী শিকারীর দল তাড়া করেছে এক পাল হরিণকে। সাতটি হরিণ ছুটে পালাচ্ছে।

১৪) তলজঙ্ঘার কাখরমুণ্ডির ভিতর ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য। দর্শকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার আশঙ্কা যথেষ্ট। অশীতিপর এক বৃদ্ধার সাধ হয়েছে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করবেন কোন তীর্থক্ষেত্রে। কৈলাস-কেদারবদ্রী, অথবা হয়তো সে যুগে কাশী-মথুরা-বৃন্দাবনও ছিল সুদুর্গম তীর্থ। বৃদ্ধার বাম হস্তে যষ্টি, ডান হাতে জড়িয়ে ধরেছেন পুত্রকে—শিরশ্চুম্বন করছেন বংশধরের। বৃদ্ধার পদতলে পুত্রবধূ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। আর সবচেয়ে করুণ দৃশ্য হচ্ছে নাতিটির ভঙ্গি—বৃদ্ধার দক্ষিণ জানু আঁকড়ে সে যেন বলছে 'যেতে নাহি দিব'! লবনাক্ত হাওয়ায় বালিপাথরের মূর্তিগুলি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে—কিন্তু সপ্ত শতাব্দীর অত্যাচারেও মহাকাল সেই বিদায় বিধুর মুহূর্তটিকে একেবারে মুছে ফেলে দিতে পারেননি।

১৫) উপান অংশে হস্তী মূর্তি বরাবরই দেখতে দেখতে আসছেন —এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন একটি বাৎসল্যরসের দৃশ্য। হস্তী-হস্তিনী এবং স্তন্যপানরত শিশু হস্তী।

১৬) পুনরায় উপান অংশে দেখছি খেদায় হাতী ধরার দৃশ্য। কিন্তু এবার একটু বৈচিত্র্য আছে। হাতী ধরা দেখতে এসেছেন রাজা-রানী। খেদার বাইরে নির্মিত একটি উঁচু মাচাঙ। নিরাপদ দূরত্বে এবং উচ্চতায় বসে রাজা-রানী খেদায় আটকপড়া বন্য-হস্তীদের নিরীক্ষণ করছেন।

১৭) উপান-অংশে পুনরায় হাতী ধরার দৃশ্য। এবারও একটু বৈচিত্র্য আছে। খেদায় বন্যহস্তী আটক পড়ার পর কুন্‌কী হাতী নিয়ে মাহুত খেদায় প্রবেশ করে, সঙ্গে যায় এক শ্রেণীর বিশেষ কুশলী

হাতীশিকারী। তাদের বলে ফান্দিয়ার। সে জীবন তুচ্ছ করে মাটিতে নেমে যায় এবং কৌশলে বন্যহস্তীর পায়ে দড়ির ফাঁদ পরিয়ে দেয়! হাতী ধরার সেই পর্যায়টি এখানে বিধৃত। বেশ বোঝা যায় শিল্পীদলের হাতী শিকার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল।

১৮) মিথুনমূর্তি তো ক্রমাগত দেখতে দেখতে আসছেন। এবার তলজঙ্ঘাতে একটি মিথুন-মূর্তি দেখতে পাবেন যার পুরুষটি হচ্ছেন একজন সাধু। তাঁর মাথায় জটা, আবক্ষ দাড়ি। জানিনা শিল্পীর বক্তব্যটা কি ছিল। হয়তো বামাচারী তান্ত্রিকদের স্বরূপ উৎঘাটন করতে চেয়েছেন শিল্পী, অথবা হয়তো তথাকথিত-সংযমী ভণ্ড সন্ন্যাসীদের প্রতি বক্রোক্তি করতেই এই মূর্তিটির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১৯) উপর জঙ্ঘায় একটি বড় প্যানেলে দেখছি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সভা। পণ্ডিত উপস্থিত জনমণ্ডলীকে কোনও ভাষণ দান করছেন স্তম্ভশোভিত একটি মণ্ডপে। শ্রোতৃবৃন্দের কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে। তাঁদের অনেকেই ঘরানা ঘরের লোক, হয়তো বা রাজা অথবা রাজপুত্র—কারণ ঐ প্যানেলের নিচে (অর্থাৎ সভা মণ্ডপের বাইরে) অপেক্ষা করছে তাঁদের ঘোড়া, হাতী অথবা চতুর্দোলা। অনুচরবৃন্দও অপেক্ষা করছে—তাদের কারও কারও হাতে রাজচ্ছত্র।

২০) পুনরায় একটি শিকারের দৃশ্য। রাজার বামহস্তে ধনুক —তাঁর পশ্চাতে অন্যান্য অনুগামী শিকারীর দল। অনুচরেরা বন্যজন্তুগুলিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

২১) প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি গার্হস্থ্য চিত্র এখানে খোদাই করা হয়েছে! রাজা ও রানী কোন কারণে কিছু দিনের জন্য প্রাসাদ ছেড়ে যাবেন। তারই আয়োজন হচ্ছে। রাজপুত্রকে নিয়ে যাওয়া হবে না। দেখছি স্তম্ভশোভিত একটি দ্বিতল সভামণ্ডপে রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। বিদায়ের পূর্বে রাজপুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছেন। সভামণ্ডপের পাশেই দেখছি রাজা-রানীর যাত্রার

আয়োজন হয়েছে। আরোহীবিহীন একটি সুসজ্জিত রাজহস্তী, কিংখাবে-মোড়া পাল্কী, চারটি ঘড়ায় পানীয় জল ইত্যাদি নিয়ে জোড়-হস্তে অপেক্ষা করছে অনুচরবৃন্দ।

চাতালের বাহির দিক দিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ এখানেই শেষ হল আমাদের। এবার জগমোহনের উপরাংশটা দেখা যাক।

জগমোহনের বাড় অংশ: জগমোহনটির তিন দিকে তিনটি দরজা—জানালা নেই। পূর্বদিকে প্রধান সিংহদ্বার। তিন দিকের তিন দরজার পর বিস্তৃত চাতাল, যার খাড়া অংশটা এতক্ষণ দেখলাম আমরা। তারপর তিন দিকেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। জগমোহনের চতুর্থ দিক, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে বড় দেউলে যাবার দ্বার।

কলিঙ্গের দেব দেউলের রীতি অনুসারে জগমোহনটি পঞ্চরথ পীড় দেউল বা ভদ্র দেউল। বাড়-অংশে শাস্ত্রসম্মত পাঁচ ভাগ—পা-ভাগ, তলজঙ্ঘা, বন্ধন, উপর জঙ্ঘা এবং বরণ্ডি। তিনদিকের রাহাপাগে তিন দ্বারের জন্য এই পঞ্চছন্দ সেখানে ব্যাহত হয়েছে। পা-ভাগের নিচে একটি পিষ্ঠ আছে। পা-ভাগে যথারীতি পাঁচকাম—খুর, কুম্ভ, পাটা, কাণি ও বসন্ত। শুধু রাহাপাগেই নয় মাঝে মাঝে কাখরা মুণ্ডি অলঙ্করণে এই পঞ্চ উপভাগ ব্যাহত হয়েছে। তার ভিতর নানান্ মূর্তি।

পা-ভাগের উপরে তলজঙ্ঘায় দেখছি দুই জোড়া করে অর্ধস্তম্ভের মাঝে মাঝে কুলুঙ্গি করা হয়েছে। তাতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন মূর্তি ছিল। এগুলির অধিকাংশ গত শতাব্দীর প্রথম দিকে স্থানীয় লোক, পুরীর রাজা বা তাঁদের স্নেহধন্য অমাত্যরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ সেখানে অষ্টদিকপালের মূর্তি ছিল—অলস কন্যা, মিথুন-মূর্তি এখনও কিছু কিছু আছে। রাহাপাগের পাশের খাঁজে দুদিকে দুটি করে বৃহদাকার উল্লম্ফনরত বিরাল। কোনাপাগ ও অনুরথ পাগের খাঁজে গজ-বিরাল অথবা রাক্ষস-বিরাল।

বন্ধন সচরাচর তিন কামের হয়ে থাকে—এখানে পাঁচকাম, যথা বরণি-নলি-পাটা-নলি-বসন্ত। এর ভিতর প্রথম ও তৃতীয় এবং পঞ্চম উপভাগের খাড়া অংশে (তাকে মুহাস্তি বলে) ফুল-লতা-পাতার নক্‌শা।

উপর জঙ্ঘার পরিকল্পনা তল-জঙ্ঘারই অনুরূপ।

সবার উপরে বরণ্ডিতে দশকাম—খুরা আকারের বরণি, কণি-নলি-খুরা-পাটা-নলি-পাটা-নলি ও বসন্ত। বরণির মুহাস্তিতে লতা এবং পদ্মদল, খুরা-মুহাস্তিতে হংশলহরী, পাটায় জীবজন্তু, এবং বসন্তে গজগামিনী (হাতীর সার)।

বাড়-অংশের সর্বসমেত উচ্চতা ৩৯′—৬″।

জগমোহনের গণ্ডী: ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজে দেখেছি পীড় দেউলের গণ্ডীতে ছিল দুই পোতাল। এখানে তিন পোতাল। নিচে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোতালে পীড়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৬, ৬ ও ৫। প্রসঙ্গতঃ লিঙ্গরাজের দুটি পোতালে পীড়ের সংখ্যা ছিল ৯ ও ৭ অনন্ত বাসুদেবে ৬ ও ৫ এবং পুরীর জগমোহনে ৭ ও ৬। সুতরাং তিন পোতালের এই পরিকল্পনা বেশ অভিনব। পীড়ের মুহাস্তিতে নক্‌শা তোলা।

প্রথম পোতালের চাতালের চারদিকে চারটি করে সর্বসমেত ষোলোটি কন্যামূর্তি আছে। এ ছাড়া রাহা-অংশের ঝুঁকে থাকা অংশে চার-দুকুনে আটটি নৃত্যশীল ভৈরব মূর্তি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পোতালের চাতালে ষোলোটি কন্যামূর্তি আছে—সেখানে ভৈরবমূর্তি নেই। তৃতীয় পোতালের উপর মূর্তি নেই।

এই কন্যামূর্তিগুলি কোনার্কের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন। নিঃসন্দেহে এ গুলি শ্রেষ্ঠ ভাস্করের হাতের কাজ। সম্ভবতঃ এদের হাতেই নির্মিত হয়েছিল বড় দেউলের তিনটি পার্শ্ব-দেবতার মূর্তি। সে কথা পরে। আপাতত এই কন্যামূর্তিগুলির কথাই বলি। প্রথম পোতালের চাতাল পর্যন্ত ওঠার সিঁড়ি আছে,

যাত্রীরা ঐ পর্যন্তই যেতে পারেন—আরও উপরে অবশ্য ওঠা যায়, কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষেধ। কাছে গিয়ে মূর্তিগুলিকে দেখবেন, (অপারগ হলে যাদুঘরে রক্ষিত কন্যামূর্তিটি দেখবেন) মনে হবে তারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া। প্রমাণ মানুষের চেয়েও দৈর্ঘ্যে বেশ বড়। শিল্পশাস্ত্র বলছেন, নারীমূর্তি হবে সপ্ততাল—কিন্তু সে আইন এক্ষেত্রে ভাস্কর মেনে চলেননি। তিনি জানতেন, এ মূর্তিগুলি অনেক নিচে থেকে দেখবার জন্য তৈরী করা। তাই তাল-মান এমনভাবে নির্ণয় করেছেন যাতে নিচে থেকে তাদের মোটেই স্থূলকায়া মনে হয় না। এই কন্যা-মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ নৃত্যরতা দেবদাসীর—তাদের হাতে নানান্ জাতের বাদ্যযন্ত্র—পাখোয়াজ, মাদল, বাঁশী, খঞ্জনী, করতাল, ঝাঁঝর ইত্যাদি। অঙ্গে তাদের নানান্ জাতের অলঙ্কার—কঙ্কন, কেয়ূর, শতনরী, কর্ণা-ভরণ, মুকুট প্রভৃতি। তাদের চুলবাঁধার কায়দাতেও কত বৈচিত্র্য। অতি সাম্প্রতিককালে ডোনেট সহযোগে অথবা উইগ্‌মন্ত্রে প্রকাণ্ড খোঁপা শিরোধার্য করে যে বরনারীরা ককটেইল পার্টিতে হাজিরা দিতে যান তাঁরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন সাতশ বছর আগেই তাঁদের কবরী-বন্ধন-রীতি এই নিপুণিকা-চতুরিকার দল অনুকরণ করত! যদি ধরে নিই নাইলনের কৃত্রিমতা নেই ওদের খোঁপার সঙ্গোপনে তাহলে বলতে হবে ওদের কবরী ছিল সত্যই আজানুলম্বিত!

কিন্তু এই পীনোদ্ধত যুবতীদের যৌবনশোভা, অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব অথবা বেশভূষাই শুধু নয় আরও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখব—বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী তাদের আকৃতিতে। শাস্ত্রকার বলছেন,—'নিটোল একটি মুক্তার আকার আর আয়তন বোঝানো শক্ত নয় কিন্তু তার সর্বাঙ্গে যে ঢলঢল তরলিত আভা সেটির বর্ণনা দেওয়া যাবে কেমন করে?' শিল্পী মুক্তাটির রূপভেদ সম্বন্ধে সহজেই ধারণা দিতে পারেন,-তার মাপ জোক বা প্রমাণও অনায়াস লভ্য—কিন্তু ঐ ঢলঢল তরলিত আভাটি যদি তিনি রূপায়িত

করতে পারেন তবেই তাঁর মুক্তা আঁকা সার্থক—সেটিই হচ্ছে শিল্পের চতুর্থ অঙ্গ—বা লাবণ্য যোজনা। এই নারীমূর্তিগুলির লাবণ্য যোজনা তেমনি ভাষায় বোঝাবার নয়, প্রত্যক্ষদর্শনে উপলব্ধি করার জিনিস (প্লেট—৫-৯)

তবু বলব শুধু লাবণ্য যোজনাই এর শেষ কথা নয়। শেষ কথা এদের ভাব। সেটি আবার উপলব্ধির জগতে নয়—অনুভূতির জগতের। সেকথাই বলি :

ধরা যাক প্রথম পোতালের উপর উত্তরতম প্রান্তে পূর্বমুখী বংশীবাদিনীর কথা (প্লেট—৫)। ফুঁ দিতে গিয়ে মেয়েটির গালটি কিছু ফুলেছে। অল্প বয়স, মনে হয় পঞ্চদশী। এখনও যেন কিশোরী। ওর অপাপবিদ্ধ মুখমণ্ডলে কিশোরীসুলভ আস্থা—সে যেন এখনও দুনিয়াদারির কিছুই বোঝে না—তাই তার হাসিটি অমলিন। সে সুখী।

এবার আমরা দেখব দ্বিতীয় পোতালের চাতালে পূর্বমুখী দেবদাসীটিকে। সে পাখোয়াজ বাজাচ্ছে পোতালের দক্ষিণতম প্রান্তে। এ মেয়েটি আর ষোড়শী নয়—পূর্ণযৌবনা। ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত তার যৌবন কানায় কানায় ভরা। অধর প্রান্তে কি ক্ষীণ একটি আস্থার লাস্য লেগে আছে? থাকলেও তা জীবন-অভিজ্ঞতার জারক রসে নিষিক্ত। তিন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনবার স্কেচ করেও ঐ পরিপূর্ণ যৌবনার জলদ-গম্ভীর রূপলাবণ্য তুলির আগায় ধরতে পারলাম না—দুঃখ শুধু এটুকুই (প্লেট—৬)।

তারপর ধরুন, প্রথম পোতালের দক্ষিণতম-প্রান্ত-বাসিনী পূর্বমুখী করতালবাদিনীকে। মনে হয়, এও কিশোরী নয়, মধ্য-যৌবনা। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের চেয়ে বয়সে বুঝি কিছু ছোটই হবে। দেবদাসী জীবনের একটা দিকই শুধু দেখেছে যে—পূর্ণচন্দ্রের মত যে পিঠ চন্দ্রিমায় সমুজ্জ্বল, কিন্তু চন্দ্রাননী বুঝি জানে না—তার আর একটা জীবন পড়ে রয়েছে পিছনের দিকে। যৌবনোত্তর

জীবনের সে পিঠের গ্লানিকর অন্ধকারের সম্বন্ধে ও মোটেই সচেতন নয়। তাই ওর অধরপ্রান্তে যৌবনোদ্ধতার গর্বিত ভঙ্গিমা। ওর হাসিতে মিশে আছে কিছুটা উপেক্ষা। শুধু হাসিতেই নয়, সমগ্র দেহাবয়বে, নৃত্যের ভঙ্গিমায় সে যেন বিশ্ববিজয়িনীর ব্যঞ্জনায় দাঁড়িয়েছে করতাল হাতে (প্লেট—৭)।

এবার এ পর্যায়ের শেষ উদাহরণ। সেটি সংগ্রহ করেছি দ্বিতীয় পোতালের চাতাল থেকে। পশ্চিমমুখী (উত্তর প্রান্তে) এ মেয়েটি যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা। আপন মনে খঞ্জনী বাজাচ্ছে অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে মুখ করে। অপূর্ব এই নারী মূর্তিটি। ওরও ওষ্ঠপ্রান্তে লেগে আছে ক্ষীণ একটা হাসির আভাস—কিন্তু সে হাসি যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণবন্ত হাসি নয়—দেবদাসী জীবনের আইন বাঁধা কৃত্রিম আস্য। বেশ মনে হয়—মেয়েটি খিন্ন, বিষন্ন পরিশ্রান্ত ; আর সে শ্রান্তি দৈহিক নয়, মানসিক। দেবদাসী-জীবনের আবরণ ও আভরণে বুঝি ওর মন ভরেনি, যেন কোন দূর পল্লীগ্রামের এক বাল্যবন্ধুর স্মৃতি আজও সে ভুলতে পারেনি। কিম্বা কি জানি, পশ্চিমমুখী বলেই এ মন্দিরের অধিদেবতার বিদায় গ্রহণে ও অমন বিষাদখিন্ন। তবু ও হাসছে (প্লেট—৮)।

দেবদাসীদের পর্যালোচনা এখানেই শেষ হল ; কিন্তু এই শেষ মূর্তিটির সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলব। এর সম্বন্ধে অদ্ভুত একটি ইতিকথা সংগ্রহ করেছিলাম কোনার্কে। কাহিনীটি আমি শুনেছিলাম সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রে একজন বৃদ্ধ গাইডের মুখে। আমাকে ঐ নারী-মূর্তিটির ছবি আঁকতে দেখে বৃদ্ধটি এগিয়ে এসেছিল কৌতূহলী হয়ে। আলাপ হল তার সঙ্গে। তার কাছেই জেনেছি যে, সে এই উপকথাটি শুনেছিল অপর একজন স্বর্গতঃ পেশাদারী গাইডের মুখে অন্তত ত্রিশ বৎসর আগে। এই মুখে মুখে চলে-আসা উপকথার মূল কোথায় তা জানবার আর কোনও উপায় নেই। জানি, এ লোকগাথার কোন মূল্য নাই ঐতিহাসিক অথবা পুরাতাত্ত্বিকের কষ্টিপাথরে—

কিন্তু আপনার-আমার মত রসপিপাসু দর্শকের কাছে এ আষাঢ়ে গল্পটি একেবারে মূল্যহীন না হতেও পারে। তাই ঘটনাচক্রে সংগৃহীত কাহিনীটি কথাসাহিত্যের রসে নিষিক্ত করে পরিবেশনের লোভ সামলাতে পারছি না।

কোনার্ক-জগমোহনের তলা-পোতালের ষোলোটি বৃহদায়তন দেবদাসীর মূর্তি নাকি একই ভাস্করের নিপুণ হাতে গড়া। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর সমতুল্য ভাস্কর সে যুগে আর দ্বিতীয় ছিল না। আমাদের গল্পের খাতিরে ধরা যাক তাঁর নাম বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। বিশ্বকর্মার সৃষ্ট মূর্তিগুলির অধিকাংশই মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও দাঁড়িয়ে আছে কোনার্ক-জগমোহনে। কিন্তু ভাস্করের ব্যক্তিগত জীবনটি ছিল অভিশপ্ত। বিশ্রুতকীর্তি ভাস্কর হওয়া ছাড়া আর কোনও অপরাধ তাঁর ছিল না—স্বাধিকার প্রমত্ততার আর কোনও লক্ষণ তাঁর প্রকাশ পায়নি; তবু যৌবনের প্রথম পর্যায়েই তাঁকে প্রকৃতপক্ষে বন্দী করে আনা হয়েছিল এই অর্কক্ষেত্রে। জগমোহনের উচ্চ অলিন্দে দাঁড়িয়ে সূর্যসাক্ষী মেঘের উদ্দেশ্যে তিনি কুর্চি ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করতেন কিনা তা জানি না, কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা ভাস্করজায়ার সঙ্গে ইহজীবনে আর তাঁর পুনর্মিলন আর হয়নি। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন বিশ্বকর্মা এই অর্কক্ষেত্রেই।

ভাস্কর বিশ্বকর্মা মুক্তি পেলেন, কিন্তু নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার তরফে নিযুক্ত এ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্য প্রমাদ গনলেন—তলা-পোতালের মূর্তির সমতুল্য উপর পোতালের মূর্তিগুলি তখনও অসমাপ্ত। দু একজন বিশিষ্ট ভাস্করকে দিয়ে সে কাজ করানোর চেষ্টা হল—কিন্তু তাদের হাতের কাজ একটুও মনোমত হল না। মহামাত্য চতুর্দিকে সন্ধান করতে থাকেন, বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নেবার মত উপযুক্ত ভাস্কর কেউ কোথাও আছে কিনা। দূত ছুটল কলিঙ্গ রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

শেষপর্যন্ত সন্ধান এল দূতের মুখে। আছে। বিশ্বকর্মার হাতের কাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মত কারিগরও আছে স্বর্ণপ্রসূ কলিঙ্গ রাজ্যে। দূত দেখে এসেছে তার হাতে গড়া পাথরের মূর্তি। সে মূর্তি নাকি অপূর্ব। কোনার্কেও নাকি অমন সুন্দর, অমন প্রাণবন্ত মূর্তি নেই!

ভ্রূ কুঞ্চিত হল মহামাত্যের, বললেন—কী বলছ উন্মাদের মত?

হাত দুটি জোড় করে সংবাদবহ বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি প্রভু; না হ'লে এ দৃষ্টতা প্রকাশ করতাম না।

—তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

—সে অস্বীকার করল। বললে, তোমাদের রাজাও মন্দির গড়ছেন, আমিও মন্দির গড়ছি। আমার সময় নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামাত্য! কে এই দুঃসাহসী ভাস্কর? আত্মসংবরণ করে শুধু বললেন—মন্দির গড়ছে? কোন্ দেবতার মন্দির?

—তা জানি না প্রভু। মন্দির এখনও শুরু হয়নি। সে গড়ছে দেবমূর্তি—আমি সে মূর্তিটি দেখেছি, কিন্তু কোন্ দেবতার মূর্তি তা বুঝতে পারিনি। পুরুষ মূর্তি, মুখখানি এখনও খোদাই করা হয়নি শুনলাম দিবারাত্র সে কাজ করে যাচ্ছে। অশ্বমূর্তি সমাপ্ত হয়েছে, বাকি আছে দেবমূর্তি।

—অশ্বারোহী দেবমূর্তি? হরিদশ্ব?

দূত মাথা নেড়ে বললে—আজ্ঞে না প্রভু। দেবতা অশ্বের উপরে বসেননি, আছেন ভূতলে, অশ্বের বল্গা ধরে অশ্বের গতি রুদ্ধ করছেন।

দুরন্ত কৌতূহল হল মহামাত্যের। সপার্ষদ তখনই রওনা হয়ে পড়েন অশ্বপৃষ্ঠে, কলিঙ্গের দূরতম পল্লীপ্রান্তে।

স্বচ্ছতোয়া মহানদী নদীপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল অশ্বক্ষুরধ্বনিতে। রাজ প্রতিনিধি মহামাত্য নাকি স্বয়ং

এসেছেন গ্রামে। অশ্বারোহীর দল দূতের নির্দেশ অনুসারে এসে থামে গোলপাতায় ছাওয়া একটি পর্ণকুটিরের সম্মুখে। বেরিয়ে আসে নগ্নগাত্রে একজন তরুণ ভাস্কর, তার হাতে ছেনি-হাতুড়ি। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকায় আগন্তুকের দিকে। মহামাত্য আত্মপরিচয় দিতে তাড়াতাড়ি তালপাতার বোনা একটা চাটাই বিছিয়ে দেয় মেটে দাওয়ায়। মহামাত্য অবশ্য তাঁর মহামূল্য বসনে ধূলার প্রলেপ লাগাতে রাজি নন, ওখানে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করেন—তোমার নাম?

—কৌস্তুভ।

—তুমি নাকি পরম ভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি মন্দির গড়ছ?

কৌস্তুভ ম্লান হেসে বলে, আজ্ঞে না। আমি উন্মাদ নই। তাছাড়া কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ইচ্ছা আমার নেই—আমি নিজ অভিরুচি অনুযায়ী একটি দেবমূর্তি গড়ছি মাত্র; মন্দির নির্মাণ করার আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই।

—কোন্ দেবতার মূর্তি?

—ভাস্করের!

—সূর্যের?

—আজ্ঞে না। তিনি স্বর্গের ভাস্কর নন, মর্ত্যের ভাস্কর। সূর্যের অপেক্ষাও তিনি গরীয়ান্!

অর্থ গ্রহণ হয় না মহামাত্যের। তবু অখ্যাত পল্লীবাসীর এ ঔদ্ধত্যে মহামাত্যের দক্ষিণহস্ত চলে গিয়েছিল তরবারির মুঠের দিকে। কোনক্রমে আত্মসংবরণ করে বলেন, আমরা মূর্তিটি একবার দেখতে পারি?

—এ তো আমার সৌভাগ্য। আসুন ভিতরে।

প্রাঙ্গণে রক্ষিত প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তিটির দিকে তাকিয়েই মহামাত্য চমকে ওঠেন, বলেন, এ কি! এ দেবতা কোথায়? এ তো আমাদের ভাস্কর—বিশ্বকর্মা মহাপাত্র!

সবিনয়ে কৌস্তুভ বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরই মূর্তি। আমার কাছে তিনিই স্বর্গ, তিনিই ধর্ম—তিনিই আমার পরমংতপঃ।

—তুমি আমাদের বিশ্বকর্মার পুত্র ?

কৌস্তুভ হেসে বলে—না হলে ও কথা বলব কেন ?

কৌস্তুভের কোন ওজর আপত্তি শুনতে রাজি নন মহামাত্য। বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ কৌস্তুভ ছাড়া আর কেউ শেষ করতে পারবে না। কিন্তু তরুণ শিল্পীও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বললে—মায়ের সমস্ত অভিশপ্ত জীবনটা আমার চোখের উপর কেটেছে, এ আদেশ আপনি করবেন না প্রভু। তিনি আজ দৃষ্টিশক্তিহীনা, আমিই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। আর তাছাড়া—সঙ্কোচে থেমে যায় সে।

কিন্তু রাজার প্রয়োজনের কাছে মায়ের চোখের জলের আর মূল্য কি ?

অবশেষে কৌস্তুভ-জননী স্বয়ং এসে জড়িয়ে ধরলেন মহামাত্যের চরণদুটি। কৌস্তুভের অসমাপ্ত বাক্য শেষ করে বললেন, পুত্রের বিবাহ স্থির করেছি। আগামী মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে আমার গৃহে আসছেন নববধূ। এমন সময়ে আপনি এ কী সবনাশের কথা বলছেন ?

মহামাত্যের হৃদয় কিন্তু পাষাণ দিয়ে গড়া।

বধূও গ্রামের মেয়ে। নাম লক্ষ্মী। সত্যি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। লক্ষ্মীর সঙ্গে কৌস্তুভের শিশুকাল থেকেই জানা শোনা। খেলাঘরের বর-বউ হ'ত ওরা। তারপর লক্ষ্মী বড় হয়েছে, এখন সে সঙ্কোচে তার বাল্যবন্ধুর সামনে আসে না বড় একটা। ওদের গভীর প্রণয়ের কথা গ্রামবাসী সকলেরই জানা আছে। তারা বারে বারে কাতর অনুনয় বিনয় করতে থাকে। শেষে লক্ষ্মীর বাবা এসে হাত দুটি জোড় করে বলেন, আশীর্বাদ হয়ে গেছে ; এ কন্যার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব। আপনি ওকে দেখুন,নিজে চোখে দেখলে আপনি কিছুতেই অমন লক্ষ্মীর প্রতিমার এতবড় সর্বনাশ করতে পারবেন না।

ভীড়ের ভিতর থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত অর্ধোন্মাদ পিতা টেনে নিয়ে আসে ব্রীড়াবনতা একটি নতমুখী বালিকাকে। সলজ্জে এগিয়ে এসে সে মহামাত্যের পদধূলি গ্রহণ করে। তাকে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান মহামাত্য। এমন পরমা সুন্দরী একটি নারীরত্ন যে এ ছায়াঘন পল্লীপ্রান্তে লুকিয়ে থাকতে পারে তা যেন ধারণাই ছিল না মহামাত্যের। ধীরে ধীরে বলেন, তুমি সত্যই বলেছ। এমন অপূর্ব সুন্দরী কন্যাব অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আমি কথা দিচ্ছি মহারাজের আশীর্বাদে এ কন্যার সর্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে দেব আমি; কিন্তু তার পূর্বে কৌস্তুভকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে মহারাজের সভায়। সব কথা বলতে হবে তাঁকে।

কৌস্তুভ বলে—স্বর্ণালঙ্কারে আমাদের প্রয়োজন নেই, এ মূর্তি অসমাপ্ত রেখে আমি কোথাও যাব না, রাজশক্তির এমন ক্ষমতা নাই—

তাব মুখ চেপে ধরেন বিশ্বকর্মার অন্ধপত্নী। কথাটা শেষ হয় না, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না কারও।

তবু আশ্চর্য, মহামাত্যের কোনও ভাব বৈকল্য দেখা গেল না। তিনি বোধকরি খেয়াল করেননি ঐ অসমাপ্ত বাক্যের ঔদ্ধত্য। বললেন, এ মূর্তির বক্তব্য কি কৌস্তুভ? ও কেন অমন করে অশ্বের বল্‌গা চেপে ধরেছে?

তরুণ ভাস্কর ম্লান হেসে বলে—কোনার্ক মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্যকে বুঝিয়ে দিতে হবে মূর্তির ব্যঞ্জনা? বেশ তাই দিচ্ছি—আপনারা যে মন্দির গড়ছেন উত্তরকাল তাকে বলবে নরসিংহদেবের সূর্যমন্দির। তারা জানবে না এ মন্দিরের প্রধান ভাস্করের নাম—তারা চিনবে না বিশ্বকর্মা মহাপাত্রকে। আমার এ মূর্তি তাই সেই ভাবীকালকে ডেকে বলবে—তোমরা শোন! কোনার্ক তীর্থে নভচারী মার্তণ্ডদেবের রথাশ্বের বল্‌গা একদিন চেপে ধরেছিলেন

বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। অরুণ চালিত সে স্বর্গীয় রথাশ্ব সৃষ্টির আদিকাল থেকে মহাপ্রলয়ের শেষদিন পর্যন্ত মহাকাশে চলবে, শুধু চলবে ;—কিন্তু মর্ত্যে, এই কোনার্ক ক্ষেত্রে মানুষের হাতে সে গতিশূন্য। চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত স্বর্গের ভাস্করের অশ্ব মর্ত্যের ভাস্করের হাতে নিশ্চল, গতিহীন—পাষাণ!

মহামাত্য বলেন, এই যদি হয়, কৌস্তুভ, তবে এ মূর্তিও আমি নিয়ে যাব কোনার্ক ক্ষেত্রে। সে মন্দিরের উত্তর দ্বারে স্থায়ী আসন পাবে এ মূর্তি। পৃথিবী দেখুক, স্বর্গের ভাস্করের অশ্ব মর্তের ভাস্করের হাতে কী ভাবে গতিহীন হয়েছে।

কৌস্তুভ বললে, তথাস্তু।

মহামাত্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কৌস্তুভের স্বহস্তে গড়া বিশ্বকর্মার মূর্তিটি আজও আছে কোনার্ক-জগমোহনের দক্ষিণদ্বারে, যদিও সে মূর্তি আজ মুণ্ডহীন (চিত্র—৪৩)। কৌস্তুভও রেখেছিল তার প্রতিশ্রুতি। বছরের পর বছর সে কাজ করে গেছে কোনার্কে ; তরুণ ভাস্কর হয়েছে প্রৌঢ়, ক্রমে বৃদ্ধ! কে জানে হয়তো সেও তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল ওখানেই। কোনার্ক-জগমোহনের উপর পোতালে তার হাতের কাজ আজও দেখতে পাবেন—বুঝতে পারবেন না, সে মূর্তিগুলি নিচ পোতালের ভাস্করের হাতে গড়া নয়! বোধকরি পুত্রের হাতে পিতার পরাজয় ঘটেছিল!

বৃদ্ধ গাইডকে থামিয়ে দিয়ে আমি হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলাম—আর লক্ষ্মী? কৌস্তুভের নিরলস পরিশ্রমের বিনিময়ে মহারাজ কি লক্ষ্মীর সোনার অঙ্গ সোনা দিয়ে সত্যিই মুড়ে দিয়েছিলেন?

বৃদ্ধ গাইড ম্লান হেসে বলেছিল, মহামাত্য কি তাঁর কথার খেলাপ করতে পারেন? মহারাজ সত্যিই স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে!

কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল বৃদ্ধের ঐ হাসিটায় ; তাই পুনরায়

প্রশ্ন করেছিলাম—কিন্তু লক্ষ্মীও কি কৌস্তুভ-জননীর মত উপেক্ষিত অন্ধ প্রোষিতভর্তৃকার জীবন যাপন করেছিল ?

আবারও হেসে গাইড বলেছিল, না বাবুজি। মহামাত্যের মত মহারাজও বলেছিলেন, এমন সুলক্ষণা কন্যার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! লক্ষ্মীর বিবাহ হয়নি—মহারাজ স্বয়ং তার সুব্যবস্থা করেছিলেন—সে হয়েছিল দেবদাসী! দেবতার মন্দির-চত্বরে খঞ্জনী বাজাতো সে! কৌস্তুভ তারও মূর্তি গড়েছিল! লক্ষ্মীর ছবিই তো এতক্ষণ আঁকছিলেন আপনি!

স্বীকার করছি, এ কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই—এ গল্প বিশ্বাস করাও শক্ত। তবু মন চায় বিশ্বাস করতে—যেন তা হলেই এ নারীমূর্তিটির ঐ ব্যঞ্জনার হদিস মেলে। ওর চোখে কোন্ মাঘী শুক্লা সপ্তমীর কুয়াশা ঢাকা চন্দ্রালোক! পিগ্‌ম্যালিয়ানের মত প্রাণের সবটুকু আকূতি উজার করে গড়েছে বলেই কৌস্তুভ নারীমূর্তিটি এভাবে রূপায়িত করতে পেরেছে—পাথর তো নয়, ও মূর্তি যে প্রেম দিয়ে গড়া! (প্লেট—৮)।

জানি, দুর্বল হাতের স্কেচ দিয়ে ওদের সে ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করতে পারব না। তবু স্কেচগুলির সাহায্যে আশাকরি আপনারা মন্দির-দর্শনকালে মূর্তিগুলিকে সনাক্ত করতে পারবেন।

ভৈরব মূর্তিগুলি ষড়ভুজ। শবের উপরে নৃত্যরত। চতুর্মুখ ঐ ভয়াল মূর্তিগুলির নৃমুণ্ডমালা, ভীষণদর্শন আয়ুধ, বিকট আস্য এবং বিকশিত শ্ব-দন্ত যেন কন্যামূর্তিগুলির ফাঁকে ফাঁকে তাদের পেলবতাকে আরও বিকশিত করে তোলে।

তৃতীয় পোতালের উপরে আর কন্যামূর্তি নেই—ভীষণদর্শন সিংহ। তার উপর শাস্ত্রমত ঘণ্টা-শ্রী, আমলক প্রভৃতি। কলস ও আয়ুধ অপহৃত।

জগমোহন অংশের বর্ণনার শেষে এই স্থাপত্য-কীর্তিটির সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। সুপণ্ডিত শ্রীনির্মলকুমার বসু এর

ঔৎকর্ষ বিচার করে প্রসঙ্গক্রমে বলছেন, "জগমোহন রচনায় প্রধান দোষ হইল ইহাতে আঁটাআঁটি ভাবের আতিশয্য। বড় দরজা, জানালা প্রভৃতির ফাঁক থাকিলে জমাট ভাবকে আরও নরম ও সুন্দর করিয়া তুলিত, কিন্তু তাহা হয় নাই"।[১] আমরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এই আঁটাআঁটি ভাব—যেটা এখন পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে তার জন্য দায়ী পুরাতত্ত্ব বিভাগের মেরামতির কেরামতি। উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার বন্ধ করে দেওয়ায় বন্ধভাবটা যেন বেশী মনে হচ্ছে। ফার্গুসন সাহেবের গত শতাব্দীতে আঁকা ছবিতে (চিত্র—৩৫) ঐ আঁটাআঁটি ভাব অতটা নেই। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চরথ-দেউলের খাঁজগুলি এই বদ্ধভাবকে কিছুটা দূরীভূত করে—তাই উড়িষ্যার দেব-দেউলে গবাক্ষের অপ্রতুলতা চোখে ততটা লাগে না। জগন্নাথ-লিঙ্গরাজ অথবা অনন্ত বাসুদেবের তুলনায় এখানে পোতালের সংখ্যা বেশী হওয়ায় একটির বদলে দুটি কাণ্টি (বা পায়রা ঘর) তৈরী হয়েছে। সেগুলি বাইরে থেকে দেখতে 'ক্লিয়ার-স্টোরি' জানালা বা খোলা বারান্দার রূপ নেয়। যদিও সে অংশ দিয়ে জগমোহনে আলো-বাতাস প্রবেশ করে না তবু আপাতদৃষ্টিতে বদ্ধতার দোষকে তারা বিদূরিত করে।

জগমোহনের স্থাপত্যগুণের বিষয়ে বসু মহাশয় যা বলেছেন তার অপেক্ষা অল্পকথায় এর গুণ বর্ণনা অসম্ভব মনে করে তাঁর উদ্ধৃতিটুকুই তুলে দিলাম, "প্রধান পিষ্ঠ বিস্তারে উভয় মন্দিরকে ছাপাইয়া গিয়াছে বলিয়া মন্দির যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এইভাব ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার উপর বরণির কৃশ বিভাগগুলির অনুপাতে পাভাগের পঞ্চকামের অপেক্ষাকৃত অধিক দৈর্ঘ্য এইভাবকে আরও স্পষ্ট করিয়াছে। অন্যান্য বিভাগের মত যদি আবার কুম্ভে ও খুরায় নক্শার আতিশয্য থাকিত, তবে দর্শকের মনোযোগ অলঙ্কারেই অধিক নিবদ্ধ হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যকে (দৃঢ়তার ভাব পোষণ করা)

১) কণারকের বিবরণ, পৃ ৩৪—শ্রীনির্মলকুমার বসু।

বিফল করিয়া দিত। ভদ্রগণ্ডীর বিশাল ভার বাড় অংশ সহ্য করিতে পারিবে কি না এবং হয়তো রথগুলি পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইবে এমন আশঙ্কা করার কারণ আছে। কিন্তু বান্ধনা এমন কৌশলে সন্নিবিষ্ট যে এই আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। বিভিন্ন রথের সন্ধিস্থলে শক্তির প্রতীক বিরালমূর্তি এই ভাবকে আরও পুষ্ট করিয়াছে।...কণারকের মন্দির যে সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার সৌন্দর্যে বিশিষ্টতা আছে। তাজমহলের মত মেঘলোকের অপার সৌন্দর্য উহাতে নাই, তবে তরুলতায় উপশোভিত পাহাড়ের প্রশান্ত সৌন্দর্য এখানে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা বিশ্বেরই মত বিরাট ও গম্ভীর, আবার তাহারই মত রসে ও প্রাণের আবেগে টল্‌টল্‌ করিতেছে।"

সংক্ষেপে বলতে পারি: তাজমহল যেন মেঘলোকে উধাও শেলীর ভরতপক্ষী, আর কোনার্ক বাড়্‌সবার্থের ভরতপক্ষী—'True to the kindred points of heaven and home!'

জগমোহনের পূর্বদ্বার: জগমোহনের তিন দিকে তিন দ্বার ছিল, পশ্চিমদিকে বড়-দেউলের গম্ভীরায় (গর্ভগৃহে) যাবার উপযুক্ত একটি দ্বার ছিল। তার ভিতর একমাত্র পূর্ব দ্বারটি অনেকাংশে অক্ষত আছে। উত্তর দ্বারে কিছুটা অবশিষ্ট আছে অবশ্য। পূর্বদ্বারের বর্ণনা নিম্নোক্তরূপ:

দ্বারের জ্যাম্ব্‌-অংশে পাশাপাশি নক্‌শা আছে। ভিতর থেকে বাইরের দিকে প্রথম সারিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য, দ্বিতীয় সারিতে নাগবন্ধী অর্থাৎ জোড়া-সাপের নক্‌শা, তৃতীয় সারিতে ছোট ছোট চৌখুপিতে মিথুন মূর্তি। চতুর্থ সারিতে একটি লতা বেয়ে যেন ছোট ছেলের দল উপরে উঠ্‌ছে—এই বিচিত্র নক্‌শাটির ওড়িয়া নাম 'গেলবাঙ্গ' অথবা মনুষ্য-কৌতুকী। পঞ্চম সারিতে আবার নূতন জাতের একরকম নক্‌শা, ষষ্ঠ সারিতে চতুর্থ সারির অনুরূপ মিথুন-মূর্তি। সপ্তম ও শেষ সারিতেও একটি প্রচলিত নক্‌শার কাজ—

যার নাম বরঝাঞ্‌ঝি। এই সারি দেওয়া নক্‌শাগুলি প্রত্যেকটির নিচে একটি করে মনুষ্য-মূর্তি।

এই প্রকাণ্ড দরজার ফ্রেমের উপর ছিল একটি লিণ্টেল—তাতে ছিল নবগ্রহের মূর্তি। এই নবগ্রহের মূর্তিসম্বলিত প্রস্তর খণ্ড-খানিকেই কলকাতার যাদুঘরে আনবার প্রচেষ্টা হয়েছিল—বর্তমানে সেটি আছে মন্দিরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটি ঘরে, স্থানীয় পুরোহিতদের হাতে নবগ্রহ আজও পূজা পান।

ফার্গুসনের হাতে-আঁকা ছবিতে দেখছি নবগ্রহের উপরে কেন্দ্র-স্থলে ছিল একটি প্রকাণ্ড মূর্তির অর্ধোত্থিত ভাস্কর্য (বাস-রিলিফ)। চিত্র দেখে মনে হয় এ মূর্তিটি কম করেও ৮′ × ৬′ মাপের ছিল। সেটি নিশ্চয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। মূর্তিটি পদ্মাসনে বসা কোন পুরুষের মূর্তি বলে মনে হয়। যেহেতু নবগ্রহের মধ্যেই সূর্যমূর্তি খোদিত হয়েছে—তাই এটি সূর্যমূর্তি নয়। কৌতূহল হয় জানতে—সেটা কার মূর্তি ছিল। দুপাশে দুটি অর্ধস্তম্ভের (Pilaster) উপরেও দুটি বড় মূর্তি ছিল।

জগমোহনের শিল্পনিদর্শনগুলি আমরা দেখা শেষ করেছি ; এর পর বড়দেউল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তার পূর্বে কোনার্ক জগমোহনের চূড়ার জ্যামিতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই। জগমোহনের প্ল্যান বা ভূমি-নক্‌শা আমরা দেখেছি, চিত্র—৩৬-এ। আমরা জানি কোন স্থাপত্য নিদর্শনের প্ল্যান বল্‌তে বোঝায় সেক্‌সানাল-প্ল্যান ; অর্থাৎ বাড়িটির জানালা-বরাবর ভূমির সমান্তরালে কর্তৃত অংশের ভূমি-নক্‌শা। অথবা বলা যায় বাড়ির প্ল্যানে আমরা দেখতে পাই বাড়িটির জানালা পর্যন্ত গাঁথনি হবার সময় যে-রূপ নেবে সেটাই। এবার আমরা দেখব জগমোহনের চূড়ার প্ল্যান। অর্থাৎ মনে করুন কোন একজন ফটোগ্রাফার হেলিকপটারে চড়ে ঠিক চূড়ার কেন্দ্রবিন্দুর উপর থেকে ক্যামেরার মুখ নিচের দিকে করে ফটো নিলেন। তাহলে আমরা

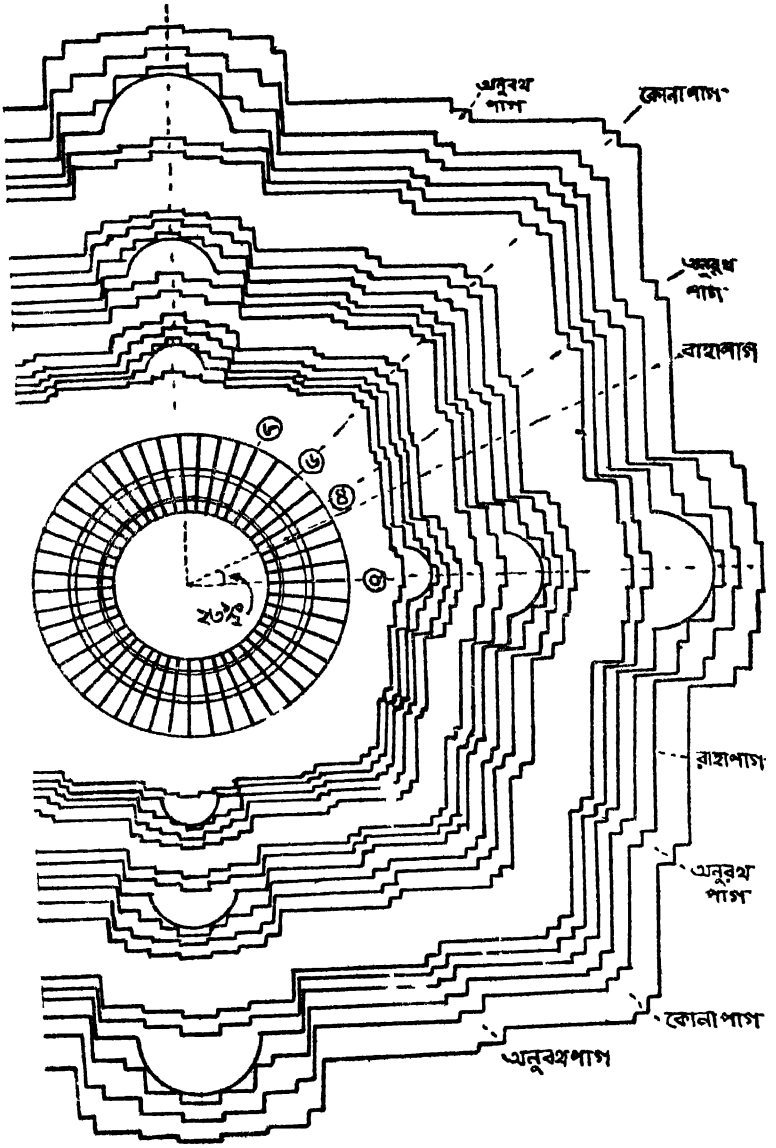

চিত্র—৩৭

কোনার্ক মন্দিরের চূড়ার (আংশিক) ভূমি-নক্শা

মন্দির-চূড়ার যে ফটো দেখতে পাব চিত্র—৩৭-এ প্রায় সেই ছবিটিই দেখানো হয়েছে।

জগমোহনের চূড়ার এই পরিকল্পনা নক্‌শাটি আমি এঁকেছি ক্যাপ্টেন নির্মল সেনগুপ্ত মহাশয়ের অঙ্কিত নক্‌শার অনুকরণে। এ বিষয়ে শ্রীসেনগুপ্ত বছর দশেক আগে দেশ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন (দেশ, ১৩. ৫. ৬১., ২৮ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা)। প্রথম পোতালে উঠে কিছু মাপজোপ নিয়ে এবং সূর্যালোকে মন্দিরের যে ছায়া মাটিতে পড়ে তাই মেপে দেখেই একক প্রচেষ্টায় নির্মল সেনগুপ্ত মশাই প্রায় নির্ভুল নক্‌শাই তৈরী করেছিলেন। প্রথম পোতালের উপরে উঠবার অনুমতি ও ক্ষমতা আমার ছিল না—এ নক্‌শা নির্ভুল কিনা পুরাতত্ত্ব বিভাগই সে কথা বলতে পারেন। বছর দশেক আগে শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত বলেছিলেন "আমরা লাইব্রেরি খানাতল্লাস করেছি, কিন্তু সে-রকম কোন ফটোগ্রাফ পাই নি। কোন বিশেষজ্ঞ আকাশ থেকে দেখা নক্‌শা তৈরী করেছেন এ রকম সংবাদও পাই নি। অতএব খানিকটা ফটোগ্রাফের ভিত্তিতে একটা কাল্পনিক আকাশী নক্‌শা তৈরী করা গেছে।" দশবছর পরেও আমি এ জাতীয় কোন ফটো বা আলোচনার সন্ধান পাইনি।

চিত্র—৩৭ লক্ষ্য করে দেখুন কেন্দ্রস্থলের আমলকে ৪৮টি পল-তোলা দাগ আছে। অর্থাৎ আমলকের প্রতিটি 'পল' কেন্দ্রে ৭½° কোণ রচনা করছে। দেখা যাচ্ছে, ঐ আমলক-রেখাগুলি বর্ধিত করলে বিভিন্ন পোতালের কোণাগুলির অবস্থান সূচিত করে। নির্মলবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন, "এই নক্‌শার ভিত্তি খুঁড়লে অনেক জ্যামিতিক তথ্য পাওয়া যায়···হয়তো পাঠকের তাতে রুচি নেই এই আশঙ্কায় সে আলোচনায় নিরস্ত হলাম।"

আমাদের কিন্তু আর একটু তলিয়ে দেখার রুচি আছে।

চিত্র—৩৭-এর সঙ্গে পঞ্চরথ-দেউলের শাস্ত্রসম্মত ভূমি-নক্‌শার (চিত্র—২২) তুলনা করে দেখছি যদিও কোণাপাগের কোণা ৪৫°

ডিগ্রিতেই অবস্থিত, কিন্তু অনুরথ-পাগের কোণা ২৭° কোণ রচনা করছে না, করছে ৩০° কোণ। অর্থাৎ পঞ্চরথ-দেউলের যে শাস্ত্র-সম্মত মাপজোপ তা এক্ষেত্রে মেনে চলা হয়নি। আরও দেখছি আমলকের ৪, ৬, এবং ৮নং 'পল' বর্ধিত করলে যেমন দুটি অনুরথপাগ ও কোণাপাগের কোণা পাওয়া যাচ্ছে সে-ভাবে কোন আমলক-পল বর্ধিত করে রাহাপাগের কোণা দুটি পাচ্ছি না। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে স্থপতিবিদ কেন এটা করলেন? জ্যামিতিক হিসাবের এই বিস্তারিত কচকচি করতে হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে, সেটা এবার বলি:

কোণাপাগের অংশটি ৭½° ডিগ্রির গুণিতকে তৈরী হয়নি—সেটি কেন্দ্রস্থলে ২৩½° কোণ রচনা করছে। এখন এই ২৩½° সংখ্যাটা আমাদের অতি পরিচিত—এটাকে কাকতালীয় বলে মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। আমরা জানি পৃথিবী তার বার্ষিক গতিপথ থেকে ঠিক ২৩½° বেঁকে দৈনিক পাক খাচ্ছে; অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা বিষুববৃত্তের সঙ্গে ঐ ২৩½° কোণ রচনা করছে। আরও সহজভাষায় বলা যায় যে, মন্দিরের অবস্থান যদি এমন হয় যে বিষুব সংক্রান্তির দিন ০-সংখ্যক আমলক-পলের বরাবর সূর্যোদয় হবে, তাহলে মকর-সংক্রান্তি ও কর্কট-সংক্রান্তিতে সূর্যোদয় হবে রাহাপাগের দুইপ্রান্তের দুটি সরল-রেখা বরাবর! এ জাতীয় কোন চিন্তা কি মূল স্থপতিবিদের মাথায় ছিল? তাই কি তিনি পঞ্চরথ-দেউলের সাধারণ নিয়ম বাতিল করেছেন এই সূর্য-মন্দিরের রাহাপাগের দৈর্ঘ স্থির করার সময়? না হলে এই জ্যামিতিক নক্শায় সর্বত্র ঐ ৪৮-পাপড়ি বিশিষ্ট আমলকের ৭½°র মূল ছন্দ মেনে চলে রাহাপাগের ক্ষেত্রে হঠাৎ তিনি ২৩½° করলেন কেন? কথাটা ভাববার।

বড় দেউল: বড় দেউলের বাহির দিয়ে আমরা ইতিপূর্বে মন্দির প্রদক্ষিণ করেছি। বাড়-অংশের কিছু কিছু যদিও অবশিষ্ট আছে তবু

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কিছু সেখানে নেই। গর্ভগৃহ বা গম্ভীরা সমচতুষ্কোণ, ভিতরে কলিঙ্গ-কানুন অনুসারে কোন কারুকার্য নেই। ধ্বংসস্তূপ সরানোর পর মূলবিগ্রহের যে সিংহাসনটি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে সেটিকে আমরা ভাল করে দেখতে পারি। ভাঙা অংশে উপর থেকে নিচে নামার উপযুক্ত সিঁড়ি নতুন করে গড়া হয়েছে।

সিংহাসনের নিচে একটি উপান আছে— তাতে গজযুথের মূর্তি। সিংহাসনের একটি স্কেচ এঁকে এখানে দিলাম (চিত্র—৩৮)।

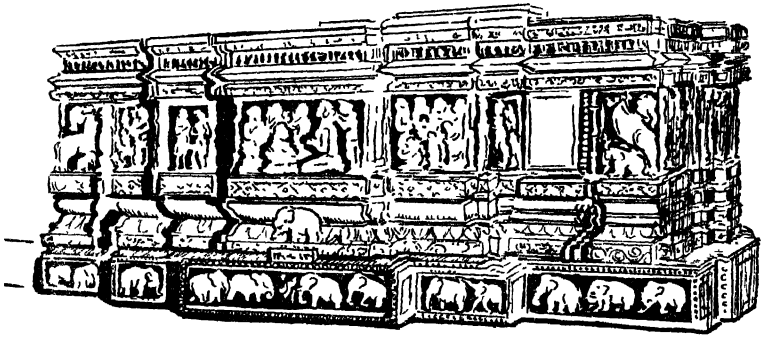

চিত্র— ৩৮ ॥ কোনার্ক বিমানের সিংহাসন

বড়-দেউলের উচ্চতা সম্বন্ধে আমরা আন্দাজ করেছি, বলেছি সেটা অন্তত ২২০′ উঁচু ছিল। এবার আমরা দেখব, কেন ও-কথা আমরা বলেছিলাম।

রাজা নরসিংহদেব তাঁর মহাপাত্রকে নিয়ে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে বড় দেউলটির মাপ নিয়েছিলেন—তখন কলস ও ধ্বজা ছাড়া সমস্ত মন্দিরটি টিকে ছিল। মহারাজ যে মাপ লিপিবদ্ধ করিয়েছেন সেটা দেখছি ১১৬ কাঠি-২০ আঙ্গুল। মহারাজের আঙ্গুলের কি মাপ ছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু তিনি জানিয়ে গেছেন যে ১কাঠি= মহারাজের ২৮ আঙ্গুল। আগেই বলেছি সহজ ঐকিক নিয়মের সাহায্যে আমরা রেখ-দেউলের উচ্চতা নির্ণয় করতে পারি। সেটা এবার দেখা যাক :

মহারাজ মাপ করে বলেছেন—রেখ-দেউলের গম্ভীরার (গর্ভ-গৃহের) মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ১৮ কাঠি, প্রস্থে ১৮ কাঠি ৮ অঙ্গুলি। বাস্তবে মেপে দেখলাম সেটা আমার হিসাবে ৩২′-১০″ × ৩২′-১০″ ; —নির্ভুল চতুষ্কোণ বর্গক্ষেত্র।

যদি ১৮ কাঠি = ৩২′-১০″ হয়, তাহলে ১১৬ কা: ২০ অ: = ২১২ ফুট ১০ ইঞ্চি।

তেমনি যদি ১৮ কা: ৮অ: = ৩২′-১০″ হয় তাহলে ১১৬ কা: ২০ অ: = ২০৯ ফুট ১১ ইঞ্চি।

এই দুই মাপের গড় = ২১১′-৪½″ ; ধরা যাক	২১১′-৬″
চিত্র—৩৫-এ প্রদর্শিত পিষ্ঠের মাপ যোগ করতে হবে =	১৩′-১″
কলস ও ধ্বজার মাপ[১] ও যোগ করা দরকার =	৬′-০″
সুতরাং সর্বসমেত উচ্চতা	= ২৩০′-৮″

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কলস সমেত পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির (২১৪′-০″) অথবা লিঙ্গরাজের মন্দির (১৬৩′-০″) অপেক্ষা কোনার্ক-দেউলের উচ্চতা বেশী ছিল।

বড়-দেউলটি যদিও ধ্বংসস্তূপ তবু তার তিন দিকে তিন পার্শ্ব-দেবতার কথা না বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা চলে না। বড়-দেউলের তিনদিকে সূর্যদেবেরই তিন মূর্তি। দক্ষিণে দণ্ডায়মান পূষা, পশ্চিমে দণ্ডায়মান সূর্যদেব এবং উত্তরে অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হরিদশ্ব। চিত্র—৩৬-এ এঁদের অবস্থান সূচীত হয়েছে। ফলে খুঁজে বার করা কঠিন নয়। পূষা ও হরিদশ্ব সূর্যেরই অপর দুই ধ্যানমূর্তি। সূর্য ও পূষার

১। নরসিংহদেবের অমাত্য বলছেন—ধ্বজা-কলস ওঁরা স্বস্থানে দেখেন নি। অথচ মাপ লিখে গেছেন ৩ কাঠি-৭ অঙ্গুলি (অর্থাৎ ৬ ফুট)। সম্ভবত : কলস ও ধ্বজার যে দণ্ডটি (চুম্বক-লুহা-ধারণ) তিনি স্বস্থানে দেখেছিলেন তা থেকেই ঐ মাপ আন্দাজ করতে পেরেছেন।

মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প, কিন্তু উত্তর-পার্শ্বদেবতা হরিদশ্ব অশ্বারূঢ়। একে একে এঁদের এবার দেখা যাক।

সূর্য : এঁর মূর্তি প্লেট—১-এ দেওয়া হয়েছে। প্রায় আট ফুট উঁচু সমভঙ্গ মূর্তি, সপ্তরথ-পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান। দুই হাতে দুই পদ্ম ছিল—ভেঙে গেছে। মাথায় মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ, কর্ণে কুণ্ডল, গোমুখ-কাণ্ডে রত্নোপবীত, কোমরে সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত কটিবন্ধ, পায়ে বুট জুতা। তোরণের উপরে কীর্তিমুখ—দুইপাশে দুইসারি নৃত্যগীতরতা। তার নিচে—মূলমূর্তির চিবুকের সমতলে দুই দেবমূর্তি দুপাশে সাজানো। স্বস্তিকাসনে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পালন-কর্তা বিষ্ণু। নাভির সমতলে দুই পাশে দুটি করে সর্বমোট চারটি স্ত্রী-মূর্তি। এঁরা চারজন সূর্যের চার পত্নী—রাজ্ঞী, নিক্ষুভা, ছায়া ও সুবর্চসা। এই চারটি স্ত্রী-মূর্তির নিচে দুটি কাখর-মুণ্ডি মন্দিরের সম্মুখে অস্ত্রধারী দুই পার্শ্বচর। দুজনেই আভঙ্গ-ঠামে দণ্ডায়মান। সূর্যের দক্ষিণ চরণপ্রান্তে ঊর্ধ্বমুখ নতজানু মূর্তিটি হচ্ছে এ মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজের। পাশে পড়ে আছে তাঁর কোষমুক্ত তরবারি। তাঁর বিপরীতে সূর্যদেবের বাম চরণপ্রান্তে অনুরূপ যুক্ত-কর ভঙ্গিমায় এ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। সূর্যের দুই অনুচর—শ্মশ্রুমণ্ডিত দণ্ড ও স্ফীতোদর পিঙ্গলের ক্ষুদ্রায়তন দুটি দণ্ডায়মান মূর্তি রাজার ও রাজপুরোহিতের যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে। সূর্যের ধ্যানমন্ত্রে দণ্ড-পিঙ্গল ও খড়্গধারী ঐ দ্বারপালদ্বয়ের উল্লেখ আছে :

দ্বিহস্তস্থ সরোজন্ম শবলাশ্বরথস্থিতঃ
দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালৌ চ খড়্গিনৌ॥

ঐ সূর্যমূর্তির সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়ান—শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে উচ্চারণ করুন ঈশোপনিষদের দেই প্রার্থনামন্ত্র :

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপহিতম্ মুখম্।
তৎ তং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

তবেই সার্থক হবে আপনার কোনার্ক তীর্থদর্শন।

চিত্র—৩৯ ॥ পূষা ; কোনার্ক

পূষা : সমভঙ্গ-ঠামে দণ্ডায়মান পূষা-মূর্তির হাত দুটিও ভেঙে গেছে। (চিত্র—৩৯) অলঙ্কার,—কণ্ঠহার, রত্নোপবীত, মুকুট ইত্যাদি একই রকম। এবার তাঁর নাভির সমতলে চার স্ত্রী নেই, আছেন দুজন। রাজা ও রাজপুরোহিত অপসৃত ; কিন্তু দুই দ্বারপাল, দণ্ড ও পিঙ্গল স্বস্থানে আছেন। এবার পূষামূর্তির চরণতলে রথের সপ্তাশ্ব ও সারথী অরুণকে লক্ষ্য করে দেখুন। সপ্তাশ্বের মূর্তিগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিন অশ্ব অতীত—তিন অশ্ব ভবিষ্যৎ— তারা বিপরীতমুখী ; 'অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে' তাদের যাত্রা। একমাত্র ব্যতিক্রম কেন্দ্রস্থলের অশ্বটি। সেটি সোজাসুজি দর্শকের দিকে ফিরে আছে—একমাত্র সেই হচ্ছে বর্তমান। গাইড আপনাকে সহজেই বুঝিয়ে দেবে ঐ সপ্ত-অশ্ব হচ্ছে সপ্তাহের সাত বারের প্রতীক। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ ঠিক তাই নয়। সূর্যদেবের যে হিরণ্ময় মহারথ সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে শেষ মহাপ্রলয়ের সূর্যাস্তের দিকে ছুটে চলেছে তারই রথচক্র নির্ঘোষে ছন্দিত হয়ে উঠ্‌ছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের তাল-মান-লয়—সেই মহাসঙ্গীতের মূলে আছে সপ্তছন্দ ! এই সপ্তছন্দেই উদ্‌গীত হয়েছে চতুর্বেদের যাবতীয় সামগান। সেই সপ্ত-ছন্দ হল : গায়ত্রী-উষ্ণিক-অনুষ্টুপ-বৃহতী-পংক্তি-ত্রিষ্টুপ আর জগতী। ঐ সপ্তাশ্ব এই সাতটি মূল ছন্দের প্রতীক। দণ্ডায়মান পূষা-মূর্তির সম্মুখেও যাওয়ার আগে রেখে যান আপনার ভক্তিভারনম্র প্রণতি। মনে মনে বলুন—

"ঘন অশ্রুবাষ্পেভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি দেখা দিক ফুটি॥"

তাহলেই পাবেন কোনার্ক-তীর্থ-পরিক্রমার আশীর্বাদ !

হরিদশ্ব : উত্তর পার্শ্বদেবতা হচ্ছেন অশ্বারূঢ় হরিদশ্ব (চিত্র—৪০)। সেই কনকমুকুট, স্বর্ণকুণ্ডল, অভেদ্য-কবচ, রত্নোপবীত, কটিবন্ধ। এবারে আঁকবার সময় পার্শ্বস্থ ব্রহ্মাবিষ্ণু ও সহচরদের

চিত্র—৩০ ॥ হরিদশ্ব। কোনার্ক

মূর্তিগুলি বাদ দিয়ে মূলমূর্তিটিকেই বড় করে এঁকেছি। হয়ারূঢ় হরিদশ্বের ধ্যানমন্ত্রের সঙ্গে আপনারা এ-মূর্তির ব্যঞ্জনা নিজেরাই মিলিয়ে নিতে পারবেন :

একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্ !
হস্তদ্বয়ং পদ্মধরং কঞ্চুকশ্চর্যবক্ষসম্ ॥
সর্বাভরণসংযুক্তা কেশহার সমুজ্জ্বলা।
এবমুক্তরথস্তস্য মকরধ্বজ ঈষ্যতে ॥
মুকুটঞ্চাচি দাতব্যমন্যৎ সর্বং সমণ্ডলম্।
একবক্ত্রাঙ্কিতো দণ্ডো স্কন্দস্তেজস্করাম্বুজম্ ॥
কৃত্বা তু স্থাপয়েৎ পূর্বপুরুষাকৃতরূপিণৌ।
হয়ারূঢ়স্থ কুর্বীত পদ্মস্থং বার্চনামকম্ ॥
স দিব্যমানবপূষং সর্বলোকৈকদীপকম্।

অরুণ স্তম্ভ : জগমোহনের পূর্বদ্বারের সম্মুখে ছিল একটি ধ্বজ-স্তম্ভ ; তার শীর্ষে ছিল সূর্যসারথী অরুণের মূর্তি—যুক্তকর নতজানু ভঙ্গি তাঁর। অরুণের শাস্ত্রসম্মত মূর্তিতে সচরাচব নিম্নাঙ্গ তৈরী করা হয় না—এ ক্ষেত্রে অরুণ পূর্ণাবয়ব, সম্ভবতঃ সূর্যদেবের বরে বিকলাঙ্গ অরুণ রোগমুক্ত হয়েছিলেন এমন একটা ইঙ্গিত কবতে চেয়েছেন শিল্পী। এই স্তম্ভটি মহারাষ্ট্রীয় শাসনকালে পুরী মন্দিরে নীত হয় ; এখন সেখানেই এটি দেখতে পাওয়া যাবে।

দ্বাররক্ষক মূর্তি : পূর্বেই বলেছি, জগমোহনের তিন দ্বারের সম্মুখে সোপানের অনতিদূরে এবং মন্দির চত্বরের ভিতরেই নির্মিত হয়েছিল তিন দুকুনে ছয়টি বৃহদায়তন মূর্তি। প্রকাণ্ড পাদপীঠের উপর এগুলি রক্ষিত ছিল। উত্তর দ্বারের দিকে দুটি হস্তী, দক্ষিণ-দ্বারে দুটি অশ্ব এবং পূর্বদ্বারে হস্তীদলনকারী শার্দুল মূর্তি। এই মূর্তিগুলি জগমোহনের দিকে পিছন করে ছিল, যদিও হস্তী ও অশ্ব-মূর্তিগুলিকে এখন মন্দিরমুখী করে রাখা হয়েছে। মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত এমন প্রকাণ্ড মূর্তির পরিকল্পনা ভারতীয় দেব-

দেউলে সচরাচর দেখা যায় না। শিবমন্দিরের সম্মুখে নান্দী বা বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে পৃথক গরুড় মূর্তির ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে এরা বাহন নয়, দ্বারপাল নয়—শুধু শোভাবর্ধনের জন্য এদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্বযুগের স্থাপত্য নিদর্শন—মিশরের স্ফিংস্ অথবা সেম্ননের কলোসীর[১] তুলনা করা চলে।

চিত্র—৪১ ॥ হস্তীদলনকারী শার্দুল। কোনার্ক পূর্বদ্বাররক্ষী

হস্তীদলনকারী শার্দুল : ১৮৩৮-খ্রীষ্টাব্দে কিট্টোর আঁকা ছবি থেকে দেখা যায় যে, এই মূর্তিদুটি পূর্বদ্বারে রক্ষিত ছিল। ফার্গুসনের

১। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৫০ অব্দে তৃতীয় এ্যামিনফিস্ কর্তৃক কার্নকে নির্মিত।

চিত্রেও (চিত্র—৩১) এটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাদপীঠের মাপ ছিল—দৈর্ঘ্যে ১০ ফুট, প্রস্থে ৬ ফুট, উচ্চতায় ১০½ ফুট। চিত্র—৪১-এ এর একটি স্কেচ এঁকেছি। মূর্তিটির মাপ ৮′-৪″ × ৪′-৯″ × ৯′-২″। ওজন অন্ততঃ ৭৫০ মন।

খ) **হস্তী :** হস্তী দুটি বন্যহস্তী নয়—সুসজ্জিত রাজহস্তী। কিন্তু মদমত্ত এই হস্তীদ্বয় শুঁড়ে করে জড়িয়ে ধরেছে হতভাগ্য মানুষকে। ভয়াবহ মূর্তি তার (চিত্র—৪২)।

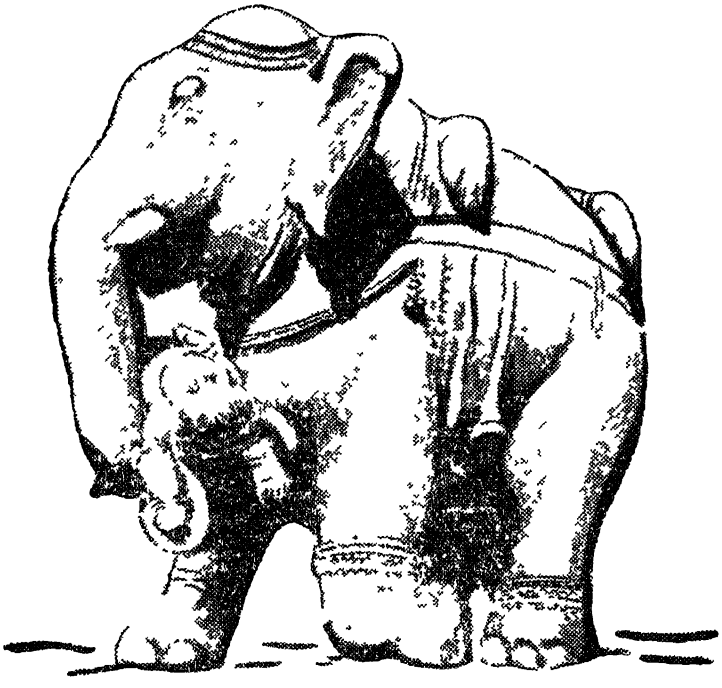

চিত্র—৪২ ॥ হস্তীমূর্তি। কোনার্ক। উত্তরদ্বার রক্ষী

গ) **অশ্ব :** অশ্বদ্বয়ও সুসজ্জিত। (চিত্র—৪৩) সঙ্গে অশ্ব-সেবক এবং অশ্বের পদতলে কোন দুর্বৃত্ত। পূর্বকথিত আমার আষাঢ়ে গল্প যদি আপনারা মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে বলব মুণ্ডহীন পদাতিক সহিস নয়—স্বয়ং বিশ্বকর্মা মহাপাত্র!

হ্যাভেল[১] এই অশ্বগুলির ভাস্কর্যনৈপুণ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন "ঘটনাচক্রে যদি এই অশ্বমূর্তিগুলির নিচে কেউ রোমান অথবা গ্রীক শিল্পের লেবেল মেরে দেয় তাহলে বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ যাদুঘরে সেই পরিচয়েই রোধকবি এদের রাখা চলে।"

চিত্র—৪৩ ॥ অশ্ব ও মুণ্ডহীন পদাতিক—কোনার্ক দক্ষিণদ্বার রক্ষী

ভোগমণ্ডপ : জগমোহনের পূর্ব দিকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে মন্দিরের অক্ষরেখাতেই এই চতুষ্কোণ (৭৪′ × ৭৪′) মণ্ডপটি নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত এটি ছিল পীড়-দেউল—বর্তমানে উর্ধ্বাংশ নেই। চাতালের চারদিকে সিঁড়ি, শুধু পশ্চিমের (জগমোহনের দিকে) দিকে সিঁড়িটি স্থানাভাবের (এর সম্মুখেই ছিল অরুণ স্তম্ভ) জন্য দুপাশে বেঁকে গেছে, অন্যান্য দিকের মত সোজা নামেনি।

১) Indian Sculpture & Painting, P 146-147 by Prof. Havell.

চাতালটি সংলগ্ন জমি থেকে প্রায় ১০ ফুট উচ্চে। চাতালের উপরে ষোলটি স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে—যার উপর মন্দিরটি ছিল। কেউ কেউ[২] এটিকে নাটমন্দির বলে বর্ণনা করেছেন ; এতে এতগুলি স্তম্ভ থাকায় মনে হয় এটি ভোগমণ্ডপ হিসাবেই ব্যবহৃত হত। এরই ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত পাকশালার দরজাটি ঠিক এর উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর আছে।

মায়াদেবীর মন্দির ঃ মূল-মন্দিরের নৈঋর্ত-কোণে (দঃ পঃ) অবস্থিত মায়া দেবীর মন্দিরটিও পরে বালির স্তূপ থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। তার দুটি অঙ্গ—জগমোহন ও দেউল। এ মন্দিরের কারুকার্যও খুঁটিয়ে দেখবার জিনিস। কিন্তু কী পরিকল্পনায়, কী স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এমন কিছু দেখছি না যা বিস্তারিত নিদেশনার অপেক্ষা রাখে। মন্দিরের জলনিকাশী নালার মুখে কষ্টিপাথরে তৈরী কুমীরের মুখটি নজরে পড়বে। এ মন্দিরেরও তিন রাহাপাগে তিনটি পার্শ্বদেবতার মূর্তি ছিল, সূর্য মূর্তিই। দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তের দেবতাদ্বয় এখনও আছেন। পশ্চিম দিকের পার্শ্ব-দেবতার আসনটি শূন্য। ভোগমণ্ডপের উপবে জমা বালুকাস্তূপ অপসারণের সময় একটি সূর্যমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। মনে হয় সেটিই এই মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বদেবতা—কারণ কুলুঙ্গির ফাঁকে মূর্তিটি চমৎকার বসে যায়। এটি বর্তমানে জাতীয় সংরক্ষণশালায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অপর দুটি সূর্যমূর্তির পরিকল্পনা বড়-দেউলের পার্শ্বদেবতাদের অনুরূপ। দক্ষিণ দিকের সূর্যমূর্তির মাথা নেই। এ মন্দিরে আবও একটা দৃশ্য নজরে পড়ল। জগমোহন থেকে গম্ভীরায় যাবার যে দ্বার সেই দ্বারের ডানদিকের জ্যাম্বে একটি মিথুনমূর্তির অশ্লীল ভঙ্গি। এ জাতীয় মূর্তি পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনার্কে যথেষ্ট আছে—কিন্তু গম্ভীরার প্রবেশদ্বারে এ জাতীয় মূর্তি আমি আর কোথাও দেখিনি।

২। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীনির্মলকুমার বসু

মিথুন মূর্তি ঃ কোনার্কের আলোচনা—বস্তুতঃ কলিঙ্গের দেব-দেউল সম্বন্ধে কোন আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এ মন্দির-গুলিতে অবস্থিত তথাকথিত অশ্লীল মিথুন মূর্তির কথা অকথিত থাকে। এ-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। পূর্বাচার্যদের সেই মতামতগুলির কথা আগে বলি। যাঁরা বলেন—বজ্রাঘাত নিবারণের উদ্দেশ্যে বা অসৎলোকের দৃষ্টিপাতে মন্দিরের ক্ষতি হবে মনে করে 'টাবু' হিসাবে ঐ মিথুন মূর্তিগুলি খোদিত হয়েছিল আমরা তাঁদের সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারছি না। যাঁরা বলেন, দেব-দর্শনার্থী প্রকৃত অধিকারী কিনা তা যাচাই করে দেখে নেওয়ার জন্যই ওদের সৃষ্টি—অর্থাৎ এই মূর্তিগুলি দেখেও যাদের মনে কামভাব জাগবে না তারাই মন্দির প্রবেশের অধিকারী তাঁদের সঙ্গেও আমরা খুশী মনে ঠিক একমত হতে পারছি না—কারণ তা যদি হ'ত তা হলে শিল্পশাস্ত্রে এবং পুরাণে সে কথার উল্লেখ থাকবে না কেন? এ ধারণার জন্ম শুধু এই কারণে যে ঐ ধরণের মিথুন-মূর্তি শুধুমাত্র মন্দিরের বহিরঙ্গেই আছে। কেউ কেউ বলেছেন, কামসূত্র অথবা তন্ত্রসাধনার অঙ্গ হিসাবে ঐগুলি খোদিত। আমরা তাও পুরোপুরি স্বীকার করতে পারছি না—কারণ বাৎসায়ন-বর্ণিত কামসূত্রের বিভিন্ন আসন বা বিভিন্ন কামকলা ধারাবাহিকভাবে কোথাও বিবৃত হয়নি। তন্ত্রসাধনার বিষয়েও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তা হ'লে এগুলি কেন এল?

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "কণারকের বিশাল আকার দেখিয়া জানিতে ইচ্ছা হয় কিসের প্রেরণায় শিল্পীরা বহুকাল ধরিয়া এমন রচনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং কিসেই বা এতকাল ধরিয়া তাঁহাদের উৎসাহকে সচেতন রাখিয়া-ছিল।...এতগুলি বদ্ধকাম ও তাহারও অধিক সংখ্যায় রমণীর ললিত মূর্তি দেখিয়া মনে হয় যে শিল্পীদের উৎসাহ সংরক্ষণে এগুলির স্থান নীচে নহে। এরূপ মূর্তি তৈয়ারি করিতে করিতে তাহাদের উৎসাহ

কমিবার কোনও কারণ থাকে না, বরং অবসাদের সময় চিত্রের ব্যাখ্যানবস্তুই তাহাদের কাজে বাঁধিয়া রাখিবে।···পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রধান দেউলের জগমোহনে তৃতীয় পোটলে চিত্র নাই। তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন জমির উপর হইতে যাত্রীরা এত উপরের ছবি ভাল দেখিতে পাইবে না ব লয়া তৃতীয় পোটলে ছবি নাই। কিন্তু শিল্পীদের জন্য বৃথা ওকালতী করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে সহজভাবে দেখা যায় যে ঐ কথা প্রথম ও দ্বিতীয় পোটলের সম্বন্ধেও খাটে। শিল্পীরা এতবড় কাজ করিয়া থাকিলেও, তাহারা যে আমাদেরই মত শ্রান্ত হইয়া পড়িত এবং কোনও কাজ নিরন্তর করিতে করিতে অনেক সময় অশ্লীল উৎসাহবর্ধক ছবি আঁকিত এই রকম কোনও সহজভাবে ভাবিলে অনেক .গাল মিটিয়া যায়।"[১]

অধ্যাপক বসু মহাশয় বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত এবং উড়িষ্যাস্থাপত্য বিষয়ে তিনি প্রামাণিক গবেষণা করেছেন; তবু তাঁর এ সিদ্ধান্তটি আমরা খুশি মনে মেনে নিতে পারছি না। আমাদের মতে গোল অত সহজে মেটে না। প্রথমত ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন কালে মানুষে কোনার্ক-মন্দিরের মত বা তার অপেক্ষাও বড় স্থাপত্যকীর্তি রচনা করেছে। মিশরের পিরামিড, আম্মন বা আবু-সিম্বেলের মন্দির, পারশ্য স্থাপত্যে পার্সিপোলিসেব শত-স্তম্ভের প্রাসাদ, এথেন্সের এ্যাক্রোপোলিস বা পার্থেনন, রোমের প্যান্থিয়ন, সেণ্ট পীটর অথবা বেসিলিকাগুলি আকারে আয়তনে অথবা গুরুত্বে কোনার্ক সূর্যমন্দিরের অপেক্ষা ন্যূন নয়। ভারতবর্ষের অজন্তা-এলোরা, রামেশ্বরমের মন্দির, অথবা তাজমহলে যত কারিগর যত বছর ধরে কাজ করেছে তা-ও কোনার্কের অপেক্ষা কম হবে না। কই সে-সব ক্ষেত্রে তো শিল্পীদের উৎসাহবর্ধনের এই বিচিত্র ব্যবস্থা করা হয়নি? শিল্পীরা যে শ্রান্ত হয়ে পড়তেন একথা অনস্বীকার্য—সব বড় কাজ করতেই শ্রান্তি আসে কিন্তু শুধু সেইজন্যে তাদের কাজে বেঁধে রাখবার এই অভিনব

১) কণারকের বিবরণ, শ্রীনির্মলকুমার বসু (১৯৬০) পৃ—৭৭-৭৮।

আয়োজন অবিশ্বাস্য। কোথায় কোন মূর্তি বসবে তা নিশ্চয় স্থির করে দিতেন একজন পরিকল্পনাকার এবং তিনি যে স্বহস্তে ছেনি-হাতুড়ি চালাতেন না এটা অনুমান করতে পারা যায়। এই রকম একটি মহান শিল্পসম্পদের যিনি মূল নিয়ামক, প্রধান শিল্পনির্দেশক, তিনি নিশ্চয়ই এমন লঘুচিত্তের মানুষ ছিলেন না যে, সাধারণকর্মীরা যাতে শ্রান্তিতে ঝিমিয়ে না পড়ে তাই স্বজ্ঞানে একের পর এক অশ্লীল মিথুন মূর্তি নির্মাণের আদেশ দিয়ে যাবেন! অপরপক্ষে তার নির্দেশ, অনুমতি অথবা অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে সাধারণ শিল্পীরা খেয়াল খুশীমত ক্লান্তি অপমোদনের জন্য অশ্লীল উৎসাহবর্ধক মূর্তি গড়ে যাবে এ কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

দ্বিতীয়তঃ কোনার্ক মন্দিরের শিল্পীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল একথা প্রমাণ করতে অধ্যাপক বসু মহাশয় তৃতীয় পোতালের দৃষ্টান্ত এনেছেন। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ শিল্পীদের ক্লান্তির কথাটা আমরা ইতিপূর্বেই মেনে নিয়েছি—কিন্তু যে যুক্তিটি তিনি দিয়েছেন সেটি মানতে পারছি না। শিল্পীদের পক্ষে ওকালতী করা হচ্ছে জেনেও বলব—একথা তো সত্যই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পোতালের চেয়ে তৃতীয় পোতাল দর্শকের দৃষ্টিপথে অপেক্ষাকৃত দূরে। এজন্যই মন্দিরের বাড়-অংশে যত সূক্ষ্ম ফুল-লতা-পাতা দেখি গণ্ডি অংশে অত সূক্ষ্ম কাজ নেই, মস্তকে সূক্ষ্মতা আরও কম। (চিত্র ২৬ দ্রষ্টব্য) তাছাড়া তৃতীয় পোতাল নির্মাণই যে শিল্পীদের হাতের শেষ কাজ সেটাই বা মেনে নিচ্ছি কোন যুক্তিতে? কাজ হয়তো পুরুষানুক্রমে হয়েছে, হয়তো জগমোহনের তৃতীয় পোতাল শেষ করার পরেই নাটমন্দিরের কাজ শুরু হয়েছিল!

ফলে এই তথাকথিত অশ্লীল মূর্তিগুলির যৌক্তিকতায় শিল্পীদের উৎসাহবর্ধনের হেতুটাকে আমরা আদৌ মানতে রাজি নই। তাহলে কেন প্রধানশিল্পী সজ্ঞানে এগুলি অনুমোদন করলেন?

এ প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে পূর্বাচার্যরা কি বলে গেছেন তা সন্ধান করতে

গিয়ে মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে গতযুগের কয়েক-জন দিকপাল পণ্ডিতের মতামত পেলাম। বিপিনবিহারী গুপ্ত মশাই রোগশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তাঁদের আলোচনাটি 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামে মানসীতে[১] প্রকাশ করেন। বিতর্কমূলক বিষয়টি নিয়ে পরে গুপ্ত মশাই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। এই তিন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতের মতামতের চুম্বকসার এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

গুপ্ত মশায়ের প্রশ্নটি ছিল—"... 'কিন্তু উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দির গাত্রে বীভৎস erotic figures-এর সমাবেশ কেন হইল, এই প্রশ্ন উত্থিত হইবামাত্রই আমরা তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছি; অনেকে স্থির করিয়াছেন যে উহা আর কিছু নহে, কেবলমাত্র হিন্দুর জাতীয় চরিত্রাপকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ হিন্দুর দেব-মন্দিরে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই?"

"রামেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'আপনি আজ যে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন, সে সম্বন্ধে আমি একটু ভাবিয়া দেখিয়াছি। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে ঐ সকল বীভৎস মূর্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নরনারী পুত্রকন্যা-সমভিব্যাহারে সেই মন্দির দর্শন করিতে আসেন; কখনও কাহারও কোন দ্বিধা বোধ হয় না। শুধু পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে কেন, ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরে,—কণারকের সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষে এই প্রকার বীভৎস মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়।...নিশ্চয়ই উড়িষ্যার শিল্পকলার উহা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ...মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একখানি পুঁথি পাইয়াছেন; বোধহয় খ্রীষ্টীয় দশম, কি একাদশ শতাব্দীর হইবে, তাহাতে শিল্প-

১) 'মানসী' পত্রিকা ১৩২০ সালের আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন এবং ১৩২১ সালের আষাঢ়-ভাদ্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রের নিয়মাবলী বিবৃত রহিয়াছে; মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে। মন্দির গাত্র সুশোভন করিবার জন্য এইরূপ erotic figures-এর আবশ্যকতা লিপিবদ্ধ করা আছে।[১] ...যতদূর স্মরণ হয়, স্যার উইলিয়ম হণ্টার তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণীতে এই সকল মূর্তি বৈষ্ণবধর্মসম্পৃক্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, জগন্নাথের মন্দির বৈষ্ণবদের প্রধান মন্দির, প্রধান তীর্থ; কাজেই সেখানে যে বৈষ্ণব সাধনা, পদ্ধতির অনুরূপ আদিরসাশ্রিত চিত্র চিত্রিত হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি?

কিন্তু স্যার উইলিয়ম হণ্টারের এই সিদ্ধান্ত বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রধান আপত্তি এই যে, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার কোন কিছুরই আভাস এই সকল মূর্তির সমাবেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; কোনও প্রকারেই এগুলিকে কোনও একটি বিশিষ্ট ধর্মভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না। এই চিত্রগুলি এতই জঘন্য, এতই অশ্লীল যে, ইতর সাধারণ নরনারীর কুৎসিত পাশবতা ব্যতীত আর কিছু বলিয়া মনে হইতে পারে না। এ গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় কোনও বৈষ্ণবের মনে ধর্মভাব জাগিয়া উঠিবে না। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যদি ইহা বৈষ্ণব ব্যাপারই হইবে তবে ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরে ও কোণারকের সূর্যমন্দিরেব গাত্রে ঐরূপ মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল কেন?

'হণ্টারের কথা ছাড়িয়া দিই; বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাহার অনুমান অমূলক। আর একটা মত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। কেহ কেহ এই মূর্তিগুলির সহিত লিঙ্গ পূজার (phalle worship) সম্পর্ক পাতাইতে পারেন। লিঙ্গপূজা জগৎব্যাপী, এ কথা সত্য।

---

১) অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের সঙ্কলিত পুঁথিগুলির ভিতর এবং 'ভুবন-প্রদীপে' এ নির্দেশ আমার নজরে পড়েনি।

সভ্যতার আদিম যুগে মানবের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল—সৃষ্টিতত্ত্ব'।...”

অতঃপর ত্রিবেদী মহাশয় সভ্যতার আদিম যুগ থেকে লিঙ্গপূজার প্রচলন কীভাবে বিস্তৃতি লাভ করে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন। মিশরের আইসিস-অসাইরিসের লিঙ্গপূজার উপাখ্যান, আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, প্যালেস্টাইন, গ্রীকদের ডাইওনীসিয় উৎসব, রোমানদের ব্যাকাস-পূজার বিষয়ে আলোচনা করে এই উপসংহারে আসেন যে, উড়িষ্যার এই বদ্ধকাম মূর্তিগুলির সঙ্গে লিঙ্গপূজার সম্পর্ক নাই। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, পুরীর মন্দিরের ভিতর বৌদ্ধ প্রভাব অনস্বীকার্য। বললেন, বেদান্ত যদিও দুঃখের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না—তবু সাংখ্যদর্শন দুঃখকে স্বীকার করে। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময়—এবং সে দুঃখের হেতু আছে—দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের পথও আছে। বলেছেন, “ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া গণ্য করিত। ইন্দ্রিয়-গুলিই বিপদ ও বেদনা আনয়ন করে; গলিত ন্যক্কারজনক দ্রব্য সম্মুখে ধরিয়া রূপজ মোহ জয় করিতে হইবে।” তাঁর মতে উপনিষদের নির্দেশ জগৎ আনন্দময়, মধুময়—“যেখানে সংসারটাকে হেয় ও কদর্য করিবার চেষ্টা দেখা যায়, সেটা বৌদ্ধভাবপ্রণোদিত; যেখানে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে ব্রাহ্মণ্যভাব প্রবল।” স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বীরাও ঐ বৌদ্ধপ্রভাবে সংসারের সৌন্দর্যকে কুৎসিত রূপে এঁকেছেন! উদাহরণস্বরূপ তিনি কবি ভর্তৃহরির বৈরাগ্য শতকের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

“স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতং।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্দ্ধি জঘনং
মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিবরবিশেষৈর্গুরুকৃতম্॥”

মোটকথা উপসংহারে ত্রিবেদী মশাই বলেছিলেন—খ্রীষ্টান যেমন

তার চার্চের বাহিরের প্রাচীরে নরকের দৃশ্য এঁকে ভক্তের মনে ভয়ের উদ্রেক করে বলতে চেয়েছে—এই বাহিরের আতঙ্ক থেকে আশ্রয় নিতে তোমবা ভিতরে এস, সেখানে আছেন তোমার ত্রাতা ; তিনি তোমাকে অহরহ ডাকছেন "come unto me, and thou shalt be saved,"—ঠিক তেমনি কলিঙ্গ শিল্পীরা ভক্তের মনে ঘৃণা বা জুগুপ্সার উদ্রেগ করতে চেয়েছেন ঐ মূর্তিগুলির মাধ্যমে। "খ্রীষ্টীয় গির্জায় সেই ভয়েব দিক্‌টা খুব ভয়ানকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধভাবাভিভূত হিন্দুব মন্দিবে বিষয়াসক্তির যে মূর্তি অতি জঘন্য, অতি হেয়, তাহাই দেখান হইয়াছে।"

আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। দেখছি, বিপিনবিহাবী গুপ্ত মশাইও হননি। কারণ এর পর তিনি তাঁর বন্ধু গৌবহবি সেনকে সঙ্গে কবে রোগশয্যায় শয়ান পণ্ডিত অক্ষয়কুমাব মৈত্রেয় মহাশয়েব দরবারে হাজিব হলেন এবং কথা-প্রসঙ্গে বললেন "বিচিত্র প্রসঙ্গের theoryটা ভুল হইল কি ঠিক হইল, সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যটা শুনিতে ইচ্ছা হয়।"

"মৈত্রেয় মহাশয় উত্তব করিলেন—'ও সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুই বলিবার নাই। আব ভুল যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি কি ? বরং যিনি সেই ভুল দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যের ও ইতিহাসের মহদুপকার সাধিত করিবেন। রামেন্দ্রবাবুর এই প্রসঙ্গের ফলে যদি এ বিষয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণাব চেষ্টা আরও পাঁচজনে করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইল।' একটু পরে তিনি বলিলেন—'আমার নিজের কোনও থিওরি নাই ; কিন্তু আমি এ কথা লইয়া উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। তাঁহার একটি থিওরি আছে ; সেটি খুব সমীচীন বলিয়া বোধহয়, কিন্তু একটু গলদ আছে।'

"ঔপরিষ্ট কার্যের চিত্রই উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে বেশীমাত্রায়

দেখিতে পাওয়া যায়।···চিত্রিত পুরুষগুলা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধ যুগের শেষাশেষি নিশ্চয়ই এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন বৌদ্ধধর্মটাকে হেয়, জঘন্য, কদর্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল ; তখন সাহিত্যে চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়কে কামপরবশ পশুত্বে পরিণত করিয়া জনসাধারণের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এ চিত্রগুলা আর কিছু নহে—preaching in sculpture ; মিস্ত্রিরা বাটালি লইয়া খোদাই করিয়া জগৎ-সমক্ষে প্রচার করিতে চাহে যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন অত্যন্ত জঘন্য ও কদর্য ! মন্দির গাত্রে হইল কেন ? কারণ এখানে প্রত্যহই বহুসংখ্যক নরনারী সমবেত হইয়া থাকে। প্রচারকের পক্ষে এমন সুযোগ অন্যত্র নাই।"

পণ্ডিতাগ্রগন্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অথবা শাস্ত্রী-মশায়ের এ ব্যাখ্যায় আমাদের কিন্তু একাধিক আপত্তি আছে। প্রথমতঃ মন্দির গাত্রে খোদিত পুরুষমূর্তিগুলি যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর একথা আদৌ বোঝা যায় না। দাড়ি ও জটাওয়ালা সঙ্গমরত একাধিক পুরুষমূর্তি আছে। জটা ও দাড়ি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর হতে পারে না ! দ্বিতীয়তঃ মৈত্রেয় মহাশয় এবং ত্রিবেদী মহাশয় দুজনেই বিচার করেছেন subjective দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁদের hypothesis হচ্ছে মূর্তিগুলি জঘন্য, ন্যাক্কারজনক, বীভৎস ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁরা ভেবে দেখেন নি এই যে বিশেষণগুলি তাঁরা বারে বারে ব্যবহার করেছেন তা শুধু মাত্র তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যাবতীয় সাধারণ দর্শকের রামেন্দ্র-সুন্দরের মত সুন্দর দৃষ্টি নেই, অক্ষয়কুমারের মত অক্ষয় দেবদুর্লভ চরিত্র নেই। তৃতীয়তঃ শিল্পী কিন্তু যৌন মিলনে আবদ্ধ মূর্তিগুলির মুখভাবে, দেহ সৌকুমার্যে কোথাও বীভৎসভাবের ব্যঞ্জনা আনবার চেষ্টা করেন নি। এ গ্রন্থের প্লেট ১০ এবং প্লেট-১১-তে দুটি যুগলমূর্তির ঊর্ধ্বাংশ মাত্র এঁকেছি। এ দুটি তথাকথিত অশ্লীল বদ্ধকাম

মূর্তি। শুধুমাত্র উর্ধ্বাংশ দেখে কোন দর্শকের কি মনে হবে শিল্পীর উদ্দেশ্য একটা ন্যক্কারজনক দৃশ্যের অবতারণা করা? চতুর্থতঃ, "বৌদ্ধ যুগের শেষাশেষি নিশ্চয়ই এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন বৌদ্ধধর্মটাকে হেয়, জঘন্য, কদর্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল"—এ যুক্তিটাও বোধগম্য হল না। যে যুগে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটা প্রতিবাদরূপে দানা বাঁধছিল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকে মানুষজনকে নিজধর্মে দলে দলে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা প্রতিশোধস্পৃহা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের শিল্পীদের মনে জাগলেও জাগতে পারে—কিন্তু যে যুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিতাড়িত, উড়িষ্যার কয়েকটি সঙ্ঘারামে লুকাইত সে-যুগে এ জাতীয় মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার উগ্র বাসনা কেন জাগবে?

যে প্রশ্নগুলি আমার-আপনার মনে জেগেছে সেটিই শেষপর্যন্ত বললেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ! বিপিনবিহারী গুপ্ত মশাই অতঃপর আচার্য শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঐ একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু ঐতিহাসিক বা বিজ্ঞানী নন, তিনি দার্শনিক। ফলে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারায় তিনি বলতে পারলেন—

"উড়িষ্যার মন্দির গাত্রের চিত্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে। ঐ যে ভিতর ও বাহির, স্বর্গ ও নরক, উহা ঠিক ঐ ভাবে দেখা যায় কিনা, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। নরক বলিলে যে বিভীষিকার ভাব মনে স্বতই উদিত হয়, ঐ চিত্রগুলি দেখিয়া তাহা হয় কি? হইতে পারে যে, বিশুদ্ধ চিত্ত সাধু-সজ্জনের চিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়; কিন্তু আপামর সাধারণ বোধহয় নেহাৎ ঘৃণার চক্ষে দেখেন না; মানুষের মধ্যে যে পশুটি সুপ্ত হইয়া আছে, সে যে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে না, এমন কথা বলা যায় না। য়ুরোপের cathedral-গুলির সম্বন্ধে কিন্তু ঐ স্বর্গ নরকের থিয়োরী খাটে। সে-সকল মন্দিরগাত্রে শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চিত্রিত হইয়াছে; তাহা দেখিলে খ্রীষ্টানের

মনে ভীতি উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; সে চিত্রগুলা বাস্তবিকই বীভৎস।··খ্রীষ্টানের নরকের ও purgotoryর চিত্র তাহার গির্জাঘরের গাত্রে খোদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে উহা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সে-সকল চিত্রে বিভীষিকার দিক্‌টা ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কারিগরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে, উহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

"শিল্পী নানাপ্রকার চিত্রে প্রাচীর অলঙ্কৃত করিত। হয়তো বা স্বর্গ-নরকের চিত্র থাকিত ; বুদ্ধের জাতক গল্পের বা খ্রীষ্টের লীলা-প্রসঙ্গ খোদাই করা হইত ; সাংসারিক ধর্মভাববিবর্জিত চিত্রও থাকিত (naturelistic, secular, positive), যেমন যুদ্ধ, ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদি গ্রীক ও রোমক সৌধের গাত্রে এইরূপ চিত্র দেখা যায়। কিন্তু জগন্নাথের চিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ইহার কারণ কি ? উড়িষ্যা অঞ্চলেই বা ইহার বাহুল্য দেখা যায় কেন ?

"বৌদ্ধমঠে সাধনার যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার পর্যালোচনা করিলে একটা তান্ত্রিক রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিতে পারা যায়। ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য সন্ন্যাসীদিগকে এই প্রকার জঘন্য পাশব ব্যাপার চিন্তা করিতে হইত। মধ্যযুগে য়ুরোপের মঠগুলিতে সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গৃহীর জন্য এ সাধনার ব্যবস্থা হয় নাই ; সন্ন্যাসীর জন্য হইয়াছিল। এখন মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল বৌদ্ধমঠে রাজমিস্ত্রি ও অন্যান্য মিস্ত্রি পুরুষানুক্রমে কাজ করিত। য়ুরোপের মধ্যযুগের মঠ-গুলিতে সন্ন্যাসীরা নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিত। মন্দির গাত্রের অধিকাংশ চিত্রই তাহারা স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়াছিল ; স্বহস্তে illuminate করিয়া পুঁথি রচনা করিত, অনেকে মন্দির নির্মাণে রাজমিস্ত্রির কাজ করিত। বৌদ্ধমঠে সন্ন্যাসীরা স্বহস্তে

শিল্পকার্য করিত না[১] বটে ; কিন্তু তাহারা design করিত ; মিস্ত্রি তদনুযায়ী খোদাই করিত। মিস্ত্রিরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এই তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি তাঁহাদেরই অনুজ্ঞাক্রমে খোদাই করিয়া মন্দিরগাত্রে প্রকটিত করিত। তদবধি সমস্ত mural decorationএ ঐ চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ধারা রহিয়া গেল। হিন্দু সভ্যতার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে বাহির হইতে সহজে কোনও একটা নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু একবার গ্রহণ করিলে আর বর্জন করিতে পারে না। এ স্থলে অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বর্জন করাইবার machinery য়োরোপে যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে সেরূপ ছিল না ; প্রতাপান্বিত পোপ ছিল না, Inquisition ছিল না, প্রবল State ছিল না। সে যাহা হউক, এই বর্জন করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুন অনেক দোষ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেশের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি একবার গৃহীত হইলে আর তাহাকে বর্জন করা দুঃসাধ্য হইল।

"কিন্তু দেশের লোকে আপত্তি করিল না কেন ? দ্রাবিড় জাতির মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল (promiscuous) ছিল। তাহাদের চোখে এরূপ চিত্র জঘন্য বা হেয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।..."

আচার্য শীল মহাশয়ের দুটি কথা খুবই মনে লাগে। প্রথম কথা—এ জাতীয় বন্ধকাম মূর্তির মূলে আছে ধর্মীয় বামাচার, বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মেরই হ'ক, শাক্ত তান্ত্রিকদেরই হ'ক বা অন্যকোন প্রভাবেই হ'ক। দ্বিতীয় কথা—দেশের লোকে আপত্তি করেনি, কারণ তাদের চোখে এর ভিতর জঘন্য বা হেয় কিছু লাগেনি।

হ্যারিসন ফোরমান তাঁর Though Forbidden Tibet

---

১) একথা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ কেন বলেছিলেন ? আমার তো ধারণা অজন্তা গুহার অধিকাংশ চিত্র বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা স্বহস্তে এঁকেছিলেন,—ভাড়া করা চিত্রকর দিয়ে নয়।

(London 1936—পৃ ১০৭-৯) গ্রন্থে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বামাচারের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লাহ্‌ক্রুগ বৌদ্ধমঠের লামার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর মঠাধিকারী তাঁকে কিছু গুহ্যতত্ত্ব জানিয়েছিলেন। লেখক বলছেন, মঠের ভিতরে একটি বিশেষ গুহ্যগৃহে এই আচার অনুষ্ঠিত হয়। সে গৃহের প্রাচীরে অশ্লীলতম চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা। এই গৃহেই লামা সাধনা করেন। ক্রমে সেই গৃহে একাধিক সুন্দরী নর্তকী প্রবেশ করে এবং বিবস্ত্র অবস্থায় নৃত্যগীত পরিবেশন করে। লামা কখনও একা থাকেন কখনও সপার্ষদ। শুধু তাই নয়, প্রাচীর গাত্রে যেসব দৃশ্য আছে সাধনার শেষ পর্যায়ে লামাকে তাই বা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করতে হয়। কামের উর্ধ্বে ওঠার এ পরীক্ষা নাকি ওঁদের আবশ্যিক।

মহাযান বা বজ্রযান তন্ত্রের এই জাতীয় বামাচার কলিঙ্গের পুষ্পগিরি বিহার বা অন্যান্য বিহারেও যে সে যুগে অনুষ্ঠিত হত না তাই বা বলি কি করে? এই প্রভাব ব্রাহ্মণ্যধর্মের মন্দিরে এসে পড়াও অসম্ভব নয়।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত Orissa and Her Remains গ্রন্থে এই তথাকথিত অশ্লীল মূর্তিগুলির কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি—এটিকে "a most perplexing feature of Orissan Architecture" বলে ক্ষান্ত হয়েছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়[১] বলেছেন "the presence of indecent figures on religions edifices is still a puzzle," অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসুর বক্তব্য তো পূর্বেই আলোচনা করেছি।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি, যদিও বিশ্বকর্মার বাস্তুশাস্ত্রে, ময়দানবের ময়মতম্-এ অথবা উড়িষ্যার ভুবন-প্রদীপে মন্দির গাত্রে মিথুন চিত্র আঁকবার কোন নির্দেশ আমার নজরে পড়েনি, কিন্তু এ

১) History of Orissa, Vol. II, P. 401.

জাতীয় নির্দেশ কোথাও নেই তা-ও জোর গলায় বলতে পারছি না। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার ৫৫ পরিচ্ছেদে দেখছি :

"শেষং মঙ্গল্যবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষৈঃ স্বস্তিকৈর্ঘটৈঃ।
মিথুনৈঃ পত্রবল্লভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ॥"

'প্রমথ' অর্থে শিব তথা শিবমন্দির। ফলে শোভাবর্ধনের আঙ্গিক হিসাবে শিবমন্দিরে সর্প, মঙ্গল, বিহগ, বেলগাছ বা ঘট ও স্বস্তিক চিহ্নই যথেষ্ট হয়—মিথুন মূর্তিও আঁকতে হবে; কিন্তু মিথুন মূর্তি মানে মৈথুনরত নরনারী নয়। নর ও নারীর পাশাপাশি মূর্তি। আলিঙ্গনবদ্ধ বা চুম্বনরত যুগলমূর্তিও সে অর্থে মিথুন মূর্তি। অন্য স্থানের কথা জানি না,—কলিঙ্গের মন্দিরে আদি হিন্দু যুগে কিন্তু মৈথুনরত মূর্তি নেই—পরশুরামেশ্বরের প্রতিটি প্রাচীর আমি খুঁটিয়ে দেখেছি; যুগল মূর্তি আছে, আলিঙ্গনবদ্ধ মিথুন মূর্তিও আছে কিন্তু তাদের নিম্নাঙ্গ অপ্রকট। এ মূর্তির প্রথম আগমন (অন্তত যা দেখতে পাচ্ছি তাতে) বৈতাল ও শিশিরেশ্বরে—অর্থাৎ আদি হিন্দু যুগের শেষপাদে—যখন ভৌমকরদের তান্ত্রিক পূজা-অর্চনা শৈব উপাসকদের অন্যপথে টানছে। ইতিহাস বলছে, ভৌমকর নৃপতিদের একাধিক ব্যক্তি মহাযানী পুষ্পগিরি বিহারে যাতায়াত করতেন—মহাযান ধর্ম কেউ কেউ গ্রহণও করেছিলেন। ফলে তাদের প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে এ জিনিস প্রথম প্রবেশ লাভ করে একথা অনুমান করা যেতে পারে।

পূর্বসূরীদের বক্তব্য আলোচনা করে এবার এ ভ্রান্তি অপনোদনে আমার কি মনে হয় তা বলি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ভ্রান্তিটা 'অশ্লীলতা'র বিষয়ে যে মানদণ্ডটা আমরা বেছে নিয়েছি সেখানেই। 'অশ্লীলতা' কোন শিল্পবস্তুতে বস্তুগতভাবে থাকে না। তার মূল্যায়ণ শিল্পের উপলব্ধিতে; পাঠক-দর্শক-শ্রোতা বা বোদ্ধা-নিরপেক্ষ কোন শিল্পসম্ভার অশ্লীল হতে পারে না। ফলে শিল্পের অশ্লীলতার মৌল উপাদান বস্তুতঃ শিল্পে থাকে না, থাকে শিল্পের বাহিরে—দর্শক,

শ্রোতা বা পাঠকের মনে। আর তার কোন সর্বজনগ্রাহ্য একক নেই —'য়ুনিট' নেই ; তাকে তৌল করা চলে না। তার বিচার আপেক্ষিক-ভাবে হতে পারে মাত্র। বক্তব্যটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করি। এ মালটা আমার কাছে ভারী, আপনার কাছে হাল্‌কা মনে হতে পারে ; চায়ের কাপটা আমার কাছে গরম আপনার কাছে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মনে হতে পারে ; ও লোকটা আমার চোখে বেঁটে আপনার চোখে বেশ লম্বা মনে হতে পারে— তা হোক ; কিন্তু আপনার-আমার বিচার নিরপেক্ষ ওজন-উত্তাপ এবং দৈর্ঘ্যের একটা বিজ্ঞানসম্মত মাপ আছে যা দিয়ে ঐ গুণাগুণ-গুলির সর্বজনগ্রাহ্য বিচার চলতে পারে। কিন্তু ছবিটা কেমন উৎরেছে, গানটা কেমন লেগেছে অথবা নাটকটা কেমন জমেছে তা তৌল হতে পারে একমাত্র আপনার-আমার বোধের নিরিখেই— সেখানে কোন ওজনদাড়ি নেই, কোন থার্মোমিটার অথবা ফুটরুল নেই ! 'অশ্লীলতা' জিনিসটাও ঐ দ্বিতীয় জাতের। তাই ওটা আপেক্ষিক।

কয়েকটা উদাহরণ নিই। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' এককালে অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' একসময়ে খোলা আলমারিতে রাখা হত না। বাঙলা গদ্যরীতি প্রচলিত হওয়ার পূর্ব থেকেই উচ্চকোটি বাঙালী সমাজে ব্রাহ্মপ্রভাব দেখা দিয়েছিল— যার ফলে 'শ্লীলতা'র একটা তাৎকালীন সংজ্ঞা সমাজে গৃহীত হয়ে-ছিল এবং সে সমাজ ব্রাহ্মসমাজ নয়, শিক্ষিত বাঙালীর সমাজ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের ভাষায় নরনারীর মিলন-বর্ণনা দিতে পারেন নি, হয়তো ভারতচন্দ্রকে তিনি সুরুচিসম্মত মনে করতেই পারেন নি। তবু সেই ব্রাহ্ম যুগের বাতাবরণেও বঙ্কিম মানুষের ঐ আদিম-বৃত্তির স্বীকৃতি শিল্পে রেখে গেছেন। তাঁর উপন্যাসের একটি পাত্রকে বলতে শুনেছি "যে-বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্ত সহায় হইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির

বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডুয়ণ করিতেছে, করিগণ করিনীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে রূপজ মোহ মাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিতা, ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে এবং ইহা সর্বজীবমুগ্ধকারী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি; বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান।"

তবু বলব, ভারতচন্দ্রও লরেন্স বা মোরাভিয়ার ভাষাতে নামতে(?) পারেন নি। যে বর্ণনা শেষোক্তরা খোলাখুলিভাবে করেছেন ভারতচন্দ্র সেখানেও প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন—বলেছেন 'গিরি অধোমুখে কাঁদে' ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র যেমন গৃহদাহে শেষপর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ঝড়ের রাত্রের বর্ণনা দিয়েছেন ডিহিরী-অন-শোনের মিলনরাত্রে! আজকের অনেক সাহিত্যিককে এ দেশেই দেখছি ঝড়ের প্রতীক্ষায় আর প্রহর গুন্‌তে হচ্ছে না, গিরিকে অধোমুখে কাঁদাতে হচ্ছে না!

আসুন শিল্পের আর এক দিগন্তে, চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে। শুনেছি 'বিন্দুর ছেলে' ছায়াছবিতে বিন্দু তার ছেলের চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করছে এ দৃশ্যে নাকি এককালে সেন্সর থেকে আপত্তি হয়েছিল। আর আজকে খোসলা-কমিটির রিপোর্ট একেবারে অন্য সুরে কথা বলছে। বিদেশী আনসেন্সার্ড ছবি যাঁরা দেখেন তাঁরা জানেন পশ্চিমে অশ্লীলতার মানদণ্ডটা কোথায় ধরা হয়েছে! এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক ফেদারিকো ফেলিনি তাঁর সাম্প্রতিকতম সৃষ্টি 'দ্য স্যাটিরিকন' চিত্রে প্রাচীন রোমের বীভৎস এবং অমানুষিক দৃশ্যাবলী নাকি দেখিয়েছেন। শুনেছি, কোন রকম অপরাধ তথা মনোবিকারের ব্যাপার নাকি এখানে বাদ যায় নি। এ কাজের সাফাই গাইতে ফেলিনি বলছেন "...যে কোনও শিল্পকর্ম দর্শকের বোধকে আঘাত করে। সেইটাই শিল্পের লক্ষণ। আমাদের মনের শান্তি বিঘ্নিত হ'ক এটা আমরা চাই না। কিন্তু সেই শান্তিভঙ্গ করাই শিল্পের কাজ।"[১]

১). আনন্দবাজার—৬. ২. ৭০ শহর সংস্করণ

ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্ননারীদেহ আমদানির বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন পণ্ডিত সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন—"পশ্চিমখণ্ডে সমুদ্রতীরে প্রায় নগ্ননারীদেহ দেখতে সবাই অভ্যস্ত, প্রকাশ্যে সেখানে চুম্বন প্রচলিত, কিন্তু ভারতীয় সমাজে ওগুলি চলে না, তাই ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে ওগুলি অশ্লীল।" যুক্তিটা আমার বোধগম্য হয় নি। ঐ ফর্মুলা মেনে নিলে চিত্রে বা ভাস্কর্যেও নগ্ননারীদেহ অশ্লীল বলে ধরা উচিত, কথাসাহিত্য থেকেও নরনারীর মিলন বর্ণনা বাদ দেওয়া উচিত। নরনারীর জীবনের কোন একটি তথাকথিত গোপন অধ্যায় শিল্পে রূপায়িত হলেই তা আপত্তিকর হতে পারে না। বিবস্ত্রা কোন স্ত্রীলোককে পথে ঘাটে দেখলে আমরা আঁৎকে উঠব, কিন্তু চিত্র-প্রদর্শনীতে সপরিবারে ন্যুড-স্টাডি দেখতে তো কই আমাদের সঙ্কোচ হয় না? শিল্পে নগ্ননারীর মূর্তি যে কত প্রাচীন তা ভাবলে অবাক হতে হয়—কোয়ার্টারনারি যুগের শেষ দিকে মানুষ যখন প্রায় 'হোমো স্যাপিয়ান্‌স্' জন্তু ছিল তখন থেকেই সে ফ্রান্সের গুহাপ্রাচীরে নগ্ননারীর চিত্র এঁকেছে। তারপর যুগে যুগে দেশে দেশে শিল্পীদল নগ্ননারীর চিত্র এঁকেছেন, মূর্তি গড়েছেন—সমাজে তাই বলে বিবস্ত্রা স্ত্রীলোককে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়নি।

সুতরাং মেনে নিতেই হবে "সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি-দুর্নীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কারণ, সামাজিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় তাই হয়তো শিল্পীকে রসবোধে উদ্‌বোধিত ক'রে এমন-কিছু রচনা করাতে পারে যা শিল্প হিসাবে অন্য হাজার হাজার লোককে সংস্কারবদ্ধ খণ্ডিত ধারণার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ রসোপলব্ধিতে নিয়ে যাবে। বিষয় বিশেষকে লোকে বলুক দুষ্ট কিন্তু মায়াবী তুলির স্পর্শে তাতে বিষয়াতীত এমন-কিছু ফুটে উঠবে যা অভিনব। যে দেখে বা যে অনুভব করে সেই বিষয়ীর দৃষ্টি-ভঙ্গির ইতরবিশেষে ও চেতনার তারতম্যেই নির্ভর করে—বিষয়টি

সুনীতি-দুর্নীতির স্তরেই থেকে যাবে না তার উর্ধ্বে উঠবে।"[১]

মোদ্দা কথাটা তাহ'লে দাঁড়াল এই, যে মানুষ যেহেতু পশু নয় তাই মানবজীবনের একটি পর্যায়—প্রজননের আবশ্যিক পর্যায়, সে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়—এটা তার সামাজিক প্রয়োজন। সে পর্যায়টা অনস্বীকার্য তাই সেটাকে বাদ দেওয়া চলবে না, কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনে তাতে একটা আবরণের দরকার।

কিন্তু তাও বোধহয় ঠিক বলা হল না। কারণটা মানুষ পশু নয় বলে নয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বর্বর অনুন্নত জাতি। তবু ঐ উলঙ্গ আদিবাসীরা প্রকাশ্যে সঙ্গত হয় না। হস্তীযূথের ভিতর থেকে মদোন্মত্ত করী-করিনী বার হয়ে আসে এবং গভীরতর জঙ্গলে একান্তে তাদের যৌনজীবন যাপন করে। বিভিন্ন পশুপক্ষীর জীবনেও জীববিজ্ঞানীরা secondary sexual character-এর আবরণ লক্ষ্য করেছেন—যাতে প্রজননের বাস্তব প্রয়োজনের উপর একটা নূতন ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। মানুষ এটাকেই করে তুলেছে শিল্প, একেই দিয়েছে নূতন নাম, প্রেম!

সুতরাং মানবজীবনের সেই তথাকথিত গোপন অধ্যায়ের প্রকাশ শিল্পে কতটা হবে, কোভাবে, কী ভঙ্গিতে হবে, নলচের আড়াল কতটা পড়বে, আদৌ পড়বে কিনা তার বিচার করবে সমসাময়িক যুগের মানুষের রুচি। দেশকাল পাত্র ভেদে সে বিচারটা বদলাতে বাধ্য। দণ্ডকারণ্যে কোকামেটা মাড়াইয়ে (বাৎসরিক মেলায়) এই সেদিনও উন্মুক্ত-বক্ষা শতাধিক যুবতীকে যেভাবে নাচে অথবা খেলাধুলায় অংশ নিতে দেখেছি সেভাবে কোন অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের কোন শহর-গঞ্জে হওয়া অসম্ভব। সহস্র সহস্র দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল—কারও কাছে দৃশ্যটা বিসদৃশ মনে হয়নি। এমনি অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। ভারতবর্ষে নরনারীর যৌনজীবনের বিকাশ

১) শিল্পকথা, নন্দলাল বসু, পৃঃ ১৮

সমাজে ও শিল্পে কীভাবে মূর্ত হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, তাঁর Continent of Cerce গ্রন্থে। তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের যে ধারণা তাব সঙ্গে সে যুগের চিন্তাধারায় অনেকাংশেই মিল ছিল না। এ ছাড়া একই যুগে একই কালে বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ হতে পারে। নব্যভারতের একজন জাতীয় নেতা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন পুরী ও কোনার্কের ঐ অশ্লীলমূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলা উচিত। এ প্রসঙ্গে নন্দলাল তখন বলেছিলেন 'কিছুকাল পূর্বে পুরী ও কোনারকের মন্দিরের বহির্ভিত্তিস্থিত বন্ধকাম (ঐ গুলিকে দুর্নীতিপূর্ণ না বলে আদি রসাত্মক বলা উচিত। শিল্পবস্তুর শ্রেণী-বিভাগ সম্ভব নীতির দিক থেকে নয়, রসের দিক থেকে। রসের ব্যভিচার ঘটালেই শিল্পের পক্ষে তা 'দুর্নীতি'। রসের ব্যভিচার ঘটিয়ে 'শিল্প'কে সামাজিক সুনীতি-প্রচারেও লাগানো যায়। যথার্থ শিল্প সৃষ্টি তা নয়।) মূর্তিগুলি নষ্ট করবার কথা হয়েছিল। অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রস্তাব। ঐগুলি গেলে শিল্পসৃষ্টির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই চলে যায়। নিশ্চয় করে বলতে পারি নে, পুরী ও কোনারকের ভাস্কর শিল্পী কেন এমন বিষয় নির্বাচন করেছিল। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। মানুষের জীবনে যে নবরসের লীলা এটি তার অন্যতম রস—আদি রস। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রসসৃষ্টি হিসাবে উক্ত মূর্তিগুলি খুবই উচ্চ শ্রেণীর।"[১]

এই প্রসঙ্গে শিল্পের সংজ্ঞা হিসাবে টল্‌স্টয় যেকথা বলেছেন তাও স্মরণ কবা যেতে পারে। আজকের যুগচেতনায় টল্‌স্টয় প্রাচীনপন্থী, তবু তিনি এ বিষয়ে কি বলেছেন সংক্ষেপে বলি। টলস্টয়ের মতে "...সুতরাং, শিল্পবস্তুতে নূতন কিছু থাকা অপরিহার্য, কিন্তু নূতন কোন কিছু পরিবেশন করলেই তা আর্ট পর্যায়ভুক্ত হবে না। আর্ট পদ বাচ্য হতে হলে তাকে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে :

১) শিল্পকথা, নন্দলাল বসু, পৃঃ ১৯

১) নূতন চিন্তাধারা এবং তার বিষয়বস্তুটি মনুষ্য সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

২) বিষয়বস্তুটি এমনভাবে ব্যক্ত করতে হবে যাতে তার ব্যঞ্জনা মানুষের বোধগম্য হয়।

৩) শিল্পীকে তাঁর শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করবার মুল প্রেরণাটি যেন তাঁর আন্তরিক তাগিদে হয়—বাহ্যিক আরোপিত কারণে না হয়।"

সুতরাং টলস্টয়ের মতে ফেলিনির 'দ্য স্যাটিরিকন' তখনই শিল্প পদ বাচ্য হবে যখন আমরা তার মধ্যে নূতন কিছু পাব, তা বুঝতে পারব এবং এও বুঝতে পারব যে বক্স অফিসের মুখ চেয়ে ঐ ব্যভিচার দৃশ্যগুলি পরিবেশিত হয়নি। অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে যৌনচিত্রাবলীর প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সেগুলি যদি প্রাসঙ্গিক হয়, বোধগম্য হয় এবং যদি বুঝি রাতারাতি সংস্করণ শেষ করার শুভবুদ্ধির তাগিদে সেগুলি লেখকের কলমের ডগা থেকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসেনি তখনই তাকে শিল্প পদবাচ্য বলে মেনে নেব।

নন্দলালের সূত্রই মানি অথবা টলস্টয়ের সূত্রই মানি পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনার্কের বন্ধকাম মূর্তিগুলি শিল্পপদবাচ্য। কারণ দেখা যাচ্ছে একটা বিশেষ যুগে নরনারীর তথাকথিত গোপনজীবনের মিলন দৃশ্য রসসৃষ্টির তাগিদে শিল্পে অনুমোদন পেয়েছিল কলিঙ্গ দেশে। নীতির ব্যভিচার ঘটেছে কিনা জানি না, রসের ব্যভিচার কিছু ঘটেনি। মূর্তিগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়, তার রস ও ব্যঞ্জনা সর্বজনগ্রাহ্য এবং নিঃসন্দেহে এদের সৃষ্টির মূল প্রেরণা শিল্পীর আন্তরিক তাগিদে। নূতন কিছু দিতে অপারগ ফুরিয়ে যাওয়া কথাসাহিত্যিক যেভাবে যৌন-ব্যভিচারের চিত্র এঁকে নূতন করে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা চান, কোনার্কের শিল্পীর তেমন কোন তাগিদ ছিল না।

আর শুধু কোনার্কেই বা কেন, শুধু কলিঙ্গ দেশেই বা কেন—

, খাজুরাহের মন্দিরে, এলোরা গুহায়, মাদুরায়, খান্দেশের বালাসনে, নাসিক জেলার সিন্নারে এমনকি বাঙলাদেশের মন্দির ভাস্কর্যেও এ ধরনের বন্ধকাম মূর্তি দেখেছি। কারণটা সর্বত্রই ঐ এক—দেশকাল-পাত্র ভেদে শিল্পে রসসৃষ্টির প্রয়োজনে সেগুলি অনুমোদন পেয়েছিল। এতে দোষেরই বা কি আছে? আর এর জন্য এত যুক্তি খোঁজারই বা কি আছে?

অন্যান্য অঞ্চলের কথা যাক, কলিঙ্গের দেব-দেউলে দেখছি অধিকাংশই শিবলিঙ্গ; বিশেষত ভুবনেশ্বরে। গৌরীপট সমেত শিব-লিঙ্গের প্রতীক পরিকল্পনাকে যাঁরা মূল বিগ্রহ করেছেন তাঁদের ধারণায় নরনারীর দৈহিক মিলনদৃশ্যে অশ্লীল বলে কিছু থাকতে পারে এটাই তো বিশ্বাস করা কঠিন। মিশরের পিরামিডে, জারেকসাসের প্রাসাদে, তাজমহলে অথবা এ্যাক্রোপলিসের মৌল আবেদন সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির ভূমিকা বিচারে নয়—তাছাড়া সে সব দেশে বা কালে অশ্লীলতার সংজ্ঞা ভিন্নতর ছিল। অজন্তা গুহার সংযমী বৌদ্ধ শিল্পীর দল জীবনকে দেখাতে চেয়েছেন—তার গোপন অধ্যায়কে প্রচ্ছন্ন রেখেই। খুবই স্বাভাবিক, কারণ বুদ্ধদেব মারকে অস্বীকার করেছিলেন, পক্ষান্তরে শিব মদনকে ভস্ম করলেও স্বয়ং কুমারসম্ভবের অষ্টমসর্গের পটভূমিতে উপনীত হয়েছিলেন। শৈবরা,—শুধু শৈব কেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কোন কালেই অনঙ্গদেবকে অস্বীকার করেনি। ঋগ্বেদ[১] থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে কলিঙ্গের শৈব ও শাক্ত শিল্পীদল পুরুষ ও প্রকৃতির নন্দন দেখাতে, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে আমাদের মতে দুঃসাহসী হয়ে পড়েছেন।

একটা কথা। এবং সেটা বড় কথা। এঁরা নাচতে বসে ঘোমটা টানেননি। যা বলতে চান, যা দেখাতে চান তা অকপটে বলেছেন, খোলাখুলি ভাবে দেখিয়েছেন। তাঁদের নগ্নমূর্তিগুলি তবু

১) ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, সূক্ত ৮৬, শ্লোক ১৬

'ন্যুড', 'নেকেড' নয়। আজকের রুচিতে তা যদি আমার আপনার ভাল না লাগে তবে দোষ তাঁদের নয়—বোধকরি আমার-আপনার!

সেজন্য নয়, আমার কাছে খটকা লেগেছে অন্য একটা কারণে—সেটা ঐ বন্ধকাম মূর্তিগুলির সংখ্যাধিক্য।

জীবনে যৌনপর্যায় অনস্বীকার্য—সৃষ্টির মূল সেখানে নিহিত। কিন্তু জীবন শুধুমাত্র যৌনাচার নয়! শিল্পও তাই। তাই বলব—দুঃসাহসের জন্য নয়, একদেশদর্শিতার জন্য পরিকল্পনাকারকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি। এদিক থেকে মনীষী রাসেলের Marriage and Moral পুস্তকের দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমিও বলতে চাই যে যদিও স্বীকার করি "Joy of life depends upon a certain spontaneity in regard to sex" (জীবনে আনন্দ যৌনাচারের স্বতঃস্ফূর্ততায় অনেকাংশে নির্ভরশীল), তবু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলব " I wish to repeat, as emphatically as I can, that I regard an undue preoccupation with this (sexual indulgence) as an evil" (আমি আবার বলতে চাই, যতটা গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব অতটা জোর দিয়েই বলতে চাই যে, আমার মতে যৌনাচারের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ করাও ক্ষতিকারক। মার্কিন দেশে যৌনচিন্তার অতিশয্য দর্শনে রাসেলের যে কথা মনে হয়েছিল কোনার্ক মন্দিরের ভাস্কর্য দেখতে দেখতে আপনার-আমার সেই কথা মনে পড়া বিচিত্র নয়!

প্রশ্ন হতে পারে: কোন কোন্ ক্ষেত্রে বিকৃতকামের দৃশ্য কেন খোদাই করা হল? উত্তরে বলব 'বিকৃত' বিশেষণটাও আপেক্ষিক। ভ্যান-ডি-ভ্যালডি বা হ্যাভলক্-এলিসের মতে ও শব্দটা অর্থহীন। আমার আপত্তি সেখানে নয়, আমার আপত্তি বিষয়টির গুরুত্বদানে, তাদের প্রাধান্যে। শৈবমন্দিরে যাই হোক, সূর্যমন্দিরে বা বিষ্ণু-মন্দিরে জীবনের ঐ পর্যায়টা এত প্রাধান্য কেন পেল মন্দির ভাস্কর্য-শিল্পে?

তারও একটা যৌক্তিকতা মনে জাগছে। পশ্চিমখণ্ডে একসময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের কড়া শাসনে নর-নারীর যৌনজীবনের উপর লৌহ-যবনিকা টানার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। বহুদিন ধরে শিল্পে তথাকথিত সংযমের একটা আইন প্রচলিত ছিল। ধর্মযাজক সাভোনারোলার কীর্তি সকলেরই জানা। রেনেসাঁ যুগে এই পর্দাটি সরিয়ে দিলেন কয়েকজন দুঃসাহসী শিল্পী। নগ্ন নারীদেহ শিল্পে পুনরাবির্ভূত হল। গ্রীক ভাস্কর্যের নগ্ন নারীদেহ যেন পুনর্জন্ম লাভ করল কয়েক শতাব্দী পরে। মজা হচ্ছে এই যে—যেই বাঁধন সরে গেল অমনি নিরাবরণ নরনারী দেহের বন্যায় যেন ভেসে গেল শিল্পীদের সমস্ত চেতনা। এমনিই হয়। বোধকরি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আদি রসের যে বাধাবন্ধহীন প্রকাশ আমরা দেখেছি এবং যে প্রকাশ মধ্যযুগে কথঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল হঠাৎ কোন কারণে সে বাধা সরে যাওয়ায় এই বিশেষ যুগে বন্ধকাম মূর্তির বন্যায় ঐভাবেই ভেসে গিয়েছিল তদানীন্তন শিল্পীদলের শিল্পচেতনা।

কলিঙ্গের দেব-.দউল পরিক্রমা আমাদের শেষ হল। নিঃসন্দেহে বলব—কলিঙ্গের ভাস্করদল উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—ঐ কোনার্কে। পরিকল্পনায় শিল্পীরা ছিলেন বিশ্বকর্মা, বিরাটত্বে ময়দানব আর সূক্ষ্মকারিগরীতে যেন আগ্রার হস্তীদন্তশিল্পী। কোনার্ক সে অর্থে মহান! রথ-মন্দিরের পরিকল্পনা কোনার্কের আগেও হয়েছে—মহাবলীপুরমে, কিন্তু কোনার্কের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। এত বিরাট, এত মহান, এত সুন্দর রথ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই—বিশ্বে হয়তো এর চেয়েও মহান, রথ একটি মাত্রই আছে, সে রথ পৃথিবীর নয় আকাশের! যে রথে চড়ে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সূর্যদেব চলেছেন শেষ মহাপ্রলয়ের দিকে। তাই কোনার্ক রথের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় দর্শকের মাথা আপনিই নত হয়ে আসে। কোনার্ক সে অর্থে অতুলনীয়।

ভারতবর্ষে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের উৎকর্ষের দিক থেকে দুটিমাত্র শিল্প সম্পদের সঙ্গে কোনার্কের তুলনা করা চলতে পারে – তাজমহল এবং অজন্তা-ইলোরা। পরিকল্পনার দিক থেকে কোনার্ক বোধহয় এদের কারও চেয়ে কম যায় না। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে তাজমহলের একটা অদ্ভুত মোহবিস্তারের ক্ষমতা আছে। দূরত্ব বিশালত্ব এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন তাল-মান-লয় তাজমহলে আছে—যা পৃথিবীর অন্য কোনও স্থাপত্য-কীর্তিতে নেই। তাজমহল পরিকল্পনাকার দর্শককে এমন এমন স্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন যেখান থেকে বিরাট তার বিরাটত্ব ত্যাগ করে শুধু সুন্দররূপেই প্রতিভাত হয়েছে। ভাব ও লাবণ্য যোজনা যদি শিল্পের অঙ্গ হয় তবে তাজমহলের সে অঙ্গ কানায় কানায় টলটল। সম্রাজ্ঞীর রূপ-লাবণ্য এবং সম্রাটের বিরহবিধুর অন্তরের আর্তি যেন পাষাণে ফুটে উঠেছে। কোনার্ক যতই কেন না বিস্ময়কর হ'ক মনকে অমন করে নাড়া দেয় না। অবশ্য তার একটি প্রধান কারণ এই যে, কোনার্ক মন্দিরের খণ্ড-বিচ্ছিন্নরূপই আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি—তার সম্পূর্ণ আবেদন কি ছিল তা আমরা জানি না।

তুলনা অজন্তা-ইলোরার সঙ্গেও করা চলে।

ইলোরার কৈলাস অথবা বিশ্বকর্মা গুহার প্রধান পরিকল্পনা-কারের কৃতিত্বও কোনার্ক-পরিকল্পনাকারের অপেক্ষা ন্যূন নয়। যদিও কোনার্কের গড়া ইলোরায় ছিল শুধু ভাঙ্গা। তবু পরিকল্পনার দিক থেকে দুই সমতুল্য।

কিন্তু আমার মতে অজন্তার বৌদ্ধ শিল্পীরা নিঃসন্দেহে শিল্পী হিসাবে কোনার্ক রূপকারদের চেয়ে বড়জাতের। স্থাপত্যচিন্তা যতই মহান হক, রূপায়ণের দক্ষতা যতই বিস্ময়কর হক এবং ভাস্করদের সূক্ষ্মতা যতই না কেন চমকপ্রদ হ'ক—কোনার্ক রূপকারদের মধ্যে সে জাতের শিল্পীমনের সন্ধান পাইনি যা পেয়েছি অজন্তায়। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপানির সঙ্গে হরিদশ্ব মূর্তির তুলনা চলে—শিল্প-

বস্তু হিসাবে কেউ কারও অপেক্ষা ন্যূন নয়। অজন্তার সপ্তদশগুহার কৃষ্ণা অপ্সরা অথবা প্রথম গুহার কৃষ্ণারাজকুমারীর তুলনায় কোনার্কের জগমোহনের পোতালে রক্ষিত নারীমূর্তিগুলিও শিল্প-সামগ্রী হিসাবে সমপর্যায়ের—কেউ কারও কম নয়। কিন্তু অজন্তার প্রথম গুহার 'মহাজনকজাতক' অথবা সপ্তদশগুহার মরণাহতা 'জন-পদকল্যানী' কিম্বা 'বুদ্ধদেব-গোপা-রাহুলের' সমতুল্য কোনও শিল্প-নিদর্শন কোনার্কে আমার নজরে পড়েনি। অজন্তার শিল্পী যেন জীবন-রসের রসিক—এই প্রপঞ্চময় বিশ্বজগতের প্রতিটি জীবকে, প্রতিটি বস্তুকে যেন তিনি জড়িয়ে ধরতে চান, জাপটে ধরতে চান ;—শিল্পী সেখানে ছিলেন মূলতঃ জীবনভিক্ষু। অপর পক্ষে কোনার্কের শিল্পী রাজসিক! রাজদৃষ্টিতেই যেন তিনি দেখেছেন এ দুনিয়াকে—তাই কোনার্কে শুধুই ছাঁচে-ঢালা অলসকন্যা, দেবদাসী, মিথুন, নাগ-নাগিনী রাজান্তঃপুর ও শিকারের দৃশ্য। অজন্তায় গ্রাম্য-জীবনের অসংখ্য চিত্র আছে, আছে হলকর্ষণরত কৃষক, পাখি-ওয়ালা, ধীবর, সাপুড়ে, মুদি, কলু, নাবিক, গোয়ালার চিত্র—কোনার্কে সে দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। সে আমলেও বোধকরি বারো-আনা কলিঙ্গবাসী ছিল কৃষিজীবী—কৃষক বা লাঙ্গল আমার নজরে পড়েনি। তাঁত বুনতে দেখিনি কাউকে, দেখিনি কুমোরকে, ছুতারকে, কলুকে—দেখিনি এমন কি মৎসজীবীকেও যারা নিশ্চয় ভীড় করে দেখতে আসত এ মন্দির নির্মাণের কাজ। রাজপ্রাসাদের বাইরে যেন জীবন নেই। জীবজগতের অংসখ্য মূর্তি আছে—আছে হাতী, ঘোড়া, ষাঁড়, হরিণ, ইঁদুর, ছাগল, বানর, বরাহ, কুম্ভীর, কুর্ম, মাছ, টিকটিকি, সাপ, সিংহ, উট, জিরাফ, হাঁস, ময়ূর, খরগোশ এবং কাল্পনিক গজ বিরাল, নরবিড়াল ইত্যাদি। তবু বলব জগত-প্রপঞ্চের বিচিত্র বিকাশ হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা শিল্পে উপস্থিত হয়নি—অজন্তা গুহার মত একবর্ণা সেখানে বহুধা হননি ;—তারা এসেছে মানুষের প্রয়োজনে। অর্ধেক এসেছে দেবতার বাহন হিসাবে এবং প্রায় বাকি

অর্ধেক মানুষের! এমন কি টিকটিকি জিরাফ পর্যন্ত এসেছে মানুষের প্রয়োজনে!

অজন্তার সঙ্গে কোনার্কের শিল্পগত এই যে মৌল প্রভেদ এর গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখব—কোনার্ক সৃষ্টি হয়েছিল রাজ-নির্দেশে, রাজার অর্থানুকুল্যে—অপরপক্ষে অজন্তার বৌদ্ধসঙ্ঘের কেন্দ্রে ছিলেন বৌদ্ধ-অর্হতেরা, যাঁরা গার্হস্থ্য-জীবনে ছিলেন বিচিত্র পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। তাই গ্রাম্যজীবনের যে চিত্র তাঁরা এঁকেছেন তা "সৌখীন মজদুরী" হয়নি, হয়েছে দরদী দিক চিহ্ন! জীবনে জীবন যোগ করেই তাঁরা শিল্পকে রূপায়িত করেছেন। সে সুযোগ কোনার্কের শিল্পী পাননি; তাঁকে ক্রমাগত গড়তে হয়েছে মিথুন-মূর্তি, রাজপ্রাসাদের দৃশ্য, অথবা দেবদাসী। রাজানুগ্রহ লাভের সস্তা মোহে! আর তাই কোনার্কে আর্টকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ক্রাফ্‌ট!

তার মানে এ নয় যে কোনার্ক আমাকে হতাশ করেছে। তাজমহল অথবা অজন্তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের আত্মাকে কোন শিল্পকর্মে এমন মহানরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠতে আমি তো আর কখনও দেখিনি।

শব্দ পঞ্জী

অগ্নিকোণ—৪, ১১-১৩, ১৯, ৫১
অজন্তা—৯, ৪৩, ২০০, ২১৮, ২২৩
অনঙ্গভীম—১৪৫
অনন্ত বাসুদেব—৭, ১২৭
অবনীন্দ্রনাথ—৬৫
অয়নচলন—১৫০, ১৫৩
অরুণস্তম্ভ—১৩৩, ১৩৫, ১৯৪
অর্ধনারীশ্বর—৭১
অলসকন্যা—১১৩
অলাবু বেশবী—১৬
অশোক—৪, ১১-১৯, ৫১
ঐ স্তম্ভ—২০, ২২
ঐ শিলালেখ—২৭
অশ্বমূর্তি—১৯৬
আইন-ই আকবরি—১৪৬, ১৫১
আবুল ফজল—১৪৬, ১৫০
আহিওল—৭, ১০৫
ইন্দ্রজী ডাঃ—১৫, ২৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন—১৩১
উডগজ সিংহ—১১, ১৫৮
উদয়গিরি—৪, ৫, ২০, ২৩, ৩০, ৩৯
উদয়ন—৪০, ৪২
ঋগ্বেদ—১৬, ১৭
একরথ দেউল—৮৮
একাম্র-চন্দ্রিকা—১৪
একাম্র পুরাণ—১৪, ৫৮-৬০
এলোরা—৯
এশিয়াটিক সোঃ—১৬০
ওডিসি—৮
ওড়িয়া ভাষা—৯
ওরিয়েন্টেশন—১৫২
কপিল সংহিতা—১৪, ৫৮
কবরেল—৫, ২৪-২৯, ৫২
কবরুশিয়ে—৭৬
কণকোপর—২৫, ৩৪
কলিঙ্গ নগর—৫২
কাঠখর দেউল—৭৮
কাঞ্চী কাবেরী—১৩৬
কাম (পাঁচ/সাত)—৮২-৮৪
কালাপাহাড়—১৫৪
কিটো—২৫
কিরাত—১৭
কেদারেশ্বর—৬, ১০৯
কেশরী বংশ—৬
কোনার্ক—৭, ১০, ১৪১
ঐ জগমোহন গণ্ডী—১০১
ঐ ঐ বাড—১৭০
ঐ ঐ পিষ্ঠ—১৬৩-১৭০
ঐ ঐ পূর্বদ্বার—১৮৩
ঐ বড়দেউল—১৮৭-১৮৮

খণ্ডগিরি ৪, ৫, ২৩, ২৯
খাজুরাহো—৭, ১০, ১১৫
খাপুরি—৮৬
গঙ্গোপাধ্যায় মনোমোহন—২০, ৭৬
গজলক্ষ্মী—৩২, ৩৪, ৭২
গজোত্তম—১০, ১২
গণেশ গুম্ফা—২৫, ৩৮
গণ্ডী—৮৫
গর্ভগৃহ—৭৬
গুণ্ডিবা—১৩১, ১৩৫
গুপ্তযুগ—৫৫
গুহশিব—৫৪
গেলবাঈ—১৮৩
গৌতমীপুত্র—৫
গৌরী—৬, ১০৩
চক্র—১৫৯, ১৬৩
চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার—৭০, ৪৭, ১১৮
চন্দ—১৪
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য—২৭
চেদীরাজ—১৯, ৫২
চৌলকর্মা—২৯
জগন্নাথ—৭, ১২৯, ১৩০
জগমোহন—৬৩, ৭৭
জয়তী কেশরী—১৬
জয় বিজয় গুম্ফা—২৪, ৩০, ৩১
ঝাউগাদা—৫, ১২, ১৭, ২৭
ঝাম্পানি সিংহ—২১
টলস্টয়—২১৭
ঠাকুরানী গুম্ফা—২৩, ৩০
তত্ত্বগুম্ফা—২৫, ৩৫
তাজমহল—১০, ১৮৩, ২০০, ২২৩
তীর্থঙ্কর—৩৭
তোরণ, মুক্তেশ্বর—১০১
তোশলী—১৩, ১৯, ৫১, ৫২
ত্রিবেদী রামেন্দ্র—২০২
ত্রিভুবনেশ্বর—৫৮
ত্রিরত্ন—৩৪
ত্রিরথ দেউল—৮৮
ত্রিশূল গুম্ফা—৩৫
থুপারাম ('থুমারাপ' ছাপার ভুল)—৫৪
থভ—৩৯
দাস পুরুষোত্তম—১৩৬
দিকনির্ণয়—১৫২
দীর্ঘতমা ঋষি—১৬
দেউল/শ্রেণীবিভাগ—৭৭
দ্বার রক্ষক—১৯৪
দ্রামিড/দ্রাবিড—১৭
ধৌলি—৪, ৫, ১০-১২, ২৭
নন্দ মহারাজ—২৬, ২৭
নবমুনি গুম্ফা—৩৫
নরসিংহদেব—১৪৫-১৫৩
নাগপূজা—৩৩
নাসিক—৩২
নিষাদ—১৭
পঞ্চরথ দেউল—৮৯
পট্টনায়ক কবিচন্দ্র—৯
পবনগুম্ফা—১৪, ২৯

পরশুরামেশ্বর—৬১
পানিগ্রাহী—২১, ২৮
পাশুপত—৬, ৫৫
পিষ্ঠ—৮১, ১৬৩
পুরন্দর কেশরী—১৪৫
পুরী—৯
পুষ্পগিরি বিহার—৫৭, ২১১
পুষ্যমিত্র সুঙ্গ—৫, ২৮, ২৯
পূষা/কোনার্ক—১৯২
প্রতাপ রুদ্রদেব—১৩৬
ফা-হিয়ান—১৩১
ফাঁদগ্রন্থী—৯৮
ফার্গুসন—৩২, ৫০, ১৫৬, ১৫৮
বড়ুয়া, বি—২৬
বদ্ধকাম—১৯৯
বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণ—১৪
বসু নন্দলাল—২১৫, ২১৬
বসু নির্মলকুমার—২০, ১৬৬, ১৮১, ১৯৯
বহুসত্তিমিত—২৬, ২৭
বাড়—৮১
বারোভূজি—৩৫
বিরাল—১০২
বিষ্ণুকান্ত—৩৮
বুদ্ধদেব—১১, ৬৫
রেকি—৮৬
বেতাল—৬, ৬০, ৯১
বোধিদ্রুম—৩৩
বৌদ্ধগয়া—৪৪
ব্যাঘ্রগুম্ফ—২৪, ২৯
ব্রহ্মকান্ত—৩৮
ব্রহ্মদত্ত—৫৪, ৫৫
ব্রহ্ম পুরাণ—১৬
ব্রহ্মেশ্বর—৬
ব্রাউন পার্সি—১৫৭
ভঙ্গ/ভঙ্গি—৬৫
ভরতেশ্বর—৬, ৫৯
ভারহুত—২৫, ৩০, ৩৩, ৫০
ভাস্করেশ্বর—৫, ২০, ৬০
ভুবন প্রদীপ—৭৬, ১৫২, ২১০
ভো—৯৯
ভোগমণ্ডপ / কোনার্ক—১৯৭
ভৌমকর—৬, ২২, ১০৬, ২১১
মঞ্চপুরী—২৪, ৩০
মস্তক—৮৬
মহাবলীপুরম—৭
মহাপাত্র কে—২০
মহাভারত—১৬
মহিষমর্দিনী—৬৪
মোহন্-জো-দড়ো—১০, ১৮
মাঘী শুক্লা ৭মী—১৪৪, ১৪৮, ১৫০
মাদলাপঞ্জী—১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১১৬, ১৪৫, ১৫৩
মায়াদেবী মন্দির—১৯৮
মার্কোপোলো—১৬৬
মিত্র দেবলা—১৫৮
মিত্র রাজেন্দ্রলাল—১৪, ২০, ২৫, ৩২, ৩৩, ১৫৯
মিথুনমূর্তি—১৯৯

মুক্তেশ্বর—৯৬
মুরুণ্ডা—৫৩, ৫৫
মেঘেশ্বর—৬
মৈত্রেয় অক্ষয়কুমার—২০৫
যগমারু—৬১
যগমারু—৬১
রাজারাণী—৬, ১০৯
রাণীগুম্ফা—২৫, ৩৪, ৪৪, ৫০
বামেল—২১৯
রেখ দেউল—৮১
লক্ষ্মণেশ্বর—৫৮
লাকুলীশ—৫, ৬, ৬০
লিঙ্গপূজ—২০৩
লিঙ্গরাজ—৭, ১২১
লোমশমুনী—১৭, ৩৪
শত্রুঘ্নেশ্বর—৬, ৫৯
শশাঙ্ক—৫, ৭, ৬১, ১০৫
শাম্ব—১৪৩
শাম্বপুর—১৪৫
শাস্ত্রী হরপ্রসাদ—২০২
শিশিরেশ্বর—৬
শিশুপালগড়—১৯, ২১, ৫২
শীল ব্রজেন্দ্রনাথ—২০৭
শৈলোদ্ভবদ্বব—৫, ১০৫
শোভনদেব—১৫
সতকর্নী—৫, ২৬-২৯, ৫৮
সমুদ্রগুপ্ত—৫৫
সরকার যদুনাথ—১৫১
সর্পগুম্ফা—১৪, ২৯
সাঁচি—৯, ২৫, ৩০, ৩২, ৫০
সিদ্ধেশ্বব—৬, ১০৮
সুদামা গুহা—২৪, ২৫, ৩৪
সূচী—৩৯
সূর্যমূর্তি—১৯০
সোমবংশী—৬
স্টার্লিঙ—১৪, ৩২, ১৫১, ১৬০
স্বর্গপুরী—২৪, ৩০
স্বর্নাদ্রি মহোদয়—১৪, ৫৮
স্বস্তিকাচিহ্ন—৩২, ৩৪
হণ্টার/হাণ্টির—১৪, ১৬১, ২০৩
হরাপ্পা—১০, ১৮
হবিদশ্ব—১৯২
হরিদাস গুম্ফা—২৯
হর্ষবর্ধন—৫
হস্তীদলনকারী শার্দূল—১৯৫
হস্তীমূর্তি—১৯৫
হাতী গুম্ফা—১৯, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮
হাণ্ট—৩২
হিউ এন-ৎসাঙ—৫৮
হ্যাভেল—১৯৭